সোনার আলপনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা ১২

শ্রীমতী মণিকা রায়-কে

সূ চী প ত্র

সো না র আ ল প না

গী দ্য মোপাসাঁ

১৮৫০—১৮৯৩

'মাদাম বোভারি' খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই দিয়েছে ফ্লোবেয়ারকে। বাস্তবপন্থী নবীন সাহিত্যিকরা এই উপন্যাসটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে, জীবনের এমন বাস্তবানুগ অথচ শিল্পমণ্ডিত ছবি এর আগে চোখে পড়েনি। কিন্তু প্রাচীনপন্থীরা লেখকের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। অশ্লীলতার অভিযোগে শেষ পর্যন্ত ফ্লোবেয়ারকে আদালতে হাজির হতে হয়েছিল। এই লাঞ্ছনা তাঁকে আঘাত দিয়েছে। তার উপর পারিবারিক জীবনেও শান্তি ছিল না। স্বাস্থ্যহীনতা, অর্থাভাব এবং ব্যর্থ প্রেমের বেদনা তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিষময় করে তুলেছে।

এমন সময় এল লর্-এর চিঠি। লিখেছেন: আমার ছেলেকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ও একদিন লেখক হিসাবে নাম করবে, এই স্বপ্ন দেখি। আপনার সাহায্য ছাড়া সে স্বপ্ন সফল হবে না। আপনি ওকে গ্রহণ করুন, ছাত্রের মতো সাহিত্য-কর্মে দীক্ষা দিন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর বাবা ছিলেন হাসপাতালের ডাক্তার। হাসপাতালের কোয়ার্টারে তাঁর সঙ্গে খেলা করতে আসত আলফ্রেড। আর কোনো খেলা নয়, কবিতার আবৃত্তি, নাটকের দু'-একটা দৃশ্যের অভিনয় - এই ছিল খেলা। আলফ্রেডের সঙ্গে প্রায়ই আসত তার বোন লর্। বড় হয়ে আলফ্রেড কবিতা লিখেছে, তার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু সংসারের চাপে পড়ে এবং অকালমৃত্যুর জন্য কাব্য-চর্চা বেশি দূর এগুতে পারেনি।

লর্ নিজে লিখতে না পারলেও ছেলেবেলার পরিবেশ থেকে পেয়েছেন সাহিত্য-প্রীতি। ফরাসী সাহিত্যের তো কথাই নেই, শেক্সপীয়রের মূল ইংরেজী নাটক পড়েও তিনি রস আস্বাদন করতে পারতেন। সামাজিক জীবনে লর্ ছিলেন প্রগতিশীলা। তখনকার দিনেও প্রকাশ্যে ধূমপান করতেন, পুরুষের মতো ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হতেন। এই সুন্দরী, সুশিক্ষিতা তরুণীর আচারে-ব্যবহারে

সর্বদাই আভিজাত্য প্রকাশ পেত। তিনি যখন স্বেচ্ছায় গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁকে বিয়ে করলেন তখন অনেকেই বিস্মিত হল। গুস্তাভের পৈত্রিক সম্পত্তি আছে, অবস্থা স্বচ্ছল বলা যেতে পারে। লম্বা-চওড়া চেহারা, স্বপ্নভরা চোখ ; কী একটা বৈশিষ্ট্য আছে সে চেহারায়, যা মেয়েদের সহজেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের কথা অজানা ছিল না। সন্ধ্যার পরে প্যারিসের রাজপথের প্রায়ান্ধকার কোণে আনন্দের সন্ধানে ছায়ামূর্তির পেছনে পেছনে ঘুরতেন গুস্তাভ। লর্ জানতেন সব। তবু বিয়ে হল। প্রেমের দেবতা অন্ধ। ভেবেছিলেন, প্রেম দিয়ে শুধরে নেবেন।

গুস্তাভ ঐ বয়সে অনেক মেয়ে দেখেছেন। তারা সব কাদার মতো। যা ইচ্ছে ব্যবহার করা যায় তাদের সঙ্গে। শুধু পকেটে টাকা থাকলেই হল। কিন্তু লর্-এর সামনে এসে গুস্তাভের মন প্রথম হোঁচট খেল। রূপ ও শক্তি কি সুন্দর ভাবে মিলেছে এই মেয়েটির মধ্যে! নতুন লাগল। এমনটি আর দেখেননি। নতুনত্বের মোহে তিনি লর্কে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করলেন।

এ মোহ কেটে গেল প্রথম সন্তান জন্মের পরেই। বিয়ের বছর চারেক পরে ১৮৫০ সালের ৫ই আগস্ট জন্ম হল গী দ্য মোপাসাঁর। ঐ বছরই বালজাক পরলোক গমন করেছেন। একটি প্রদীপ নতুন আর একটি দীপশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে নিবে গেল।

কিছুদিন পরেই গুস্তাভ ফিরে পেয়েছেন পুরনো স্বভাব। আবার আরম্ভ করেছেন মক্ষিকাবৃত্তি। নিজের আচরণ গোপন করবার মতো শালীনতাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। সকলের সামনে দিয়েই বেরিয়ে যান অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে। লর্-এর চোখ কখনো অশ্রুসিক্ত, কখনো বা রাগে জ্বলে ওঠে। বালক মোপাসাঁ সব বুঝতে না পারলেও অনেকটাই অনুভব করে। মা'র জীবনে সুখ নেই। এই অসুখী নারীর ছায়া পরবর্তী জীবনে পড়েছে তার অনেক রচনায়। বিশেষ করে মোপাসাঁর প্রথম উপন্যাস 'একটি জীবন (Une Vie)' মা-বাবার অসুখী দাম্পত্য-জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত।

বালক দুঃখিনী মা'র জন্য গভীর মমতা অনুভব করে। লর্-ও স্বামীর কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে ছেলেকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করলেন। ছ' বছর পরে জন্ম হল দ্বিতীয় ছেলে হার্ভের। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে হৃদয়ের মিলন ঘটবার কোনো আশা নেই। প্রীতিহীন, শ্রদ্ধাহীন দাম্পত্য-জীবনের অভিনয় লর্-এর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। জীবনে আর কিছু না থাক,

অন্ততঃ একটু স্বস্তি যেন থাকে। তাই স্বামীর কাছ থেকে তিনি দূরে সরে গেলেন। গুস্তাভ ছেলেদের পড়াবার খরচ দেবেন, এই শর্তে দু'জনে বিচ্ছেদ স্বীকার করে নিলেন।

এবার আর কোনো ঝঞ্চাট নেই। এখন ছেলেদের মানুষ করে তোলবার দিকে দৃষ্টি দিলেন লর্। মায়ের টান বড় ছেলের উপবেই বেশি। নিজের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছেলেকে দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। তাকে শেক্সপীয়রের মূল রচনা মুখে মুখে পডান। ছেলে যখন শেক্সপীয়রের নাট্যাংশ আবৃত্তি করে শোনায় তখন মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে। কিশোর বয়সেই মামার মতো সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—সবই ভালো লাগে মোপাসাঁর। কোন্ বই বড়দের, কোনটা ছোটদের, সে বিচারে প্রয়োজন নেই। অধীর আগ্রহে মোপাসাঁ পাতার পর পাতা উল্‌টে যায়। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থকীট নয় সে। যখন পড়ত না, তখন কুস্তি লড়ত, সাঁতার কাটত, নৌকা নিয়ে বাচ খেলত। সুস্থ, সবল, বাড়ন্ত গড়নের দেহ। ছুটোছুটি করে খেলতে ভালোবাসে। চাষী, মজুর, জেলে—সকলের সঙ্গে মিশত অন্তরঙ্গ হয়ে। কখনো কখনো মা হতেন খেলার সঙ্গী। খেলার ফাঁকে বিশ্রাম নেবার সময় দু'জনে কবিতা আবৃত্তি করে। চমৎকার স্মৃতিশক্তি মোপাসাঁর! একবার কোনো কবিতা পড়লেই মনে থাকে। সুতরাং অনর্গল কবিতা আবৃত্তি করে যেতে পারে।

হঠাৎ এক-একদিন কিছুই ভালো লাগে না মোপাসাঁর। বই খুলতে ইচ্ছা করে না, খেলা পড়ে থাকে। সমস্ত পৃথিবী যেন বিষাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন; অকারণে কিছুক্ষণের জন্য তার মন সেই বিষাদে ডুবে যায়। মাথাটা একটু ব্যথা করে; জীবনের কোলাহল যেন দূরে চলে যায়। সাহিত্যপ্রীতির মতো এই বিষাদরোগ সে পেয়েছে মা ও মামার কাছ থেকে।

বাড়ির পড়া শেষ হবার পর মোপাসাঁকে পাঠানো হল বোর্ডিং-স্কুলে। পাদ্রি সাহেবরা স্কুল পরিচালনা করেন। স্কুলের সর্বত্র ধর্মের পরিবেশ। সংকীর্ণমনা পাদ্রি শিক্ষকদের ব্যবহারে মোপাসাঁ তথাকথিত ধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। নিজেকে নাস্তিক বলে প্রকাশ্যে প্রচার করে মোপাসাঁ। শিক্ষকরা এই দুঃসাহসী ছেলেটিকে স্কুল থেকে তাড়াবার কথা ভাবছেন, এমন সময় তাঁদের স্বপক্ষে আর একটি কারণ ঘটল। দূর সম্পর্কিত সদ্যবিবাহিতা এক বোনকে উদ্দেশ্য করে লেখা মোপাসাঁর কয়েকটি কবিতা পড়ল অধ্যক্ষের

হাতে। অশ্লীল কবিতা রচনার অপরাধে অবিলম্বে মোপাসাঁকে বিতাড়িত করা হল।

পড়া বন্ধ করে মোপাসাঁ বাড়ি ফিরে আসায় মা বেশি দুঃখিত হলেন না! ছেলের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন ভবিষ্যতের এক বিপ্লবীকে। অর্থহীন সামাজিক সংস্কার এবং সংকীর্ণ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করবে। সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ঊর্দ্ধে ওঠবার ক্ষমতা থাকা চাই।

আবার কিছুকাল অবাধে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেল মোপাসাঁ। বইয়ের জগতের চেয়ে বাইরের জগতের প্রতি আকর্ষণটা এখন গভীরতর হয়েছে। মোপাসাঁর দেহ থেকে যেন উপচে পড়ছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল সুখোপভোগের জন্য জেগেছে তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা। জীবনবিলাসী মোপাসাঁ জীবনের সবটুকু রস নিঃশেষে পান করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে। মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই সে প্রণয়িনী নির্বাচন করে নিয়েছে, লোকনিন্দার ভয় তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি।

লেখাপড়া বন্ধ করে এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ানো আর ক'দিন চলে? আবার নতুন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হল মোপাসাঁ। স্কুলের জীবনে তার সাহিত্য-চর্চার নিদর্শন কতকগুলি কবিতা। সেগুলি দেহ-সর্বস্ব প্রেমের কবিতা। কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। স্কুলে পড়বার সময় এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যাকে শুধু যৌবনের চাপল্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোপাসাঁ তরুণীর ছদ্মবেশে এক পার্টিতে উপস্থিত হয়ে একটি ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করবার সুযোগ করে নিয়েছিল। এই প্রতারণা ধরা পড়তে দেরি হল না। মা ছেলের হয়ে ক্ষমা চেয়ে অপমানিতা ইংরেজ যুবতীকে শান্ত করলেন। এ ধরনের ঘটনা পরবর্তী কালে মোপাসাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে।

১৮৬৯ সালে মোপাসাঁর স্কুলের পড়া শেষ হল। এর পর আইন পড়বার ইচ্ছা। কিন্তু টাকা নেই। ছেলেদের পড়াবার ব্যয় বহন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গুস্তাভ। কিন্তু এখন তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কোনো প্রকার সাহায্য করা অসম্ভব।

পর বৎসর প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। মোপাসাঁ যুদ্ধ ঘৃণা করে, তবু নাম লেখাতে হল। তবে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি। তাকে থাকতে হয়েছে পেছনের সারিতে, পুরোবর্তীদের জন্য কাজ

করেছে বন্দুকের আড়ালে থেকে। অবশ্য যুদ্ধের নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করেছে মোপাসাঁ ; তার ফলে সে হয়ে উঠল যুদ্ধবিদ্বেষী। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা তার জীবন-বিদ্বেষকেও গভীরতর করে তুলেছে। কিন্তু মোপাসাঁর জীবনে যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার দানও অসামান্য। নিজের চোখে যুদ্ধ না দেখলে Boule de suif (এক তাল চর্বি)-এর মতো অপূর্ব গল্প লেখা সম্ভব হত না। এই গল্পটিই তাকে লেখক হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

সৌভাগ্যের কথা, মোপাসাঁকে দীর্ঘকাল সমর-বিভাগে থাকতে হয়নি। মুক্তি পেয়ে বাড়ি এল। বাড়ি ফিরে হঠাৎ আবিষ্কার করল অবিলম্বে উপার্জন প্রয়োজন। এত দিন মা যে একা কি করে সংসার চালিয়ে এসেছেন সেটাই এক পরম বিস্ময়। মোপাসাঁ মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল প্যারিস। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ এড়িয়ে এসেছে, কিন্তু এবার অপরিচিত নগরীতে শুরু হল জীবনের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

অনেক. তদ্বির, দরখাস্ত, হাঁটাহাঁটির পর মোপাসাঁ ফরাসী সরকারের নৌ-বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীব কেরাণীর চাকরি পেল। সকাল আটটা থেকে বিকাল ছ'টা পর্যন্ত আপিস। দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ। মাইনে পঁয়ষট্টি টাকা। আপিসের সবাইকে প্রয়োজনীয় ফরম এবং স্টেশনারী বিতরণ করবার দায়িত্ব মোপাসাঁর। প্রতিদিন এক কাজ, চার দিকে রোজ এক মুখ দেখতে হয় ; বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণ পরিবেশে কাগজ-কলম-পেন্সিলের তুচ্ছ হিসাব নিয়ে জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করা। অথচ কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে সে প্যারিস এসেছিল।

গ্রামের ছেলে, ক্ষুধা বড বেশি। কিন্তু বেতন বড় কম। প্যারিসের আক্রা বাজারে দু'বেলা পেট ভরে খাবার মতো পয়সা নেই। থাকে আলো বাতাসহীন গর্তের মতো ছোট একটা ঘরে। পয়সার অভাবে রাত্রিতে প্রায়ই কিছু খাওয়া হয় না। শুধু তো অন্নের ক্ষুধা নয় ; গ্রামের বাড়ি থেকে সে নিয়ে এসেছে যৌন-ক্ষুধা। সেখানে পয়সা লাগত না, কিন্তু এখানে একটু কথা বলতে হলেও পয়সা চাই। সন্ধ্যার পরে প্যারিসের নিম্নশ্রেণীর রূপোপজীবিনীদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় মোপাসাঁ। পকেটে প্রায়ই পয়সা থাকে না। সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ব্যবসায়ের রীতি-নীতি পর্যবেক্ষণ করে। এই অভিজ্ঞতার ফল মোপাসাঁ পরে তার লেখায় ব্যবহার করেছে।

চাকরির প্রথম দশ বছর মোপাসাঁর একটি প্রধান শখ ছিল সেন নদীতে

নৌকা করে বেড়ানো। খুব ভোরে উঠে তিন চার জন বন্ধুর সঙ্গে দাঁড় টানতে টানতে অনেক দূর চলে যেত। ফিরে আসত ঠিক আপিসের সময়টিতে। সপ্তাহের ছ'টা দিন সরকারী দপ্তরে ভদ্র ও বিনীত কেরাণী সেজে থাকতে হয়। রবিবারটা ছুটি। ছুটি তো নয়, মুক্তি। পয়সা থাকলে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যায় শহরের বাইরে কোনো নির্জন স্থানে; বনভোজন করে। ছ'দিনের অবদমিত উচ্ছ্বাস মুক্তি পায় বনভোজনকে কেন্দ্র করে। অশ্লীল কথায় ও কৌতুকে দলের মধ্যে মোপাসাঁ ছিল অদ্বিতীয়।

এটা মোপাসাঁর বাইরের জীবনের পরিচয়। নিভৃতে সকলের চক্ষুর অন্তরালে সে করে সাহিত্য-চর্চা। দুর্লভ সাহিত্য-খ্যাতি অর্জনের লোভ তার। প্যারিস পৌঁছে মা'র চিঠি নিয়ে প্রথমই দেখা করেছে ফ্লোবেয়ারের সঙ্গে। চার দিক থেকে আঘাত পেয়ে পেয়ে ফ্লোবেয়ার তখন ক্ষুব্ধচিত্তে আশ্রয় নিয়েছেন গৃহকোণে। নিঃসঙ্গ, বিস্বাদ জীবন। তখন এক তরুণ এল শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে, হতে চাইল শিষ্য। তাঁর ভালো লাগল। ছেলেবেলার বন্ধু আলফ্রেডের ভাগ্নে ও খেলার সঙ্গিনী লর্-এর ছেলেকে তিনি সানন্দে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের এমন নিবিড়, আন্তরিক সম্পর্ক বিরল। পুত্রের মতো, শিষ্যের মতো ফ্লোবেয়ার মোপাসাঁকে সাহিত্য-সৃষ্টির অ-আ, ক-খ শেখাতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠল যে শীগগিরই গুজব রটল মোপাসাঁ ফ্লোবেয়ারেরই ছেলে,—হয়ত অবৈধ সন্তান। মোপাসাঁ এই শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছে যে, রচনা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত না হয়ে সাত বছর ধরে ফ্লোবেয়ারের কাছ থেকে যা শিখেছি, শুধু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে চল্লিশ বছরেও তা শেখা হত না।

প্রথম ছিল কবি-খ্যাতির লোভ। প্রতি সপ্তাহে একবার করে মোপাসাঁ যায় নতুন কবিতা দেখাতে। সে কবিতা হয়ত আপিসে বসে সরকারী কাগজের উপরে লেখা। ফ্লোবেয়ার সংশোধন করেন স্কুলমাস্টারের মতো। ভাষা ঘোরালো কিংবা ভাব অস্পষ্ট হলে তিনি চটে ওঠেন। লেখা হবে সহজ ও সরল। সহজ করে লিখতে পারাই লেখকের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। ফ্লোবেয়ার উপদেশ দিতেন: দু'টি বালুকণা, দু'টি মাছি, দু'টি হাত, দু'টি নাক,—কিছুই হুবহু এক নয়। যাও, এদের পার্থক্যটা দু'চার কথায় যথার্থরূপে এবং স্পষ্ট করে লিখে নিয়ে এসো। আবার হয়ত বলতেন, রাস্তার দু'পাশের দোকানে মুদিরা বসে আছে, গাড়ীর উপর বসে বসে গাড়োয়ানরা ঝিমুচ্ছে: তাদের ছবি আঁকো

দু' এক কথায়; একজন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠুক অন্য সকল থেকে। মোপাসাঁ উপদেশ অনুসারে কাজ করে এনে দেখায়। ভুল হলে গুরুর কাছে ক্ষমা নেই। ফ্লোবেয়ার কঠোর তিরস্কার করেন। কখনো কখনো তা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তবু মোপাসাঁর মনে নবীন-লেখক-সুলভ অভিমান নেই। সে নীরবে উপদেশ শোনে, ভুল সংশোধন করে আবার ফ্লোবেয়ারকে এনে লেখা দেখায়। গুরু এবং শিষ্য দু'জনেরই অপরিসীম অধ্যবসায়!

এই ক'বছরে মোপাসাঁ অনেক কবিতা, নাটক ও নক্সা রচনা করেছে। ফ্লোবেয়ার এখনো কাগজে লেখা প্রকাশ করতে অনুমতি দেননি। রচনার মান আরো উন্নত করতে হবে। জোলা, দোদে, সেজান প্রভৃতি শিল্পী ও সাহিত্যিকের সঙ্গে মোপাসাঁর পরিচয় হয়েছে ফ্লোবেয়ারের বাড়িতে। সবাই জানে সে ফ্লোবেয়ারের শিষ্য, সুতরাং মোপাসাঁর কাঁচা লেখা প্রকাশিত হলে যে সমালোচনা হবে তা পরোক্ষে ফ্লোবেয়ারেরই সমালোচনা। মোপাসাঁর লেখা প্রকাশ করবার অত্যন্ত আগ্রহ। টাকা পেলে একখানি কবিতার বই বের করা যেতে পারে,—এত কবিতা জমেছে। গুরুর নির্দেশে লেখাগুলি খাতায় বন্দী করে রাখে মোপাসাঁ। আত্মপ্রচারের সহজাত আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল দমন করা সহজ নয়। তবু সে সাধকের মতো সংযম পালন করে চলে।

পাঁচ বছর কাজ করেও বেতন নব্বুই টাকার বেশি হয়নি। এখনো স্টেশনারী ক্লার্ক। সারা দিন খাটুনির পর রাত্রিতে কিছুই লিখতে পারে না। মনে হয়, মস্তিষ্ক শূন্য। কত লেখবার ইচ্ছা, লিখতে পারে না। দেহ ও মন বিশ্রাম চায়, আবার কাজ করবার কথা উঠলে তারা বিদ্রোহ করে। কলম হাতে করে কাগজের উপর মাথা রেখে কাঁদতে ইচ্ছা হয় মোপাসাঁর।

ফ্লোবেয়ার সব জানেন। তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই। উপদেশ দেন। বলেন, এত সহজেই ভেঙ্গে প'ড়ো না। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটু অহঙ্কার না থাকলে কেউ বড় হতে পারে না। দুঃখবিলাসী হয়ে লাভ কি? আর একটি কথা। মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা ক'রো না। ওরা মূর্তিমতী একঘেয়েমি। মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশলে লেখা একঘেয়ে হয়ে পড়বে, বৈচিত্র্য থাকবে না। মনে রাখবে, আর্টের জন্য সব-কিছু ত্যাগ করতে হয়। শিল্পীর জীবন শিল্প-সৃষ্টির উপায় মাত্র; তার জীবন উপভোগের জন্য নয়, আর্টের বেদীমূলে তাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে দিতে হয়। দিনটা আপিসে বন্দী থাকতে হয়, কিন্তু রাতটা তো তোমার? সারা রাত লিখবে।

মোপাসাঁ বিশেষ উৎসাহিত হয় না। শুধু একটি উপায় আছে। হঠাৎ কোনো ভাবে যদি অনেক টাকা পেয়ে যায় তাহলেই মুক্তি পেতে পারে। তখন শুধুই লিখবে, লিখবে সারা দিন, সারা রাত। অশ্রান্ত ভাবে। আর কোনো পথ নেই।

ওদিকে মা ঘন ঘন চিঠি লেখেন। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কবে ছেলের লেখা বেরুবে, কবে সাহিত্যিকের মর্যাদা পাবে, আর তাঁর বুক ভরে উঠবে, স্বপ্ন সফল হবে? এখনো কি সময় হয়নি চাকরি ছেড়ে সাহিত্য-চর্চা করবার? লিখে কি নিজের খরচটাও চালাতে পারবে না?

ফ্লোবেয়ার উত্তর দেন, এখনো সময় হয়নি।

১৮৭৫ সালে বন্ধু রবার্ট প্যাঁশোঁর সঙ্গে একটি নাটক সম্পূর্ণ করল মোপাসাঁ। মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থাও হল। নাটকের কাহিনী একটি পতিতালয় কেন্দ্র করে রচিত। এক নবীন দম্পতি প্যারিসে এসে পতিতালয়কে হোটেল মনে করে প্রবেশ করায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই নাটকের বিষয়-বস্তু। মোপাসাঁ নিজে এক পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করল। রীতিমতো অশ্লীল চরিত্র। তবু ফ্লোবেয়ারের মোটামুটি নাটকের অভিনয় ভালোই লাগল।

নাটকের উপর ঝোঁক পড়েছে মোপাসাঁর। হয়ত অবজ্ঞাত কেরাণী সফল নাটক রচনা করে নাটকীয় ভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। শীতের ক'টা মাস অসাধারণ পরিশ্রম করে আর একটি নাটক সম্পূর্ণ করল। কিন্তু প্রযোজক পাণ্ডুলিপি দেখে বলল, লেখক যদি সকল ব্যয় বহন করে তবেই এ নাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। না হলে নয়। এত দিনের কঠোর পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কবিতাও লিখছে মোপাসাঁ। তার কবিতা নারীদেহের উষ্ণমণ্ডলের উর্দ্ধে উঠতে পারে না। এই ত্রুটি সত্ত্বেও ফ্লোবেয়ারের সুপারিশে তার ক'টি কবিতা পত্রিকায় ছাপা হল। দু-একটি ছোটোখাটো লেখা এর পূর্বে যদিও বেরিয়েছে, তবু লেখক হিসাবে প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম স্বীকৃতি পেল। কবিতার নাম ছিল 'নদী-তীরে'। লেখক হিসাবে মোপাসাঁ নিজের নাম দেয়নি; তার ছদ্মনাম গী দ্য ভ্যালমঁ ব্যবহার করেছে। ১৮৭৬ সাল থেকে ফ্লোবেয়ারের সহায়তায় বিভিন্ন পত্রিকায় মোপাসাঁর লেখা বেরুতে লাগল। আর তার ফলে দ্বিগুণ উৎসাহে লিখতে আরম্ভ করল মোপাসাঁ। আপিস থেকে ফিরে নাটক নিয়ে

বসে। মাকে লিখেছে গল্পের প্লট পাঠাতে। আপিসে কাজের ফাঁকে গল্প লিখবে।

লেখক হিসাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করতে না করতেই শরীর ভেঙ্গে পড়ল। বিকেলবেলা প্রায়ই মাথা ধরে, চোখ জ্বালা করে, সমস্ত মুখ গরম হয়ে ওঠে, চোখের সামনে সব অন্ধকার। লেখা পড়ে থাকে। লেখার জন্য মনে ব্যাকুলতার শেষ নেই, কিন্তু কলমের মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোয় না। মোপাসাঁ ভাবে, আপিসের বদ্ধ ঘরে এতক্ষণ কাজ করতে হয় বলেই বুঝি শরীরের এই অবস্থা হয়েছে। যেদিন শরীর একটু ভালো থাকে সেদিন আবার ডুবে যায় চরম উচ্ছৃঙ্খলতায়। কেউ দেখবার নেই, বাধা দেবার নেই; দেহের যন্ত্রণা এবং মনের হতাশাকে সুরা ও নারী দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়।

ছুটি নিয়ে সুইজারল্যাণ্ড বেড়িয়ে এল। ফল হল না। বাইরে থেকে শরীর খারাপ মনে হয় না। কারণ, রোগ তখন মাত্র রক্তে প্রবেশ করেছে। বাইরে প্রকাশের এখনো দেরি আছে। মোপাসাঁর রক্তে লক্ষ লক্ষ মাইক্রোব ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত ডাক্তার পরীক্ষা করল। মাইক্রোবের অস্তিত্ব কেউ ধরতে পারে না। তখনো সিফিলিসের বীজাণু চিহ্নিত করার উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। উপোস থেকে ওষুধ কিনে খায়। তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠতে হবে। সাহিত্য-জীবনের মাত্র আরম্ভ, এখন লিখতে না পারলে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনো আশা নেই। যে পরম শত্রু দেহের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে মোপাসাঁর তার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। ফ্লোবেয়ারকে সে লিখছে: আপিসের কাজ আমাকে শেষ করল। প্রত্যহ স্টেশনারীর হিসাব রাখতে রাখতে মাথা শূন্য হয়ে গেছে। রোজ আপিস থেকে বেরিয়ে মনে মনে সেণ্ট অ্যান্থনির মতো বলি, আর একদিন, হে ঈশ্বর, আর একটা দিন কাটল। নির্বোধ সহকর্মী ও উপরওয়ালার সাহচর্যে দিনগুলি দীর্ঘতর ও অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।

ফ্লোবেয়ারের এক বন্ধু নতুন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। মোপাসাঁ এই সুযোগ নিয়ে নৌ-বিভাগ থেকে বদলী হয়ে এল শিক্ষা বিভাগে। বেতন এক; এখানে খাটুনি কম এই সুবিধা। আপিসে বসেও কিছু কিছু লিখতে পারবে। মোপাসাঁর বয়স তখন উনত্রিশ। সে বছরই মোপাসাঁর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা Le mur (প্রাচীর) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বিপদ বাধাল। অশ্লীলতার অভিযোগে লেখককে অভিযুক্ত করা হল সরকারের পক্ষ থেকে।

বিচারে শাস্তি হলেই চাকরি যাবে। কিছু দিন বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল। আদালতে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হল মোপাসাঁকে। শাস্তি হবে, এটাই প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্লোবেয়ারের সাহায্যে মুক্তি পেয়ে গেল।

প্যারিসের তরুণ মহলে তখন ধীরে ধীরে জোলার প্রভাব বাড়ছে। ফ্লোবেয়ারের দীর্ঘকালের নীরবতা জোলার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিতে সহায়তা করল। ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে মোপাসাঁ আজকাল জোলার শহরতলীর বাড়ি যায়। জোলাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছে। চক্রের সভ্যদের প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের উপর আস্থা নেই। অলঙ্কার ও স্টাইলের কসরতে সাহিত্যের প্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাকে মুক্তি দিতে হবে। মুক্তি আছে জীবনের নগ্ন, নিরলঙ্কার, বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে। জীবনের সহজ সরল পথ থেকে ফরাসী উপন্যাস বিচ্যুত হয়েছে। আচ্ছন্ন হয়ে আছে কল্পনার ধোঁয়াটে পরিমণ্ডলে। উপন্যাসের সঙ্গে দৈনন্দিন মাটির জীবনের নতুন করে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। রাজনীতি বা দর্শনের মতবাদ প্রকাশের জন্য সাহিত্য নয়। জীবনকে প্রকাশের জন্যই সাহিত্য। পরিপূর্ণ জীবন। তার ভালো আর মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, সুন্দর ও অসুন্দর। নতুন কনের মতো প্রসাধনের প্রলেপ দিয়ে জীবনকে সাহিত্যের আসরে এনো না; তাহলে কিছু ফাঁকি থেকেই যাবে।

বাস্তব জীবনের ছবি সাহিত্যে প্রকাশ করবার এই আদর্শ তরুণদের সহজেই আকৃষ্ট করল। জোলার সাহিত্যচক্রে একে একে নবীন সাহিত্যিকরা এসে নাম লেখাল। শিল্পীরাও এলো কেউ কেউ। বাস্তববাদী সাহিত্যিক বলে এরা প্যারিসে পরিচিত হল।

এক দিন বিকালের সাহিত্যচক্রে ১৮৭০ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কথা উঠল। উপস্থিত সকলেই সেই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কেউ কেউ বলল, যুদ্ধ মাঝে মাঝে হওয়া ভালো; তার ফলে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত থাকে আমাদের মনে। মোপাসাঁ তীব্র ভাষায় যুদ্ধের প্রবৃত্তিকে আক্রমণ করল। কারণ যুদ্ধ মানুষের মনে হত্যার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। এমনি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ একজন প্রস্তাব করল, এই যুদ্ধ নিয়ে প্রত্যেকে একটি করে গল্প লিখলে কেমন হয়? সকলের মনে লাগল কথাটা। মন্দ হয় না লিখলে। জোলা উৎসাহ দিলেন। তিনিও লিখবেন। প্রকাশক ঠিক করবার ভারও রইল তাঁর উপর।

এই গল্পগুচ্ছে মোপাসাঁর দান Boule de suif (চর্বির তাল)। এক কাকার মুখে অনেক দিন আগে ঘটনাটি শুনেছিল। তার পর থেকে গল্পের প্লটটা মাথায় ঘুরছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে গল্প লেখার যখন তাগিদ এলো তখন এই গল্পটাই লিখতে বসল। লিখেছে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায়। অসহ্য মাথা ধরাকে অগ্রাহ্য করে মোপাসাঁকে লিখতে হয়েছে। যখন মাথার যন্ত্রণা কোনোক্রমেই অগ্রাহ্য করতে পারত না, তখন সে সময়কার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ওষুধ হিসাবে কানের কাছে পাঁচটা জোঁক লাগিয়ে কলম নিয়ে বসত। মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণার জন্য চোখে কিছুই দেখতে পেত না। মনের সামনেও অন্ধকার। অশ্লীল কবিতা রচনার দায়ে তখন আদালতে মামলা চলছে ; শাস্তি হলে চাকরি যাবে। ১৮৮০ সালের এপ্রিল মাসে সাহিত্যচক্রের গল্পগুচ্ছে গল্প এবং তার কাব্যগ্রন্থ Des Vers বেরুবার কথা। নবীন লেখক নিজের বই বেরুবার আগ্রহে এবং উত্তেজনায় দেহের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করে লেখা সম্পূর্ণ করল।

আশ্চর্য !· এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লেখা সত্ত্বেও গল্প সংকলনে 'এক তাল চর্বি' নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প বলে স্বীকৃত হল। আদালতের মামলা সম্পর্কে মোপাসাঁর নাম সংবাদপত্রের সাহায্যে পূর্বেই প্রচারিত হয়েছে। 'এক তাল চর্বি' ফ্রান্সের পাঠক-মহলে মোপাসাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করল। গল্পের আখ্যান ভাগে চমকপ্রদ কিছু নেই ; কিন্তু গল্পের বিন্যাস অপূর্ব।

প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জের তখনো চলছে। স্থূলকায়া এক পতিতা রোয়াঁ থেকে হাভরে যাচ্ছে। তার সহযাত্রীরা সবাই অভিজাত শ্রেণীর। একজন পতিতাকে নিজেদের মধ্যে দেখে তাদের মুখ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। পতিতার ছোঁয়া লেগে পাছে তাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই আশঙ্কায় সকলে ব্যস্ত। খাবার সময় দেখা গেল কারো কাছেই খাবার নেই, একমাত্র 'এক তাল চর্বি'র আছে ঝুড়ি-ভর্তি খাবার। অনেক দ্বিধার পর পতিতার হাত থেকে খাবার নিয়ে যাত্রীরা ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তি করল। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীরাও 'এক তাল চর্বির' দেওয়া খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য হল শেষ পর্যন্ত।

রাত্রিতে গাড়ী চলবে না। রাত কাটাতে হবে পান্থশালায়। ঐ অঞ্চলটা প্রাশিয়ানদের অধিকারে। প্রাশিয়ান সেনাধ্যক্ষ দাবি করল, 'এক তাল চর্বিকে' তার ঘরে রাতটা থাকতে হবে। এ প্রস্তাবে সম্মত না হলে কোনো যাত্রী মুক্তি পাবে না। সবাই প্রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে থাকবে।

স্থূলকায়া হলেও 'এক তাল চর্বির' দেহে তারুণ্যের দীপ্তি ছিল। তাই

সেনাধ্যক্ষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু 'এক তাল চর্বি' এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রবান যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল, শত্রুর হাতে বন্দী হতে হল বুঝি! সকলে মিলে ওকে চাপ দিতে লাগল রাজী হতে। বেশ্যাই তো? একটা রাত্রির জন্য এই ঢং করে লাভ কি? শুধু ওর একটা খেয়ালের জন্য এতগুলি লোকের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে। সকলের বিষদৃষ্টি পড়েছে তার উপর। পতিব্রতা নারী যাত্রীরাও তাকে অনুরোধ করছে রাতটা সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে কাটাতে। এত লোকের ব্যাকুল, স্বার্থপর অনুরোধের শরশয্যায় 'এক তাল চবি' অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। রাজী না হয়ে সে-ই যেন অপরাধ করেছে। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের একজন শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল; বলল, মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটা অন্যায় কাজ করলেও ঈশ্বর তাতে রুষ্ট হবেন না। 'এক তাল চর্বি' রাজী হল বিপন্ন সঙ্গীদের মুখ চেয়ে। না হয়ে উপায় ছিল না; সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

সম্মতি জানাবার পর যাত্রীরা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল, যেন কত দিনের ভাব। পরদিন সকালে এই বন্ধুত্ব চলে গেল। ও তো পতিতা; ভদ্রঘরের পতিব্রতা নারীরা ওর স্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে চলছে। খাবার সময় দেখা গেল আজ সব যাত্রীই আহার্য সংগ্রহ করে এনেছে; 'এক তাল চবির' মানসিক অবস্থা এমন ছিল না যে খাদ্য সংগ্রহ করবে, তার সঙ্গে খাবার নেই। সহযাত্রীরা তার সঙ্গে একটি কথাও বলছে না। স্থূলকায়া বলে সহজেই সে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে। বসে বসে দেখছে অন্য সকলের খাওয়া। কাল ওরাই তার ঝুড়িভর্তি খাবার সাগ্রহে নিঃশেষ করেছে। আজ ওকে কারো প্রয়োজন নেই, তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে না, এক টুকরা রুটি কেউ এগিয়ে দিচ্ছে না। ক্ষুধায়, অপমানে ওর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা মন্তব্য করলেন, কাল রাত্রিতে যা ঘটে গেল তার লজ্জায় ও কাঁদছে। সেই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী ওর মঙ্গল কামনা করে ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাল। কিন্তু কেউ তার কাছে এল না, জিজ্ঞাসা করল না খাওয়া হয়েছে কি-না। নীরব ও কঠোর উপেক্ষায় 'এক তাল চবিকে' যেন সমাজের দূষিত অঙ্গের মতো ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

একটি গল্প ফরাসী সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করল তার তুলনা নেই। একটি ছোট গল্প লিখে কোনো লেখক এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি এর আগে। ফ্লোবেয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করলেন। সাহিত্য-পত্রিকাগুলিতে

ভালো সমালোচনা হল। ইতিমধ্যে মোপাসাঁর কবিতার বইও বেরিয়েছে। পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে লেখার তাগিদ আসছে। তার বই বেশ বিক্রি হচ্ছে। কোনো কোনো সম্পাদক লেখার জন্য চুক্তি করতে প্রস্তুত। শুধু লিখে যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। এখন চাকরি ছেড়ে কেবল লেখা নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ভয় হয়। শরীর অসুস্থ, যদি যথেষ্ট পরিমাণে লিখতে না পারে? যদি লেখা ভালো না হয়? তাহলে তো উপোস করতে হবে। অনেক ভেবে আপিস থেকে এক বছরের ছুটি নিল।

দীর্ঘ দশ বছর পরে মুক্তি। মুক্তি আপিসের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে, মুক্তি ঘড়ির কাঁটার বন্ধন থেকে। অর্থাভাবের প্রাত্যহিক আশঙ্কা থেকেও রেহাই পেল।

মোপাসাঁকে সাফল্যের সূচনায় পৌঁছে দিয়ে ফ্লোবেযার পরলোক গমন করলেন। মোপাসাঁর এখন আব পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন নেই।

হাতে শুধু এক বছর সময়। এই এক বছরের মধ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারলে আবার ফিরে যেতে হবে আপিসের কারাগারে। রুটিন বেঁধে লিখতে আরম্ভ করল মোপাসাঁ। সবটুকু মন, সবটুকু শক্তি নিয়ে ডুবে গেল লেখার মধ্যে। প্রাণান্তকর উদ্যম; সম্মুখ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার মতো ঐকান্তিক চেষ্টা। নৌকো করে নদীতে বেড়ানো বন্ধ হয়েছে, বন্ধ হয়েছে সন্ধ্যার পরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বুলভার-এ ঘোরাফেরা; বন্ধুরা আড্ডা দিতে এসে ফিরে যায়। দুয়ার বন্ধ করে কেবল লিখছে। আজকাল ক্ষুদ্র কুঠুরী থেকে প্রশস্ত বাড়িতে উঠে এসেছে। তার লেখবার বড় ঘরটায় সর্বত্র পাণ্ডুলিপি, বই, পত্রিকা এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে। কোনো প্রকাশক বা সম্পাদককেই সে হতাশ করে না। তার রচনার পুঁজি অফুরন্ত। টাকাও আসছে প্রচুর। একটি ছোট গল্প বা প্রবন্ধের জন্য আজকের মূল্যমানে মোপাসাঁর দক্ষিণা ছিল প্রায় দু'শ সত্তর টাকা; এবং উপন্যাসের জন্য লাইন-পিছু আট আনার কিছু কম। নিজের জীবন নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস Une Vie (একটি জীবন) আট মাসে পঁচিশ হাজার কপি বিক্রি হল। গল্পের বইও বিক্রি হচ্ছে হাজার হাজার কপি। প্রকাশক ও সম্পাদকদের মধ্যে দক্ষিণার হার বৃদ্ধি করবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। প্রচুর টাকা হাতে আসছে, কিন্তু তার ফলে লেখার মান নিচু হয়নি। খ্যাতি রচনায় আনেনি অবসাদ ও অবহেলা। আরো ভালো লেখবার নিরন্তর সাধনা করছে।

এই সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে মারাত্মক রোগ। সিফিলিসের জীবাণু ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে উঠে আসছে। জীবাণুর সুড়সুড়িতে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, কিছু কালের জন্য আশ্চর্য সৃষ্টির ক্ষমতা পায়। যেমন পেয়েছিলেন হাইনে, বোদলেয়ার, নীট্‌শে। এঁদেরও ছিল সিফিলিস। আর পঞ্চাশ বৎসর পরে জন্ম হলে মোপাসাঁর রোগ ধরা পড়ত, চিকিৎসাও হত। তখনো সিফিলিসের জীবাণু আবিষ্কৃত হয়নি। মোপাসাঁ ডাক্তারের দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে। কেউ বলে পেটের অসুখ, কেউ বলে আসলে এটা চোখের রোগ, এমনি আরো কত্তো কি! ওষুধে অরুচি নেই। যে যা বলে সব ওষুধ সাগ্রহে পরীক্ষা করে দেখে। শহরের ডাক্তারদের ছেড়ে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে যায়। বহুমূল্য ডাক্তারী ওষুধ থেকে টোটকা,—কিছুই বাদ যায় না।

মোপাসাঁ চব্বিশ ঘণ্টা লিখতে চায়; কিন্তু রোগের যন্ত্রণা তাকে লিখতে দেয় না। যেটুকু লিখতে পারে তাই আশ্চর্য শিল্পকর্ম হয়। জীবাণুর দল মস্তিষ্ক উত্তেজিত করে মোপাসাঁর সৃষ্টি-প্রতিভাকে সক্রিয় করে তুলেছে।

মোপাসাঁর খ্যাতি বাড়ছে প্রতিদিন। ফ্রান্সের সীমানা পার হয়ে সে খ্যাতি য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ছে। প্যারিসের রেস্তোরাঁয়, আড্ডায় তাকে নিয়ে নিত্য-নতুন গুজব সৃষ্টি হয়। মোপাসাঁর অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অসুস্থ দেহে কেউ এমন আশ্চর্য ভালো লিখতে পারে? আর লিখছেও তো প্রচুর! শ্লট মেসিনের মতো। নির্দিষ্ট দক্ষিণা দিলেই লেখা বেরিয়ে আসে। সাধারণ লোকের তো দূরের কথা, ডাক্তাররাই তার অসুখের কথা বিশ্বাস করে না। কারণ, রোগ নির্ণয় করতে পারেনি তারা। ডাক্তাররা ভাবে মোপাসাঁ একটি বিশেষ ধরনের উপন্যাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছে, অসুখটা শুধু ভাণ।

খ্যাতি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা কিছুরই অভাব নেই। চাকরিতে ফিরে যাবার আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু তবু শান্তি নেই। অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা! একটু সহানুভূতি জানাবার, একটু সেবা করবার মতো কেউ নেই। মা থাকেন দূরে, তিনিও অসুস্থ। পুত্রের সাফল্য অসুস্থতার মধ্যে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। নিজের অসুখের কথা জানিয়ে মা'র এই সান্ত্বনাটুকু কেড়ে নিতে চায় না মোপাসাঁ। প্রায়ই রাত্রিতে ঘুম আসে না। সারা রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। প্রচণ্ড বেদনায় মাথাটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়তে চায়। চোখের সামনে সবকিছু আবছা দেখায়। ঘরের দেয়ালগুলি যেন কাঁপতে থাকে।

একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়না হাতে করে বসে থাকে মোপাসাঁ। নিজের বেদনা-বিকৃত মুখের ছবিটার মধ্যে কি যেন আকর্ষণের বস্তু আছে। ছবিতে বেদনা ফুটে উঠবে এই আশঙ্কায় মোপাসাঁ কখনো নিজের ছবি ছাপতে অনুমতি দেয়নি। কখনো কখনো মনে হত চোখের দৃষ্টি বুঝি হারাতে হবে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য চোখে কিছুই দেখতে পায় না। চোখের ডাক্তারের কাছে ঘুরে ঘুরেও ব্যর্থ হয়। কেউ রোগ নির্ণয় করতে পারে না।

যখন ভালো থাকে তখন এই যন্ত্রণার কথা একেবারেই ভুলে যায়। শুধু লেখায় থাকে সংযম ; অন্য সকল ব্যাপারে চরম অসংযমী। নারী আর সুরা পেলে রোগ-যন্ত্রণার কথা মনে থাকে না। এখন মোপাসাঁকে প্যারিসের অন্ধকার বুলভার থেকে সস্তার সঙ্গিনী খুঁজে নিতে হয় না। তার প্রেমের কাহিনী প্যারিসের মেয়ে-মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কাহিনীর নায়কদের সঙ্গে মোপাসাঁকে তারা অভিন্ন করে দেখে। মোপাসাঁর একটু কৃপাদৃষ্টি পেলে অনেক মেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করে। অটোগ্রাফের খাতার মতো তারা দেহ এগিয়ে দেয় ; সগৌরবে মোপাসাঁর দেহের স্বাক্ষর এঁকে নিয়ে যাবে।

(মোপাসাঁ বলে, আমি মেয়েদের ভালোবাসি না, ওরা আমাকে শুধু আমোদ দেয়। মেয়েরা তাদের দেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের পক্ষে এটা প্রয়োজন। তারা 'ইটার্ণাল হার্লট।')

মোপাসাঁ বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গেই পরিচিত। সুতরাং শোপেন-হাওয়ারের মতো নারী-বিদ্বেষী হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। এ জন্যই বিবাহে তার গভীর বিতৃষ্ণা। বন্ধু-বান্ধব কেউ বিয়ের কথা তুললে হেসে বলে, বিয়ে ? বিয়ের মানে তো দিনের বেলা বদমেজাজের বিনিময়, আর রাত্রিতে বিনিময় বদগন্ধের !

যে প্যারিসে প্রথম এসে কত দিন অনাহারে থাকতে হয়েছে, আজ সেই প্যারিসের উপর মোপাসাঁ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পেরেছে। এখন প্যারিসের অভিজাত মহলে তার অবারিত দ্বার। প্রত্যহ কত ভোজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দিতে হয়। শুধু উদার ভাবে গ্রহণ করে বড় ঘরের মেয়েদের গোপন আমন্ত্রণ। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ছিল তার স্বভাবের মধ্যে। সিফিলিসের জ্বালা তাকে শতগুণ বাড়িয়েছে। এভাবে চললে আর ক'দিন বাঁচবে ? শুভানুধ্যায়ীরা আশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু মোপাসাঁ কান দেয় না। শুধু মাঝে মাঝে প্যারিসের জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে একঘেয়েমির জন্য। বাইরে থাকলে

হয়ত রোগ-যন্ত্রণার লাঘব হবে, মন সজীব হবে, লেখায় আসবে নবীন সরসতা। তাই সে প্যারিসের বাইরে গ্রামাঞ্চলে নিজের বাড়ি তৈরী করবে বলে স্থির করল। বাড়ি করবার মতো টাকার অভাব নেই। এখন সে ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক। য়ুরোপের অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছে তার লেখা। শুধু রাশিয়া আগ্রহান্বিত ছিল না। তুর্গেনিভ নিজে মোপাসাঁর 'একটি জীবন' উপন্যাসটি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশক না পাওয়ায় কিছু দূর অগ্রসর হয়েই অনুবাদ বন্ধ করতে হল।

নিজের তত্ত্বাবধানে বাড়ি তৈরী করল মোপাসাঁ। প্যারিস থেকে দূরে, স্টেশন থেকেও অনেকটা হেঁটে যেতে হয়। চার দিকে ফুলের বাগানের মধ্যে ছবির মতো বাড়িটি। কিছু দূরে সমুদ্র। এখানে এসে মোপাসাঁ মুক্তি পেল সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রণয়িনীদের হাত থেকে। এখন সময় কাটে শিকার করে, সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আর লিখে। কিন্তু বেশি দিন নিজেকে নিয়ে কাটল না। অতিথি আসতে আরম্ভ করল। মেয়েরাই বেশি। প্যারিস থেকে আসে, কয়েক দিন খুব হৈ-চৈ করে, তার পর চলে যায়।

তা ছাড়া এখানকার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও মোপাসাঁ ছিল কৌতুকপ্রিয়। প্রায়ই তা মেয়েদের কেন্দ্র করে অশ্লীলতায় পর্যবসিত হত। একবার মোপাসাঁ তার এক প্রতিবেশিনীকে এক-ঝুড়ি ব্যাঙ উপহার পাঠাল। বেশ সুন্দর ভাবে সাজানো ঝুড়ি খুলতেই যখন একের পর এক ব্যাঙ লাফিয়ে পড়তে আরম্ভ করল তখন ভদ্রমহিলার কী অবস্থা! হয়ত অতিথিরা শেষ গাড়ীতে প্যারিস ফিরে যাবে, মোপাসাঁ সকলের অজ্ঞাতে বাড়ির সবগুলি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে রেখে গাড়ী ফেল করিয়ে দিল।

এই মফঃস্বলের বাড়িতে মোপাসাঁ প্রতিদিন নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ গড়ে কুড়িটা পায়। সকালের ডাকে ভক্তদের কাছ থেকে ষাট-সত্তরখানা চিঠি আসে। তবু প্যারিসের উন্মাদনা নেই এখানে। লেখার সময় অনেক বেশি। রোগের যন্ত্রণা নিত্যসঙ্গী। এখানে বিশ্বস্ত পরিচারক ফ্রাঁসোয়াকে পেয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণার সময় সে দেখাশোনা করে,—এইটে মস্ত বড় সান্ত্বনা।

১৮৮৫ সালে মোপাসাঁর পাঁচখানি বই সমাপ্ত হল। সংখ্যার দিক থেকে এটাই মোপাসাঁর সব চেয়ে সৃষ্টিশীল বৎসর। রোগের বিষক্রিয়া মস্তিষ্কে চরম উত্তেজনা এনেছে; এর পর ধীরে ধীরে অবসাদে ডুবে যাবে। মোপাসাঁর

দ্বিতীয় উপন্যাস Bel-Ami খুব জনপ্রিয়তা লাভ করল। উপন্যাসের নায়ক জীবনে সাফল্য লাভ করবার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করতেই দ্বিধা করেনি। জাগতিক উন্নতির শীর্ষে ওঠবার জন্য সে ন্যায়-অন্যায় বোধ জলাঞ্জলি দিয়েছিল। মোপাসাঁর কোনো রচনাতেই সমসাময়িক সমাজের কথা এতটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

এক বছরে পাঁচখানি বই সৃষ্টির তাগিদে লেখেনি। প্রয়োজনের তাগিদ এখন বড় হয়ে উঠেছে। আয় যেমন, ব্যয়ও তেমনি। বিলাসিতা বেড়েছে, অতিথি-অভ্যাগত আসছে ক্রমাগত। তা ছাড়া আছে রোগের চিকিৎসা। চিকিৎসার চেষ্টা মিথ্যা, তবু চলছে। মোপাসাঁ হতাশ হয় না; এক ডাক্তার কিছু না করতে পারলে আর একজনকে ডাকে। এক ওষুধে ফল হয় না, আর এক ওষুধ খায়। যে যা বলে তাই শোনে। সেই চিকিৎসা করে। ঘরটা যেন একটা ওষুধের দোকান হয়ে উঠেছে।

মোপাসাঁ নিজে বুঝতে পারে তার মধ্যে দ্রুত একটা কী পরিবর্তন আসছে! ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও দু'একজন তা বুঝতে পেরেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কখনো বা উপচে ওঠে অকারণ খুশিতে। আবার কখনো কথা বন্ধ করে অকস্মাৎ উদাসীন হয়ে যায়, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। আর এসেছে দেহে-মনে একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারে না, এক কথা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। ফরাসী লেখকরা জাতচঞ্চল। ভ্রমণ তাদের লেখার প্রেরণা দেয়। কিন্তু মোপাসাঁর তেমন নয়। হয়ত নিজের বাড়িতে আর ভালো লাগছে না, গেল প্যারিস। নগরীর কোলাহলে দু'দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এল সমুদ্রতীরে; তার প্রিয় প্রমোদ-নৌকা 'বেল-আমি'তে কাটল কয়েক দিন। আবার গেল মা'র কাছে। সেখান থেকে উষ্ণ প্রস্রবণ-সন্নিহিত কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে। এমন করে ঘুরে ঘুরে ভুলতে চায় মনের মধ্যে যে আশঙ্কাটা দেখা দিয়েছে তাকে। সে কি পাগল হয়ে যাবে? অনেক দিনের একটা গোপন ভয় তার। বই সংগ্রহ করে পড়েছে পাগলের লক্ষণ, তাদের মনস্তত্ত্ব। নিজের মানসিক লক্ষণ ও আচার-ব্যবহার তুলনা করে দেখে। আজকাল যেন কিছু কিছু মিল দেখতে পায়। কাউকে বলতে পারে না। এমন কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। তা ছাড়া একবার বাইরে প্রকাশ পেলে তো রক্ষা নেই। তার তো শত্রু কম নয়! বিশেষ করে মেয়েরা। যারা চিরদিনের শয্যাসঙ্গিনী হতে চেয়ে শুধু ক্ষণিকের

আমোদের বস্তু হয়ে অপমানে মুখ কালো করে গেছে, তারা শত্রুসৈন্যের মতো সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করে আছে; একটু খুঁত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। মোপাসাঁর মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পাগল হবার খবর ফ্রান্সের কোন্ কাগজ ফলাও করে না ছাপবে? ডাক্তারদেরও বলতে পারে না। ডাক্তারদের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাগলের লক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। ডাক্তাররা অধৈর্য হয়ে উঠলে, অথবা কিছু সন্দেহ করছে এরূপ বুঝলে মোপাসাঁ হেসে বলত, আমার নতুন উপন্যাসের জন্য এসব খবর দরকার।

মোপাসাঁর দীর্ঘ সবল চেহারা দেখে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না তার কোনো অসুখ আছে। ফ্রাঁসোয়া জানে তার অবস্থা। শিশু যেমন রাত্রিতে একা শুতে ভয় পায়, মোপাসাঁরও আজকাল তেমনি ভয় হয়। সারা রাত তার ঘরে বাতি জ্বলতে থাকে। অন্ধকারে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে। মাথায় যত উদ্ভট কথা ভিড় করে আসে। চোখ বুজলে কত সব ছায়াছায়া ছবি দেখে। বড় একা সে। পাগল হবার আতঙ্ক আর রোগ-যন্ত্রণা ছাড়া তার কোনো সঙ্গী নেই। ঘরের ঐ শাদা দেয়ালগুলি যেন নিঃসঙ্গতার জীবন্ত প্রতীক। এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার কথা মোপাসাঁ বলেছে তার পরবর্তী উপন্যাস Mont-Oriol-এ। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে মানুষ পাশাপাশি পথ চলছে, কিন্তু তথাপি মানুষে মানুষে মিলন হয় না, মিলনের কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি এখনো। আশ্চর্য এই যে, সৃষ্টির প্রথম থেকে মানুষ তবু অশ্রান্ত কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছে পরিপূর্ণ মিলনের। চিরদিনের নিঃসঙ্গ যে আত্মা দু'টি কঠিন খোলসের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, তারা বাহু, ঠোঁট আর উত্তেজনায় কম্পমান দেহ নিয়ে মিলনের সাধনা করছে। মিলন তো হয় না। শুধু সেই সাধনার ফলে জন্ম হয় আর একটি নিঃসঙ্গ প্রাণের!

Mont-Oriol মোপাসাঁর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। মোপাসাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের অভিযোগ এই যে, তার রচনায় কোনো প্রকার দার্শনিক মতবাদের ছায়া পর্যন্ত নেই। মাত্র এই উপন্যাসটির মধ্যে মোপাসাঁর জীবন-দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু হয়ত সেই জন্যই Mont-Oriol 'বেল-আমির' মতো জনপ্রিয় হতে পারেনি।

এরপর বেরুলো Le Horla। এই কাহিনীতে আছে মানসিক বিকৃতির আশ্চর্য নিপুণ বিশ্লেষণ। মোপাসাঁ নিজের মানসিক লক্ষণগুলি সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে যে-সব তথ্যানুসন্ধান করেছে একটি গল্পকে কেন্দ্র করে তাদের সে

বৈজ্ঞানিকের মতো লিপিবদ্ধ করেছে। উন্মাদ রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল মোপাসাঁর নির্ভুল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। তথ্য ছাড়া আছে লেখকের মনের আশঙ্কা। লেখকের মনের গোপন ভয় যেন অনুভব করা যায় প্রতি পৃষ্ঠায়।

পর পর দুটি বই শেষ করে মোপাসাঁ বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বেড়াতে গেল অ্যাল্‌জিরিয়া। ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে যাতায়াতটা বেশ ভালো লাগল। শরীরও কিছু দিন সুস্থ ছিল। দেশে ফিরে আসবার কিছু দিন পর থেকেই আবার দেহ ভেঙ্গে পড়ল। এবার রোগের প্রকোপটা যেন আরো বেশি। ১৮৭০ সালের যুদ্ধের ছায়ায় লেখক-জীবন আরম্ভ করেছে বলে মোপাসাঁ দুঃখবাদী এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। তার চোখে ঈশ্বর শুধু অত্যাচারের যন্ত্র। ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলে হয়ত রোগযন্ত্রণা একটু লঘু হতে পারত, একটু সান্ত্বনা পেত।

অ্যাল্‌জিরিয়া থেকে ফিরে এসে তার একটা নতুন মানসিক লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। সব সময় কেবল মনে করে, লোকে তাকে অসহায় ভেবে তার উপর অত্যাচার করবার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং সে যে অসহায় নয় সেটা প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগল। নিজের সম্বন্ধে কোনো আলোচনা শুনতে চায় না। নিজের ছবি কোথাও দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার এক প্রকাশক একটি বইয়ের নতুন সংস্করণে লেখকের ছবি ছাপিয়েছে। নিজের ছবি দেখতে পেয়ে মোপাসাঁ প্রকাশককে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না, তাব নামে মকদ্দমা রুজু করে দিল। 'লে ফিগারো' পত্রিকায় বহুদিন থেকে লিখে আসছে ; বিশেষ কারণে একবার একটা লেখা থেকে দু'চার লাইন বাদ দিতে হল। মোপাসাঁ তাই নিয়ে তুমুল কলহ শুরু করে দিল। বিশ্বস্ত প্রকাশকদের হিসাব-পত্র মোপাসাঁ কখনো দেখতে চায়নি। এখন সে তাদের সঙ্গে কেবল পাওনা নিয়ে তর্ক করে। সন্দেহ হয়, তাকে সবাই ঠকাচ্ছে।

১৮৮৮ সালের শেষের দিকে মোপাসাঁ একটি আকস্মিক আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ছোট ভাই হার্‌ভের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। প্রায় উন্মাদ। তাকে চিকিৎসার জন্য উন্মাদ-আশ্রমে দিতে হবে। খুব কৌশলের সঙ্গে ভুলিয়ে উন্মাদাগারে নিয়ে যাওয়া চাই। একটু বুঝতে পারলেই গোলমাল বাধাবে। আর কোনো লোক নেই। মোপাসাঁর উপরেই এ কাজের ভার পড়ল। কথা

বলতে বলতে হার্ভেকে নিয়ে উন্মাদাগারে প্রবেশ করে এগিয়ে গেল। তার পর মোপাসাঁ। তাড়াতাড়ি গেটের বাইরে চলে এল, পেছন থেকে প্রহরীরা হার্ভেকে জোর করে ধরে রাখল। মোপাসাঁর ফিরে চাইবার মতো সাহস নেই, সে দ্রুত সামনে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শুনতে পাচ্ছে হার্ভের মর্মভেদী আর্তনাদ : 'দাদা, তুই আমাকে পাগলা-গারদে দিয়ে গেলি? আমি তো পাগল নই ; আমাদের পরিবারের পাগল তো তুই ; তোকেই তো লোকে পাগল বলে!'

মোপাসাঁ দু'কানে আঙুল দিয়ে অস্থির ভাবে ছুটে পালালো। হার্ভে বেশি দিন বাঁচেনি। তার মৃত্যু মোপাসাঁকে জীবন্মৃত করে রেখে গেল। এত দিন মোপাসাঁর তবু একটু ক্ষীণ আশা ছিল। ভাবত, হয়ত সত্যি তার মধ্যে পাগলের কোনো লক্ষণ নেই ; অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ায় এবং সংযমহীনতার জন্য মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়েছে। কিন্তু এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই। হার্ভে প্রমাণ করে দিয়ে গেল পাগলামির জীবাণু তাদের রক্তে,—তাকে এড়ানো যাবে না। দিন-রাত সব সময় কানে বাজতে থাকে, 'তুই পাগল, দাদা, তুই পাগল!'

এরপর থেকে মোপাসাঁ সহজে কিছু লিখতে পারে না। সামান্য একটু অসুবিধা ঘটলেই লেখা বন্ধ হয়ে যায়। এই বুঝি কোথায় একটু শব্দ হল, একটু শীত লাগছে, না হয় লাগছে গরম, আর কলম চলে না। অথচ কিছু দিন আগেও মোপাসাঁর কলম দিয়ে নেমে এসেছে সৃষ্টির বন্যা,—অনাহার, অনিদ্রা, রোগ-যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে। এখন সে নতুন মানুষ হয়ে গেছে, তাই পারে না। সব সময় যেন অসংখ্য কালো কালো ছায়ামূর্তি তাকে ঘিরে থাকে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে হয় তাকে একটা প্রকাণ্ড বড় কুকুর তাড়া করছে। কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভূত দেখতে পায়। এক দিন রাত্রিতে মোপাসাঁর ঘর থেকে আর্তনাদ ভেসে এল। ফ্রাঁসোয়া আলো হাতে করে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। হাজার হাজার মাকড়সা নাকি মোপাসাঁর ঘর আক্রমণ করেছে, তাই মোপাসাঁ চীৎকার করে উঠেছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফ্রাঁসোয়া একটি মাকড়সাও বের করতে পারল না। অকারণেও রাত্রিতে ফ্রাঁসোয়াকে বার বার ডাকে। ভয় করে। একটা অনির্দেশ্য ভয়। মাঝে মাঝে দেখে যেন তার সামনে এসে বসেছে আর একজন মোপাসাঁ, বসে মৃদু মৃদু হাসছে তার মুখের দিকে চেয়ে।

অনেক দিনের অনেক পুরনো তুচ্ছ কথা আজকাল স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে। কত কুমারী মেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল লাজ-নম্র ভঙ্গীতে, আর সে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত অনুশোচনা হয় এখন। আটত্রিশ বছর বয়সে ফ্রাঁসোয়ার কাছে চুপি চুপি স্বীকার করেছে, হয়ত একটি মেয়েকে পেলে সুখী হতে পারত। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনীর সংখ্যা তো কম নয়! তারা একটি মেয়ের জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সম্ভাবনা লোপ করতে চায়নি। শত শত মেয়ের মধ্যে মোপার্সাঁ ঐ একটি মাত্র মেয়েকেই পছন্দ করেছিল। সে মেয়েটির পরিচয় কেউ জানে না।

হার্ভের মৃত্যুর পর মোপার্সাঁর দু'টি বই বেরিয়েছে,—Pierre et Jean ও Fort comme la Mort. পূর্ববর্তী রচনার সজীবতা নেই এদের মধ্যে। বলিষ্ঠতার পরিবর্তে আছে সূক্ষ্ম কলাকৌশল, জীবন-প্রবাহ এসেছে স্তিমিত হয়ে, সম্বল হয়েছে মনোবিশ্লেষণ। শেষোক্ত গ্রন্থে নায়কের মুখ দিয়ে মোপার্সাঁ নিজের কথাই বলছে: আমার মতো বয়স্ক অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তিটা আসলে মুক্তি নয়, শুধু শূন্যতা। শূন্যগর্ভ জীবন। সব-কিছুতেই শূন্যতার অবসাদ। জীবনের রুক্ষ পথটা মৃত্যুর বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়েছে, চোখ তুললেই যেন মৃত্যুর নিশানাটা চোখে পড়ে। স্ত্রী-পুত্র নেই যে তারা সেই পথের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আড়াল করে রাখবে। সব সময় মনে প্রশ্ন জাগে, 'আমি কী করব? কোথায় গেলে একজন সঙ্গী পাবো? বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্নেহ-মমতার ক্ষুদ-কুঁড়া কুড়িয়ে বেড়াই, কিন্তু তাতে পেট ভরে না!

১৮৯০ সালে মোপার্সাঁর নাটক Notre coeur মঞ্চস্থ হল বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। এখন আবার মঞ্চের দিকে ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু নতুন সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, পুরনো গল্পগুলির নাট্যরূপ দিচ্ছে। দশ বছরে সাতাশখানা বই লিখেছে। সৃষ্টির উৎস শুকিয়ে গেছে। অনেক আগেই সে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ত, বদ্ধ পাগল হয়ে যেত। শুধু তার অসাধারণ মনের জোর এখনো তাকে রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু আর আশা নেই। এখন কথায় ও কাজে অসংলগ্নতা দেখা দিয়েছে; লোকের নাম ভুলে যায়, প্রসঙ্গ মনে থাকে না, শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কোন্ অতল গহ্বরে যেন একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে। ঘুমন্ত, মোহাচ্ছন্ন মানুষের মতো অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যায়। বোধশক্তি এখনো লোপ পায়নি। বুঝতে পারে, কি ভয়ঙ্কর পরিণতির পথে অনিবার্য গতিতে সে

এগিয়ে চলেছে। রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা করা। কিন্তু বৃদ্ধা মা'র করুণ মুখের ছবি তাকে বাধা দেয়। আর একটি বন্ধন হারুভের অনাথা ছোট মেয়েটি। মোপাসাঁ গেলেই 'জ্যাঠা!' বলে ছোট দু'টি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। তা ছাড়া মোপাসাঁ এখন যেমন ভূত, কুকুর ও মাকড়সার ছায়া দেখে তেমনি মাঝে মাঝে দেখে আশার ছায়া। হয়ত ভালো হয়ে যাবে।

লোকের কাছে আর গোপন নেই মোপাসাঁর মানসিক পরিবর্তনের কথা। খবর পৌঁছেচে প্যারিসে। এক দিন সকালে প্যারিস থেকে একটি কাগজ এল মোপাসাঁর হাতে। প্রথম পৃষ্ঠায় মোপাসাঁর মানসিক লক্ষণ বিশ্লেষণ করে একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। এই কাগজের সম্পাদক কতবার ধন্না দিয়েছে তার একটি লেখার জন্য। মোপাসাঁ সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি নীরবে পড়ে শেষ করে। দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে কাগজটা ধরে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চোখ জ্বালা করে, মাথা চন্‌চন্‌ করে, কিন্তু মানহানির মামলা দায়ের করবার কথা মনে আসে না। প্রতিবাদ করবার জন্য যে নিম্নতম শক্তিটুকু প্রয়োজন তা আর অবশিষ্ট নেই। দেহ অবসন্ন, মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত। কথা দিয়ে, লেখা দিয়ে, প্রতিবাদ জানাবার মতো শক্তি নেই। যত পারো আঘাত করো তোমরা। প্রতিভার হাতী ভাগ্যের ফাঁদে পড়েছে।

১৮৯২ সাল, ১লা জানুয়ারি। বছরের প্রথম দিনে মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করল। কিন্তু ক্ষুরটা ধরতে পারছে না, হাত কাঁপছে। আয়নাতে মুখও দেখতে পাচ্ছে না। চোখের সামনে একটা কুয়াশার ভারি পর্দা ঝুলছে। সেই কুয়াশার মধ্যে শুধু দেখতে পাচ্ছে মা'র মুখ। নতুন বছরে মা তাকে কাছে ডাকছেন। কিন্তু মোপাসাঁর নড়বার ক্ষমতা নেই। চেয়ারের উপর দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বসে পড়ল।

কয়েক ঘণ্টা পরে একটু ভালো বোধ হল শরীর। গেল মা'র সঙ্গে দেখা করতে। ছেলের অবস্থা দেখে মা শঙ্কিত হলেন। ধরে রাখতে চাইলেন তাকে নিজের কাছে। মা'র বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মোপাসাঁ ছুটে পথে বেরিয়ে এল।

সেদিন রাত্রিতে পিঠে অসহ্য বেদনায় ছটফট করতে লাগল মোপাসাঁ। কি একটা অদ্ভুত দুর্বলতা তাকে গ্রাস করেছে। সমস্ত দেহটা যেন আলগা হয়ে খুলে পড়ছে, হাড় থেকে মাংস, মাংস থেকে শিরা-উপশিরা। আর সে

সইতে পারে না। ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা বের করল, তাক করল কপাল লক্ষ্য করে। কিন্তু এ কি, গুলি নেই! ফ্রাঁসোয়া গুলি সরিয়েছে ; শান্তির পথে বাধা দিল, সে তার শত্রু।

রাত প্রায় দু'টা। গোঙানির শব্দে ফ্রাঁসোয়ার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি এসে দেখে মোপাসাঁ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার কণ্ঠদেশ থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় রক্ত পড়ছে। চোখে বিভ্রান্ত, উন্মাদ দৃষ্টি। রিভলভার দিয়ে যা পারেনি কাগজ-কাটা বড় ছুরিটা দিয়ে তাই করতে চেষ্টা করেছিল, চেয়েছিল কণ্ঠনালী কাটতে।

ক্ষত গভীর নয়। ডাক্তার এসে সেলাই করে দিল, দিল ঘুমের ওষুধ। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে ; কিন্তু মনের ঘুম আর ভাঙল না। ফিরে এল না সহজ, সুস্থ, চেতনাবোধ।

৪ঠা জানুয়ারি প্যারিসের সকল সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হল মোপাসাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির খবর। কাগজের প্রতিনিধিরা দল বেঁধে প্যারিস থেকে এসেছে মোপাসাঁর বাড়িতে। বিশেষ খবর সংগ্রহ করতে চায় তারা। পাগল মোপাসাঁর একটা ছবি সংগ্রহ করতে পারলে, পাগলামির লক্ষণগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপাতে পারলে, পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্ত হবে। ফ্রান্স উন্মুখ হয়ে আছে আরো খবর জানবার জন্য। কৌতূহল সাংবাদিকদের নিষ্ঠুর করেছে। রুগ্ন মানুষটির স্বস্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে তাদের দ্বিধা নেই।

কয়েক দিন পরে মোপাসাঁকে পাঠানো হল একটি উন্মাদ-চিকিৎসালয়ে। এখানে উন্মাদ অবস্থায় মোপাসাঁ মাঝে মাঝে বলত ভগবানের কথা। অথচ এত দিন সে ধর্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছে। মোপাসাঁ বিদ্রূপ করে বলত, ধর্ম সংসারী লোকের কাছে ছাতার মতো। বৃষ্টি নামলে ছাতার কথা মনে পড়ে, তেমনি দুঃসময় এলে মনে পড়ে ধর্মের কথা। কোন্ বিচিত্র উপায়ে এই অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার মধ্যেও মোপাসাঁ হয়ত বুঝতে পেরেছিল তার চরম দুঃসময় এসেছে। তাই মাঝে মাঝে প্রার্থনার ভঙ্গীতে চোখ বুঁজে অনেকক্ষণ বসে থাকত ; পরিচারককে হঠাৎ আদেশ করত, ওরে, দরজা-জানালা খুলে দে ; শয়তান বেরিয়ে যাক্। আবার ডাক্তারকে সামনে পেয়ে বলত, শোননি ডাক্তার, ঈশ্বর ইফেল টাওয়ারের চূড়া থেকে ঘোষণা করেছেন, আমি তাঁর ছেলে ?

নিজের ঘরে একা একা কথা বলে যায় অনর্গল। কার সঙ্গে কথা বলছ? —কেন, আমার গুরু ফ্লোবেয়ার আর ছোট ভাই হার্‌ভের সঙ্গে! কিন্তু ওদের কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ যে ভালো করে শুনতে পাই না তাঁদের কথা। যেন বহু দূর থেকে কথা ভেসে আসছে।

কখনো কখনো কাগজ-কলম আনতে বলত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাগজে হিজিবিজি আঁকত। বোধগম্য বাক্য একটিও লিখতে পারত না। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে বিষ-মাখানো খাবার দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগে কখনো কখনো দিনের পর দিন না খেয়ে থাকত। কয়েক বছর আগে Le Horla-তে পাগলের লক্ষণ সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, নিজের ক্ষেত্রে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

১৮৯৩ সালের ৬ই মার্চ মোপাসাঁর নাটক সর্বপ্রথম Comedie Francaise-এ অভিনীত হল। এর চেয়ে বড় সম্মান ফরাসী নাট্যকাররা আশা করতে পারে না। নাটকের অভিনয় দেখে শত শত দর্শক যখন হাসিতে ফেটে পড়ছে, তখন নাট্যকার পাগলা-গারদের এক নিঃসঙ্গ কক্ষে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দেহ কাঠির মতো শীর্ণ, গাল বসে গেছে, চোখ ঢুকেছে কোটরে, গলার স্বর প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ফিসফিস করে আপন মনে কথা বলে, ভালো করে শোনা যায় না। যে দেহ নিয়ে মোপাসাঁর গর্বের শেষ ছিল না সে দেহ এখন অবশ, অসাড় হয়ে এসেছে। ৬ই জুলাই (১৮৯৩) মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে সেই অথর্ব দেহে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তিন দিন পরে সমাধি। প্যারিসের প্রায় সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপস্থিত হয়েছে সমাধিক্ষেত্রে। উন্মুক্ত কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জোলা মোপাসাঁর সাহিত্য-প্রতিভা স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেন। সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য দুই-ই এমন চরমভাবে আর কারো জীবনে আসেনি। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পেরেছে বলেই মোপাসাঁর সাহিত্য আজ-কাল-পরশুর উর্দ্ধে; তা সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্য হতে পেরেছে। জীবনবিলাসী মোপাসাঁর শিল্পসৃষ্টির মূল সুর জীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম। তাই মোপাসাঁর সাহিত্যের আবেদন কখনো পুরনো হবার আশঙ্কা নেই।

মোপাসাঁ জীবনে অনেক ভুল করেছে, জীবনের দেবতা তার জন্য চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা শিল্পসৃষ্টিতে

শৈথিল্য আনেনি। শিল্পের মন্দিরে মোপাসাঁ ভক্ত, বিশুদ্ধাত্মা পুজারী। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বেদনা, যন্ত্রণা ও হতাশা যথাসম্ভব দূরে রেখে সাহিত্য রচনা করেছে। তবু মোপাসাঁর রচনার প্রকৃত উপলব্ধির জন্য তার জীবনের পরিচয়ও জানা প্রয়োজন। আর সে জীবন একটি রসসমৃদ্ধ গল্পের উপকরণে পূর্ণ। মোপাসাঁর মৃত্যু এই বিয়োগান্ত জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করল। মোপাসাঁর রচনা সংগ্রহে এ গল্পের স্থান নেই। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এটি হয়ে রইল একটি অমূল্য সংযোজন।

বা ল জা ক

১৭৯৯—১৮৫০

প্যারিস থেকে কিছু দূরে ভেন্‌দোমে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের পরিচালিত স্কুলটির কঠোর নিয়মানুবর্তিতার খ্যাতি ছিল। প্রত্যেক ক্লাশে ছিল একটি 'গাধার' বেঞ্চ। যারা পড়ায় পারত না, যাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে শিক্ষকদের সন্দেহ হত, তাদের শাস্তিস্বরূপ মাঝে মাঝে বসানো হত ঐ গাধার আসনে। ১৮০৭ থেকে ১৮১৩—এই সাত বছরের মধ্যে একটি ছেলেকে যতবার গাধার আসনে বসতে হয়েছে, এমন আর কাউকে নয়। শিক্ষকরা তাকে বুঝতে পারত না। বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু নির্বোধ, একগুঁয়ে ও অলস। প্রায় সব সময়ই অন্য ছেলেদের পেছনে পড়ে থাকে। কিন্তু ইচ্ছে হলে কখনো কখনো সে সকলকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ চাবুক মেরে তাকে পড়া শেখানো যায় না। তার খেলাধূলা নেই। ছ' বছরের মধ্যে সে ছ' দিনের বেশী ছুটি পায়নি। এত শাস্তি পেয়েও শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পথে চলবার আগ্রহ নেই তার। নিজের চারপাশে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে দিয়েছে। এতটুকু ছেলের মধ্যে প্রতিরোধের এত বড় শক্তি শিক্ষকদের বিস্মিত করল।

চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছল প্রধান শিক্ষকের অভিমত : ওর লেখাপড়া কিছু হবে না।

স্কুল ছিল জেলখানার মতো নিরানন্দ। বাড়িতেও কেউ তাকে অভ্যর্থনা করল না। নিজের পরিবারেও সে অপরিচিত। মা-বাবার কাছ থেকে সে কখনো আদর পায়নি। তার জন্ম হয়েছে ১৭৯৯ সালের ২০শে মে। অল্প কয়েক দিন পরে এক দরিদ্র পুলিশের বউ অর্থের বিনিময়ে তাকে পালন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। মা তখনো সূতিকা-শয্যায়। বাচ্চা ছেলেকে ঐশ্বর্যশালী পরিবারের স্নেহময় পরিবেশ থেকে অকারণে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। রবিবার কিছুক্ষণের জন্য পালিকার সঙ্গে নিজের বাড়ি আসত। কিন্তু মা কখনও কোলে তুলে আদর করেনি। ছেলেবেলায় এবং বড় হয়েও রোগে, দুঃখে, বেদনায় মা'র স্নেহস্পর্শ ও সহানুভূতি পাবার

সৌভাগ্য হয়নি তার। তাই পরবর্তী জীবনে বালজাক বলেছেন, আমার মা ছিল না।

নিজের প্রথম সন্তানের প্রতি এমন বিতৃষ্ণার সঠিক কোনো কারণ জানা যায় না। কারণটা হয়ত মানসিক।

বালজাকের বাবার জন্ম হয়েছিল সাধারণ কৃষক-পরিবারে। তিনি কৃষিক্ষেত্র ত্যাগ করে শহরে এলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তাঁর বয়স হল প্রায় পঞ্চাশ। তখন তাঁর বিয়ের কথা মনে পড়ল। বয়স পঞ্চাশ হলে কি হয়? বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল। তার উপর বিত্তশালী। অভিজাত পরিবারের এক বিশ বছরের তরুণীকে বিয়ে করা কঠিন হল না। তখন তাঁর বয়স একান্ন।

এ বিয়েতে তরুণীর মতামতের খুব মূল্য ছিল না। মা-বাবার নির্দেশে রাজী হতে হয়েছে। বিয়ের পরে তরুণীর মনে অনুশোচনা জাগল। বৃদ্ধকে বিয়ে করে জীবনের সকল আশা ও স্বপ্ন দূর হয়ে গেছে। প্রথম সন্তান জন্মের পর এই ব্যর্থতার বেদনা আরো তীব্র হল। ছেলের উপর চোখ পড়লেই মনে হয় ব্যর্থ জীবনের কথা। এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার সকল পথ বন্ধ করেছে এই ছেলেটা।

বালজাকের বেশি দিন বাড়ি থাকা হল না। নতুন স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন। এখানেও তাঁর লাঞ্ছনার সীমা রইল না। শিক্ষকরা তাঁর সম্বন্ধে সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলের রিপোর্ট পেয়ে মা তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অপদার্থ, সর্বজনধিকৃত নব-যুবক সকলের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে ১৮১৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

এবার বুঝি ঘুচল স্কুলের বন্দী-দশা। আশা হল বালজাকের। কিন্তু মা তাঁকে স্বস্তি দিতে নারাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ আর কতক্ষণের? প্রায় সারা দিনই ছুটি। উঠ্‌তি বয়সে এত অবসর ভালো নয়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবীর দপ্তরে শিক্ষানবীসিও করতে হবে। তাহলে পড়া শেষ করেই আইন ব্যবসায় শুরু করা যেতে পারে। শিক্ষানবীস হিসাবে যে ভাতা পাওয়া যাবে, তাও উপেক্ষা করা উচিত নয়।

দু' বছর কেটে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শুনে আর আইনজীবীর দপ্তরে ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে। নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, বৈচিত্র্যহীন জীবন। ১৮১৯

সালের বসন্তকাল শুরু হয়েছে। কোন এক ফাঁক দিয়ে অন্ধকার আপিসে এক ঝলক বসন্তের বাতাস অনধিকার প্রবেশ করল। হঠাৎ কি হয়ে গেল! বালজাক উঠে দাঁড়ালেন ফাইল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। অনেক অমূল্য সময় হারিয়ে গেছে, আর হারাতে পারেন না। এতদিন অন্যের কথা শুনে পা টিপে টিপে পথ চলেছেন। এবার চলবেন নিজের পথে। যেদিকে খুশি চলবেন। কারো কথা শুনবেন না। উকিল হবার ইচ্ছা নেই তাঁর। আইনের শিক্ষানবীসি এখানেই শেষ। তিনি লেখক হবেন। তাঁর বই দেশে বিদেশে হাজার হাজার লোক পড়বে। পড়ে হাসবে, কাঁদবে। বই লিখে বিখ্যাত হবেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন।

তাঁর সঙ্কল্পের কথা শুনে বাড়িতে সবাই অবাক হল। বালজাক লেখক হবার মতো ইঙ্গিত এ পর্যন্ত কিছু দিতে পারেন নি। ভালো করে স্কুলের খাতায় একটা রচনা লিখতে পেরেছেন? এই যে কত লোকে কবিতা লিখছে, তাঁর একটা কবিতা বেরিয়েছে কোনো কাগজে? তাহলে লেখক হতে চান কোন্ সাহসে? এ পথ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য তিরস্কার, কলহ, প্রবোধ কিছুই কার্যকরী হল না। এত দিন যিনি নীরবে সকল লাঞ্ছনা সয়েছেন, হঠাৎ তিনি সঙ্কল্পে অটল হতে পারলেন কিসের জোরে?

কিছুতেই যখন তাঁকে টলানো গেল না তখন বাবা তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। দু' বছর সময় দেওয়া হবে। এর মধ্যে বালজাক যদি লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে না পারেন তাহলে আবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে আইনজীবীর দপ্তরে। বালজাক এই চুক্তি মেনে নিলেন।

প্যারিসের দরিদ্র পল্লীর একটি জীর্ণ বাড়ির চিলেকোঠায় বালজাকের সাধনার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হল। ছোট ঘর, ছাদ মাথায় ঠেকে, দরজা-জানালা ভাঙা, আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করবার ব্যবস্থা নেই, শীতের দিনে অসহ্য শীত, গরমের সময় রোদের তেজে পুড়তে হয়। ঘরে আসবাব-পত্র প্রায় কিছুই নেই; বাবার পুরনো পোশাক তার প্রধান সম্বল। যে মাসোহারা বাড়ি থেকে আসত তা দিয়ে প্রাণটাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

এমন কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও বালজাক সঙ্কল্পে অটল রইলেন। এতদিন তাঁর স্নেহহীন জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল বই। স্কুলের লাইব্রেরিয়ান তাঁকে যে-কোনো বই পড়বার অধিকার দিয়েছিল। তিরস্কার ও অবজ্ঞার পরিবেশ থেকে পালিয়ে আশ্রয় পেতেন বইয়ের জগতে। নিজের রচনা যোগ করে

এমন শান্তিপ্রদ গ্রন্থজগতের পরিধি আর একটু প্রসারিত করে দিয়ে যাবেন—এই ছিল তাঁর কামনা। এবার সুযোগ পেয়েছেন; কোনো ক্লেশই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।

বালজাকের কাছে এখন একমাত্র সমস্যা হল, কি লিখবেন? উপন্যাস লেখার মতো অভিজ্ঞতা তাঁর এখনো হয়নি। অনেক বই পড়লেন, অনেক ভাবলেন। তারপরে স্থির করলেন, ক্রমওয়েলের জীবনী নিয়ে লিখবেন কাব্য-নাটক। লক্ষ্য স্থির হবার পর শুরু হল সাধনা। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করা, খেলা, বেড়ানো সব বন্ধ হয়ে গেল। দিনে বিশ্রাম নেই, রাত্রিতে ঘুম নেই। চুল্লীহীন ঘরে প্রচণ্ড শীতে আঙুল অবশ হবার উপক্রম; বালজাক তবু জোর করে লিখে চলেন। মাত্র দু'বছরের সময়; এর মধ্যে সাফল্য লাভ করতে না পারলে আপিসের বাঁধা-ধরা কাজে ফিরে যেতে হবে। বালজাক শিউরে ওঠেন।

চার মাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বই শেষ হল। পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাড়ি এলেন বালজাক। পরিবারের কয়েকজন সাহিত্যরসিক বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে নাটক শোনাবার ব্যবস্থা করা হল। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বালজাক নাটক পড়ে শোনালেন। শ্রোতারা কোনো মন্তব্য করলেন না। সুস্পষ্ট অভিমতের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠানো হল এক অধ্যাপকের কাছে। তিনি বললেন, নাটক কিছুই হয়নি, এ পাণ্ডুলিপি স্বচ্ছন্দে পুড়িয়ে ফেলা যায়। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, অভ্যাস করলে একদিন বালজাক লিখতে পারবেন।

এত বড় ব্যর্থতা সত্ত্বেও বালজাক হতাশ হলেন না। নাটকের পাণ্ডুলিপি তুলে রাখলেন। জীবনে তা আর স্পর্শ করেন নি। দু'বছর পূর্ণ হতে এখনো বিলম্ব আছে। এবার উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। দু'টো কাহিনী অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল। কিছুতেই মনের মতো হয় না, কেবল একটা ছেড়ে আর একটা ধরেন। এদিকে বাবার কাছ থেকে চিঠি এল। দু'বছর পুর্ণ হয়ে এসেছে। আর দেড় মাস পরে তাঁর ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে।

সৌভাগ্যক্রমে সস্তা উপন্যাসের এক প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। নতুন লেখকদের রোমান্টিক কাহিনী ছাপিয়ে উপার্জন মন্দ হয় না। এই ব্যবসায়ের অংশীদার হতে স্বীকৃত হলেন বালজাক। দেড় মাসের মধ্যেই একটি উপন্যাস লেখা হয়ে গেল। নগদ দক্ষিণাও পেলেন। লিখে উপার্জনের সম্ভাবনা আছে দেখে বাবা আপাতত চুপ করে রইলেন।

বালজাকের জীবনের লক্ষ্য ছিল অন্যরকম। এমন বই লিখবেন যা ফরাসী সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে, লেখক হিসাবে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে, এই ছিল সঙ্কল্প। এখন সে সব কথা ভুলে যেতে হল। সর্বাগ্রে টাকা চাই। না হলে মা-বাবার ইচ্ছাদাস হতে হবে, বন্দী হতে হবে এটর্নীর আপিসের জেলখানায়। প্রেতছায়ার মতো সর্বদা তাঁর মনের পটভূমিকায় রয়েছে এই বন্দী-দশার আতঙ্ক। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন বালজাক। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সস্তা উপন্যাস পরিবেশনে তাঁর শ্রান্তি নেই। টাকা চাই, আরো টাকা। যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করতে পারলেই শুরু করবেন প্রথম শ্রেণীর বই লিখতে। বাইশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বালজাক শুধু অর্থের বিনিময়ে যে-কোনো রচনা প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়েছেন। অন্যের গল্প একটু অদল-বদল করে চুরি করতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। তবে এক বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর এই লেখাগুলির কোনো মূল্য নেই। তাই এ-সব বইয়ে বালজাক নিজের নাম দেননি। সব ছদ্মনামে বেরিয়েছে। আজ সে বইগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। অল্প কয়েকটির নাম জানা যায়, অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এত দিন বালজাক মাথা নীচু করে চলতেন। তিরস্কার ও অবজ্ঞা সয়েছেন নীরবে। স্কুলে শিক্ষকদের শাসন ; বাড়িতে মা'র শাসন। চোখ তুলে জীবনকে দেখবার সুযোগ হয়নি। বছর দুই যাবৎ কিছু উপার্জন করতে পেরে তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস জেগেছে। এবার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। বয়স হয়েছে তেইশ-চব্বিশ। এমন বয়সে প্রেমের স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু মেয়েদের সাহচর্য লাভের সুযোগ হয়নি বালজাকের। মেয়েরাও এগিয়ে আসেনি তাঁর দিকে। হয়ত বালজাকের কুৎসিত, লাবণ্যহীন চাষাড়ে চেহারাই তার জন্য দায়ী। হাজার হাজার তরুণী বালজাকের কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়েছে ; তারা হেসেছে, কেঁদেছে, প্রেমের গল্প তাদের হৃদয় উদ্বেল করেছে ; কিন্তু লেখকের প্রতি কেউ আকর্ষণ অনুভব করেনি।

মা লক্ষ্য করলেন, বালজাক আজকাল সাজ-পোশাকের উপর দৃষ্টি দিয়েছেন ; দু'বেলা নিয়মিত ভাবে পাশের বাড়িতে বেড়াতে যান। সে-বাড়িতে থাকেন মাদাম দ্য বার্ণি। এঁদের সামাজিক মর্যাদা অপেক্ষাকৃত উঁচুতে। মা ভাবলেন, মাদাম দ্য বার্ণির কিশোরী মেয়েটির সঙ্গে বালজাকের বিয়ে হলে মন্দ নয়!

তার ফলে বংশ-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কয়েক দিন পরে প্রকৃত সংবাদ জানতে পেরে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। মেয়ে নয়, বালজাকের ভালোবাসার পাত্রী মাদাম দ্য বার্নি নিজেই।

মাদাম দ্য বার্নি নয়টি সন্তানের জননী, বয়স পঁয়তাল্লিশ। প্রতিবেশী হিসাবে তিনি জানতেন বালজাকের ইতিহাস। বালজাককে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। নানা বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন। বালজাকের স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় গলে গেল। মা'র স্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত। মাদাম দ্য বার্নির মধ্যে তিনি মা'কে পেলেন, আর পেলেন প্রিয়াকে। মা ও প্রিয়া এক হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

মাদাম চমকে উঠলেন। বালজাককে তিনি ছেলের মতোই গ্রহণ করেছিলেন। প্রবোধ দিয়ে কোনো ফল হল না। এক প্রচণ্ড আদিম আকর্ষণ প্রৌঢ় হৃদয়ের দুর্বল প্রতিরোধ ভাসিয়ে নিল। মাদাম আত্মসমর্পণ করলেন। সমাজের ধিক্কার তাঁদের ভালোবাসায় ফাটল ধরাতে পারল না। মাদাম দ্য বার্নি যত দিন বেঁচে ছিলেন তত দিন বালজাক তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন ও ভালোবেসেছেন। অবশ্য বার্ধক্যের জন্য তাঁর প্রিয়ার রূপটি হারিয়ে গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই ; কিন্তু মাতৃরূপটি অক্ষুন্ন ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে বালজাক বলেছেন, মাদাম দ্য বার্নির ভালোবাসা না পেলে লেখক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। একটি হৃদয় জয় করতে পেরে বিশ্বজয়ের গৌরব অনুভব করেছেন, তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস জেগেছে, হীনমন্যতার অভিশাপ দূর হয়ে গেছে। মাদাম তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে দিয়েছেন, প্রুফ সংশোধন করেছেন, জীবনের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে তাঁর নিকটে এসে সান্ত্বনা লাভ করেছেন বালজাক।

বালজাকের জীবন ও সাহিত্যের উপর মাদাম দ্য বার্নির গভীর প্রভাব পড়েছিল। পরিণত বয়সের নারীকে প্রথম ভালোবেসেছিলেন বলে অল্পবয়স্কা তরুণীদের প্রতি বালজাক কখনো আকর্ষণ অনুভব করেন নি। তিনি বলতেন, চল্লিশ বছরের নারী তোমাকে সর্বস্ব দিতে পারে, বিশ বছরের তরুণী কিছুই দেবে না। উনবিংশ শতাব্দীতেও তিনি অষ্টাদশী তরুণীকে পূর্ণ যৌবনের প্রতীক বলে স্বীকার করেন নি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নারী পূর্ণতা লাভ করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

বিবাহিত জীবনে যে সব মেয়েরা অসুখী তাদের প্রতি বালজাকের ছিল

গভীর সহানুভূতি। অবিবাহিতাদের সম্বল থাকে তাদের স্বপ্ন। কিন্তু বিয়ের পরে যাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় তাদের কোনোই অবলম্বন নেই। আশাভঙ্গের বেদনায় যদি প্রচলিত অনুশাসন লঙ্ঘন করে তাহলে সমাজের নিকট এদের লাঞ্ছনা পেতে হয়। বিবাহিতা মেয়েদের আশাহীন সান্ত্বনাহীন জীবনের কথা বালজাকের রচনাবলীতে প্রাধান্য লাভ করেছে। জোলার মতো তিনি পতিতাদের নিয়ে মাথা ঘামান নি। যারা সমাজ-নির্দিষ্ট সুস্থ জীবন যাপন করতে উৎসুক হয়েও ব্যর্থ হয়েছে, সেই সব বিবাহিতা মেয়েদের জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতির সহানুভূতিপূর্ণ ছবি এঁকেছেন বালজাক। এমন করে তাদের কথা আর কেউ বলেনি। তাই বালজাকের রচনাবলী মেয়ে-মহলে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করেছে। য়ুরোপের সকল দেশ থেকে ভক্ত পাঠিকারা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে তাঁকে।

বালজাকের ব্যক্তিগত জীবনে দেখতে পাই, তিনি যত মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তারা সকলেই পরিণত বয়সের বিবাহিতা নারী। মাদাম দ্য বার্ণির সহিত তাঁর সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকে বালজাক বলেছেন, নারীর সর্বশেষ ভালোবাসা যদি পুরুষের প্রথম ভালোবাসা জাগ্রত করতে পারে, তাহলে তেমন মধুর প্রেম আর কিছুই হতে পারে না।

মাদাম দ্য বার্ণিকে জয় করে বালজাকের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হল। গত ক'বছরের মধ্যে ছদ্মনামে প্রকাশিত বইগুলির বিক্রি দেখে লেখক হিসাবে নিজের উপর আস্থা জেগেছে। বালজাকের মনে হল বইয়ের ব্যবসা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় হাত দেওয়া যেতে পারে। অর্থের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি না পেলে সত্যিকার ভালো লেখা হতে পারে না।

একটা ভাবনা জাগলেই তাকে কার্যে পরিণত করতে দেরী সয় না। বালজাক আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে ব্যবসা শুরু করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসা ফেল পড়ে গেল। বইয়ের ছাপানো ফর্মাগুলি ওজন দরে বিক্রি করে দিয়ে দেনার বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। অন্য কেউ হলে হতাশ হয়ে পড়ত। কিন্তু বালজাক দমবার পাত্র নন। তাঁর মনে হল, ছাপাখানা থাকলে বইয়ের ব্যবসা ভালো চলবে। সুতরাং নতুন দেনা করে আরম্ভ করলেন ছাপাখানা। এই ছাপাখানাও কিছুদিনের মধ্যে লোকসানের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বালজাক পরিবারের স্নেহহীন বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাগল হয়েছিলেন। কিন্তু বাঁধা পড়লেন বিপুল দেনার বন্ধনে। নিজের অদূরদর্শিতার জন্য সারা জীবন তাঁকে ফল ভোগ করতে হয়েছে। অর্থের ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে একান্তরূপে লেখায় আত্মনিয়োগ করবার স্বপ্ন তাঁর জীবনে কোনো দিনই সফল হয়নি। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে সর্বস্বান্ত হয়ে দেনার বোঝা মাথায় করে যাত্রা শুরু হল। নিজেকে বাঁচতে হবে, পাওনাদার ঠেকাতে হবে। অথচ অর্থ উপার্জনের মতো বৃত্তি জানা নেই। একমাত্র দুর্বল ভরসা লেখনী। ব্যবসার মোহ ত্যাগ করে কলমকেই সম্বল করলেন বালজাক।

বালজাকের দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্য-জীবনের প্রথম উপন্যাস The Last of the Chouans (1829). এতদিন তিনি হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও কোনো বইয়ে নিজের নাম দেননি। এবার ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন না, নিজের নামেই বই বের হল : Honoré Balzac. ১৮৩১ সাল থেকে নামের একটু পরিবর্তন করলেন : Honoré de Balzac. এই ছোট্ট 'দ্য' কথাটি যোগ করবার উদ্দেশ্য ছিল। বালজাক জানাতে চেয়েছিলেন তিনি অভিজাত 'নোবেল' বংশোদ্ভুত, সাধারণ ঘরের লোক নন। সামাজিক পদমর্যাদা, বিলাসিতা এবং অর্থের প্রতি বালজাকের ছিল প্রচণ্ড আসক্তি। নিজের কুলগৌরব ও অর্থগৌরব নিয়ে মিথ্যা বড়াই করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সেদিন নামের সঙ্গে 'দ্য' যুক্ত করায় বালজাককে বিদ্রূপ সইতে হয়েছে। ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায় স্ব-নির্বাচিত এই প্রতিনিধিকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু স্বদেশের ও বিদেশের অগণিত ভক্ত পাঠক তাঁর নাম স্বীকার করে নিয়েছে। সাহিত্যের জগতে তিনি যে অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

১৮৩৩ সালে বালজাক স্থির করেন যে, তাঁর উপন্যাসে সমাজের বাস্তব চিত্র থাকবে। সমাজের সকল অংশ এবং যত প্রকারের নরনারী সচরাচর দেখা যায় উপন্যাসে তাদের রূপ দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ১৮৪২ সালে বালজাক তাঁর প্রস্তাবিত উপন্যাসমালার একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনা থেকে দেখা যায় যে, তিনি ব্যক্তিগত জীবন, প্যারিসের জীবন, গ্রামের জীবন, রাজনৈতিক ও সামরিক জীবন ইত্যাদি কেন্দ্র করে কাহিনী রচনা করবার কথা ভেবেছেন। দান্তের 'ডিভাইন কমেডির' অনুকরণে বালজাক তাঁর উপন্যাসমালার নাম রাখলেন 'হিউম্যান কমেডি' ; দেবতার কথা

নয়, তিনি বলবেন মানুষের কথা। 'হিউম্যান কমেডি'র সিরিজ ১৩৮ খানি উপন্যাসে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। কিন্তু শ'খানেক কাহিনী তিনি লিখে যেতে পেরেছেন।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে 'হিউম্যান কমেডির' মতো বিরাট পরিকল্পনা আর নেই। সমগ্র দেশের জীবন-যাত্রার বাস্তব ছবি আঁকবার মতো দুঃসাহস আর কোনো লেখক করেন নি। বালজাক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে যেতে না পারলেও তাঁর সাফল্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সমসাময়িক ফরাসী জীবনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিচ্ছবি তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। আর সে ছবি তিনি এঁকেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। 'হিউম্যান কমেডিতে' প্রায় দু'হাজার চরিত্র আছে। সূক্ষ্ম বর্ণনার গুণে এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে চরিত্র-চিত্রণে বিরক্তিকর পুনরুক্তি ঘটত। বালজাকের কাহিনীতে চরিত্রের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা একমাত্র শেক্সপীয়রের সহিত তুলনীয়। ধনীর গৃহে, বস্তিতে, রাজপথে—যেখানেই তাঁর চরিত্রকে উপস্থিত করেছেন সেখানেই তারা পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে।

বালজাক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। যেসব নরনারীর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন সামান্য পরিবর্তিত রূপে তারাই উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বালজাক ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন দেখতেন, খাদ্য ও পোশাকের বিলাসিতা এবং জমকালো জীবন-যাত্রা ছিল বালজাকের কাম্য। 'হিউম্যান কমেডিতে'ও জীবনের এই দিকগুলি প্রাধান্য লাভ করেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সত্ত্বেও বালজাকের উপন্যাস ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট নয়। নিজের দেখা ঘটনা ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তিনি যে ভাবে লিখেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর!

সমাজের দুষ্কৃতিকারী ও পাপাসক্ত চরিত্রগুলি বালজাকের রচনায় যেমন সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত হয়েছে, মহৎ চরিত্রগুলি তেমন হয়নি। কিন্তু তাই বলে বালজাক অন্যায়ের সমর্থক নন; সত্য ও ন্যায়ের উপর তাঁর আস্থা সর্বত্রই দেখা যায়। অসৎ চরিত্রগুলি প্রাধান্য লাভ করবার ফলে 'হিউম্যান কমেডিতে' কমেডি অপেক্ষা ট্র্যাজেডির অংশই বেশি।

নারী-চরিত্রের প্রাধান্য বালজাকের উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর কাঠামো গড়তে পুরুষ-চরিত্রগুলি তিনি স্ক্রু বল্টু হিসাবে

ব্যবহার করেছেন। অসুখী, অপরিতৃপ্ত এবং সামান্য বিকৃত চরিত্রের নারীর দল তাঁর রচনায় ভিড় করেছে।

বালজাক রিয়ালিজমের গুরু। আধুনিক নরনারী তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের সত্য রূপটাই বালজাক দেখাতে চেয়েছেন। সত্য যেখানে কুশ্রীতার খাদ মেশানো, সেখানেও তিনি হুবহু ছবি আঁকতে দ্বিধা করেন নি। রিয়ালিস্ট লেখকদের রীতি অনুসারে তিনি সেই সব নরনারীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, যারা সুস্থ জীবনের পথ থেকে নানা কারণে বিচ্যুত হয়েছে। বালজাকের রচনা-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর অনেক বাস্তবপন্থী লেখক গ্রহণ করেছেন। হেনরি জেমস বালজাককে গুরু বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।

রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'riding on horse-back over vacuum.' ভিক্টর হুগোর লেখা পড়ে বালজাক আনন্দ পেতেন। কিন্তু তাঁর রোমান্টিকতাকে সমর্থন করতেন না। ভিক্টর হুগো সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'a Titian painting his frescoes on a wall of mud.' হুগোর মতো সাহিত্য-প্রতিভা রোমান্টিকতার কাদামাটিতে পড়ে ব্যর্থ হয়ে গেল,—এই ছিল তাঁর দুঃখ। রোমান্টিসিজমের প্রতি এই বিরূপতা সত্ত্বেও বালজাকের অনেক উপন্যাসেই রিয়ালিজমের সঙ্গে রোমান্টিক সুরও লক্ষ্যণীয়।

'হিউম্যান কমেডির' প্রায় এক শত বইয়ের মধ্যে অন্তত কুড়িটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। বালজাকের বই যাঁরা পড়তে চান তাঁদের সহায়তা হতে পারে মনে করে বইগুলির নাম দেওয়া হল। অবশ্য এটি ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী সঙ্কলিত তালিকা।

The Chouans (1829) ; The Wild Ass's Skin (1830) ; A Passion in the Desert (1830) ; The Unknown Masterpiece (1831) ; Colonel Chabert (1832) ; Eugénie Grandet (1833) ; Droll Stories (1833-'হিউম্যান কমেডির' অন্তর্গত নয়) ; The Search for the Absolute (1834) ; The Duchess of Langeais (1834) ; Old Goriot (1834) ; Seraphita (1835) ; Cesar Birotteau (1837) ; Lost Illusions (1839) ; The Village Curé (1839) ; A Secret Affair (1841) ; Ursule Mirouet (1841) ; Modest Mignon (1844) ; Beatrix (1844) ; Cousin Bette (1846) ; Cousin Pons (1847).

অন্য বইগুলির মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর উপাদান পাওয়া যায়। কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র এ বইগুলির সম্পদ। এবং তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসই জনপ্রিয় হয়েছিল। তথাপি সকল দিক বিচার করে বালজাকের মোট রচনার মাত্র এক-পঞ্চমাংশকে প্রথম শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা যায়। সারা জীবন বালজাককে যে অবস্থার মধ্যে লিখতে হয়েছে তা বিচার করলে এটা অগৌরবের কিছু নয়। বরং এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লিখেও যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন সেটাই বিস্ময়কর।

বিপুল দেনার বোঝা নিয়ে বালজাকের লেখক-জীবন শুরু হয়। লেখার আয়ই তাঁর একমাত্র সম্বল। সৌভাগ্যক্রমে স্বনামে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস থেকেই পাঠক মহলে তিনি সমাদর লাভ করেন। সুতরাং প্রকাশকরা তাঁর পাণ্ডুলিপি নেবার জন্য উৎসুক ছিল। তারা টাকা অগ্রিম দিয়ে যেত। বালজাক ঠিক সময়ে লেখা দিতেন। লিখতে পারলেই টাকা আসে; পাণ্ডুলিপি পড়ে থাকে না। তাই তিনি অবিরাম লিখতেন। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারী-সূত্রে পেয়েছিলেন প্রচুর জীবনীশক্তি। কঠোর পরিশ্রম করতে ভয় পেতেন না। 'হিউম্যান কমেডির' উপন্যাসমালা ছাড়াও তিনি অনেক নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। একমাত্র ১৮৩০ সালে তাঁর সকল প্রকার মৌলিক রচনার সংখ্যা ছিল সত্তর।

বালজাক লিখতে বসতেন রাত বারোটায়। প্যারিস তখন নিদ্রিত, নিস্তব্ধ, বাড়িতে তিনি একা। লেখার জন্য এই আদর্শ পরিবেশ। কেউ এসে বাধা দেবে না; কোনো হল্লার শব্দ মন বিক্ষিপ্ত করবে না। অবিশ্রান্ত গতিতে লেখা এগিয়ে চলে। কখনো কখনো আঙুলগুলি অবশ হয়ে আসে; কলম ধরে রাখা যায় না। তখন উঠে এক কাপ কড়া কফি খেয়ে শরীর চাঙ্গা করে তোলেন। কফি ছিল তাঁর টনিকের মতো। বিশেষ ধরণের কফি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত। বার বার কফি না খেলে তিনি লিখতে পারতেন না।

সকাল আটটা। প্যারিসের ঘুম ভাঙল। পথ থেকে যানবাহনের শব্দ উপরে ভেসে আসছে। বালজাক লেখা ছেড়ে উঠলেন। কিন্তু বিশ্রাম নেই। অন্য কাজ। গাদা গাদা প্রুফ এসে টেবিলের উপরে জমেছে। বালজাক প্রুফে অনেক সংশোধন ও কাটাকুটি করতেন। তাঁর বই কম্পোজ করতে কম্পোজিটার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দাবি করত।

রাত্রি আটটা পর্যন্ত চলত প্রুফ দেখা ও চিঠি-পত্র লেখা। তার পরেই শুয়ে পড়তেন। শুধু চার ঘণ্টার বিশ্রাম। বারোটায় চাকর এসে ডেকে দেবে।

একটি উপন্যাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বালজাক ঘর থেকে বের হতেন না; ক্লাব, রেস্তোরাঁ, সভা, এমন কি সংবাদপত্র পর্যন্ত ত্যাগ করে চলতেন। ভোজনরসিক হওয়া সত্ত্বেও সামান্য হালকা খাবার খেতেন। ভারী পেট মাথা ভোঁতা করে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

একটি লেখা শেষ হয়ে যাবার পর কয়েক দিনের বিশ্রাম। যেন তপস্যার আসন থেকে উঠে আসেন। তখন রেস্তোরাঁয়, সাহিত্য-সভায়, থিয়েটারে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। কয়েক দিন গল্প করবার, রাত জাগবার ও খাবার মাত্রা থাকে না। পুরনো বাজার থেকে আসবাব-পত্র, পর্দা, ছবি ইত্যাদি কিনে এনে বাড়ি সাজিয়ে অভিজাত বলে পরিচিত হবার জন্য ভূমিকা রচনা করেন। টাকা হাতে এলেই কথা নেই। কত তাড়াতাড়ি সেই টাকা পাঁচ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যয় করা যায়, তার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠতেন। তাহলে সমাজে ঐশ্বর্যশালী বলে তাঁর খ্যাতি হবে। কখনো হয়ত দেখা যেত, তিনি জুড়িগাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে উর্দি-পরা পরিচারকের দল। তিনি নিজে জমকালো পোশাক পরতে ভালোবাসতেন। তাঁর জীবন-যাত্রার এই বাহিরের দিকটা দেখে প্যারিসে প্রচারিত হয়েছিল যে, বালজাক 'গ্র্যাণ্ড মোগল', ভোজনবিলাসী ঔদরিক এবং তিনি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক। কিন্তু রুদ্ধকক্ষে লেখার জন্য তপস্যা কারো চোখে পড়ত না।

না পড়বার কারণও ছিল। প্রচুর উপার্জন করেও বালজাক কখনো দেনা শোধ করতে পারেন নি। লোকের মনে তাই উচ্ছৃঙ্খলতার কথাটাই মনে হয়েছে। বালজাকের একটি বই পেলে প্রকাশকরা কৃতার্থ হত, অগ্রিম টাকা গছিয়ে দিয়ে যেত। ফ্রান্সের অন্য কোনো লেখকের এমন সুযোগ তখনকার দিনে ছিল না। কিন্তু তবু অন্তত লাখ টাকার ঋণ বালজাকের সব সময়ই ছিল। পাওনাদার সর্বদা পেছনে লেগে থাকত। আদালতের পেয়াদা এসে আসবাব-পত্র ক্রোক করেছে। কত দিন পাওনাদার দরজা আগলে বসে রয়েছে; ভিতরের ঘরে বালজাক লিখছেন। মন থেকে পাওনাদারকে কিছুতেই তাড়াতে পারা যায় না। লেখা তখন যন্ত্রণা হয়ে ওঠে। কখনো কখনো পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে, কিংবা কয়েক দিনের জন্য আত্মগোপন করে সাময়িক ভাবে রক্ষা পেতেন। শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে তাঁকে কিছু

দিনের জন্য জেল খাটতে হয়েছিল। তাগিদের জ্বালা ছিল না বলে জেলের জীবন তাঁর মন্দ লাগেনি।

নিজেকে অভিজাত পরিবারের বংশোদ্ভূত হিসাবে প্রচার করবার দুর্বলতা থেকেই তাঁর এই দুর্দশা হয়েছিল। নামের সঙ্গে শুধু 'দ্য' যোগ করলেই যথেষ্ট হবে না। দু' হাতে টাকা খরচ করে আভিজাত্য প্রমাণ করা চাই। মামা-বাড়ির বংশ ছিল তাঁদের চেয়ে উঁচু। হয়ত ছেলেবেলায় মা'র কাছ থেকে এ সম্বন্ধে গর্বের কথা শুনে বালজাক বংশ-গৌরব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। আরো একটা কারণ ছিল। সে সময় সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে পাঠিকার সংখ্যা নগণ্য ছিল। বই পড়ত সাধারণতঃ বড় ঘরের মেয়েরা। তারা বালজাককে প্রশংসাসূচক চিঠি লিখত। বালজাকের বান্ধবীদের সবাই উচ্চ বংশের। সুতরাং নিজের বংশগৌরব ও অর্থগৌরব জাহির করবার পাগলামি তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

শুধু বংশগৌরব নয়, নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধেও বালজাকের গর্ব ছিল। তাই তাঁর বলতে বাধত না, 'I shall rule unchallenged in the intellectual life of Europe.' আবার কখনো কখনো তাঁকে খুব লাজুক বলে মনে হত। একবার প্রকাশকের সঙ্গে মনোমালিন্য হল। ক্ষমতাপন্ন প্রকাশক; তার ইঙ্গিতে কাগজে বালজাকের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হতে লাগল। প্রতিবাদে বালজাক নিজেই এক কাগজ বার করলেন। কতকগুলি সংখ্যার প্রায় সকল প্রবন্ধই ছিল তাঁর লেখা। কিছুদিন পরে কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র দেনার অঙ্ক বৃদ্ধি ব্যতীত কাগজ থেকে আর কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

বালজাক লেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করলেও সে জন্য তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। কারণ, পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল সৃষ্টির আনন্দ। শুধু তাঁর মনে হত, ঘরে স্ত্রী থাকলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ভালো করে লিখতে পারতেন। স্ত্রী দক্ষতার সঙ্গে আর্থিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করলে দেনা শোধ হয়ে যেত।

হঠাৎ বড়লোক হবার লোভ ছিল প্রবল। তাই বালজাক নানা রকম ব্যবসায়ে নেমেছেন। বিয়ের প্রস্তাবেও তাঁর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ছিল। বিত্তশালিনী বিধবা পাত্রী তাঁর কাম্য। ছোট বোনকে এবং দু'-একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে পাত্রী দেখে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। স্ত্রীর উপর সংসারের সকল ঝঞ্ঝাট ছেড়ে দিয়ে তিনি ডুবে থাকবেন লেখার মধ্যে।

প্যারিসে তাঁর বান্ধবী ও প্রণয়িনীর সংখ্যা কম ছিল না। নানা ভাবে এঁদের কাছ থেকে তিনি সহায়তা লাভ করেছেন। একবার অভিজাত বংশের এক বিবাহিতা মহিলা অপবাদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে পাওনাদারদের পীড়ন থেকে রক্ষা করে তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো মেয়ে তাঁকে বিয়ে করতে সম্মত হয়নি। তাঁর উপন্যাস পড়ে কত নরনারী ভালোবাসার প্রেরণা পেয়েছে ; কিন্তু ফ্রান্সের কোনো মেয়ে তাঁকে ভালোবেসে বরণ করবার জন্য এগিয়ে এল না। সমসাময়িক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বালজাক দেখতে প্রায় কুৎসিত ছিলেন। লাবণ্যহীন বিরাট চাষাড়ে দেহ। তার উপর চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও ঋণের বোঝা প্যারিসে ছিল সর্বজনবিদিত। সুতরাং কোনো মেয়েই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

ইউক্রেনের এক প্রতিপত্তিশালী জমিদার-গৃহিণী মাদাম ইভলিন দ্য হানসকা তাঁর সহচরীদের সঙ্গে বালজাকের একটি উপন্যাস পড়ছিলেন। তাঁদের মনে হল নায়িকার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। বালজাকের মতো লেখকের কাছ থেকে এটা তাঁরা আশা করেন নি। সবাই মিলে আলোচনা করে স্থির করলেন, এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানিয়ে বালজাককে চিঠি লেখা হোক। ১৮৩২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি সেই চিঠি এসে পৌঁছল বালজাকের টেবিলের উপরে। চিঠিতে লেখিকার নাম-ঠিকানা ছিল না। নীচে শুধু লেখা ছিল 'অপরিচিতা।'

এই রহস্যময়ী বালজাকের মনে গভীর রেখাপাত করল। অপরিচিতার চিঠি কেন্দ্র করে তাঁর কল্পনা উধাও হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যোগাযোগ করবার উপায় নেই। শুধুই কল্পনাবিলাস। কিছুদিন পরে সেই অপরিচিতাই পথ বলে দিলেন। যদি আরো চিঠি পেতে চান তাহলে অমুক কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। এই সুযোগ হারালেন না বালজাক। মাদাম দ্য হানসকা সেই বিজ্ঞাপন পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য উৎসুক। এর চেয়ে গৌরব আর কি আছে ?

রাশিয়ার বিখ্যাত ধনী জমিদার-পরিবারের গৃহিণী মাদাম হানসকা। বিপুল ঐশ্বর্য ; কোনো বিলাসিতার অভাব নেই। একটি মাত্র মেয়ে বড় হয়েছে, থাকে গভর্ণেসের তত্ত্বাবধানে। স্বামী ভগ্নস্বাস্থ্য ; নিজের রোগ নিয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত। মাদাম দ্য হানসকা কেবল বই পড়তেন। য়ুরোপের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি তাঁর জানা ছিল। নতুন ভালো বই বের হলেই তিনি কিনতেন।

সংসারে কোনো দায়িত্ব ছিল না ; বইয়ের জগতে, স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতেন।

একটা খেয়াল হিসাবে চিঠি লেখা শুরু হয়েছিল। মাদামের রোমাণ্টিক মনে শীগগিরই এই চিঠি লেখার খেলা নেশা হয়ে দাঁড়ালো। চিঠি-পত্র গোপনে আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে মেয়ের গভর্ণেসের সাহায্য নিলেন। চিঠি-পত্র আসত যেত তার মারফৎ।

চোখে না দেখেও চিঠির মাধ্যমে পরস্পরের হৃদয় বিনিময় হয়ে গেল। বালজাকের এই চিঠিগুলি ফরাসী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমন কবিত্বপূর্ণ আবেগ-মধুর পত্র-সাহিত্য বিরল। এই চিঠির মধ্য দিয়েই বালজাক তাঁর নিজের জীবনের উপন্যাস শুরু করলেন। এই উপন্যাস 'হিউম্যান কমেডির' কোনো কাহিনী অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক নয়।

এক বছর যাবৎ শুধু চিঠির বিনিময় চলল। ১৮৩৩ সালের প্রথম ভাগে মাদাম দ্য হানসকা সপরিবারে ভ্রমণে বের হলেন। বালজাককে গোপনে সংবাদ পাঠালেন জেনেভায় দেখা করতে। সব কাজ ফেলে বালজাক ছুটলেন। গল্পের যাদুকরের প্রত্যক্ষ রূপ দেখে মাদামকে প্রথমেই হতাশ হতে হল। যে বালজাকের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তার সঙ্গে এ চেহারার মিল নেই। কিছুদিন পরে তাঁর বাগাড়ম্বর, নিজেকে জাহির করবার ব্যগ্রতা, ভোজনবিলাসিতা ইত্যাদি দেখে তিনি নিশ্চয়ই আরো হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় খ্যাতিমান একজন লেখকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার লোভ ত্যাগ করতে পারেন নি মাদাম।

বালজাক ইভলিনের মধ্যে তাঁর কল্পনার প্রেয়সীকে দেখতে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সুন্দরী, ঐশ্বর্যশালিনী। বিধবা নয় ; তাই এখনই পাবার আশা নেই। কিন্তু বালজাকের দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। এক মাস ক্রমাগত আবেদন জানিয়ে একদিন পেলেন ইভলিনকে। চিঠিতেই হৃদয় দান হয়েছিল। ইভলিন তা সমর্থন করলেন দেহ দান করে। এবার কি হবে? স্বামী ত্যাগ করে ইভলিন প্যারিস যাবেন বালজাকের সঙ্গে? কিন্তু তাহলে তো স্বামীর সম্পত্তি পাওয়া যাবে না?

স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো নয়। একটা কুটিল ভরসা জাগল দু'জনের মনে। আর অল্পদিন আয়ু আছে স্বামীর। তারপর ইভলিন মুক্ত। তখন মিলনে বাধা থাকবে না। এই আশা নিয়ে বালজাক প্যারিসে ফিরলেন।

প্যারিসে এসে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হল। সবচেয়ে বড় সমস্যা, কি করে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। থিয়েটারে ভাগ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তাঁর কেবলই মনে হয়, যদি প্রচুর টাকা থাকত তাহলে হয়ত এখনই ইভলিনকে পাওয়া যেত। নিজের দাবিকে জোরের সহিত পেশ করতে পারতেন। এই ধারণা থেকে ব্যবসায়ে বড় হবার কথা মনে হয়। লিখে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে না। কোথায় একটা উড়ো খবর শুনলেন সার্ডিনিয়ার পরিত্যক্ত রূপার খনিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করলে প্রচুর লাভ হতে পারে। অমনি ছুটলেন সার্ডিনিয়ায়। কাউকে জানালেন না। পাছে লাভের অঙ্কে ভাগ বসে। ভগ্নস্বাস্থ্য ও হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হল। অর্থব্যয়ও কম হল না। ভ্রমণের দীর্ঘ সময় কিছু লেখা হয়নি। সুতরাং ঋণ বাড়ল।

এমনি আরো অনেক ব্যবসায়ের পরিকল্পনা নিয়ে বালজাক মাথা ঘামিয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন, অর্থব্যয় করেছেন। এ-সব যাঁর জন্য, তিনি আছেন দূরে, চিঠি-পত্রের সেতু দিয়ে শুধু যোগাযোগ। দিন, মাস, বছর কেটে যেতে লাগল; বালজাক আশা করে আছেন কবে ইভলিন এসে তাঁর ভার নিজের হাতে তুলে নেবে; কবে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন।

দীর্ঘ আট বছর পরে ১৮৪১ সালের নভেম্বর মাসে খবর এল কাউন্ট হানসকার মৃত্যু হয়েছে। বালজাক ইভলিনকে লিখলেন, এ সময় তোমার কাছে থাকা আমার কর্তব্য। কিন্তু ইভলিন রূঢ় ভাবে নিষেধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। বালজাক আঘাত পেলেও নিরাশ হলেন না। তাঁর আশাবাদ অপরাজেয়।

মাদাম দ্য হানসকা জানালেন, আগে মেয়ের বিয়ে হোক, তারপরে ভাবব আমাদের বিয়ের কথা। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল; তবু ইভলিন কেবলই বিয়ের কথা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। বালজাক অবশ্য এখন প্রায়ই ইভলিনের অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। দু'জনে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু এটুকুতে বালজাকের তৃপ্তি নেই। তাঁর দেহের শক্তি ও সৃষ্টির ক্ষমতা দুই-ই যেন হ্রাস পাচ্ছে। এখন পূর্বের মতো দ্রুত লিখতে পারেন না। প্রায়ই ভাবনায় জট পাকিয়ে যায়, কলম বন্ধ হয়ে থাকে। ইভলিন এসে যদি তাঁর ভার গ্রহণ করেন তাহলে তিনি নতুন প্রেরণা লাভ করবেন। তাহলে তাঁর কলম সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, সম্ভব হবে 'হিউম্যান কমেডির' পরিকল্পনা সমাপ্ত

করা। কিন্তু মাদাম দ্য হানসকা খেলা করছেন; পরিত্যাগ করেন না, সম্পূর্ণরূপে গ্রহণও করেন না। এদিকে বালজাক ঋণের উপর ঋণ করে বাড়ি তৈরী করেছেন; এ বাড়িতে ইভলিনকে নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করবেন।

১৮৪৮ সালের শেষ ভাগে বালজাক মাদাম দ্য হানসকার ইউক্রেনের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। কিছুদিন পরে কঠিন রোগ তাঁকে আক্রমণ করল। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে কিছু সুস্থ হলেন; কিন্তু ডাক্তার মাদামকে জানিয়ে দিলেন, ওঁর আয়ু বেশি দিন নেই। আশ্চর্য, এ কথা শোনবার পর ইভলিন বিয়ে করতে সম্মত হলেন। এর কারণ জানা যায় না। হয়ত বালজাক বেশি দিন বাঁচবেন না জেনেই সম্মত হয়েছিলেন। বালজাকের নামের সঙ্গে নিজের নাম যোগ করে ইতিহাসে বেঁচে থাকবার লোভ ছিল ইভলিনের। কিন্তু বালজাকের আচার-ব্যবহার তাঁর কাছে বিরক্তিকর মনে হত; ইউক্রেনে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা ছিল তা ত্যাগ করে প্যারিসের অপরিচিত সমাজে যেতেও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। এখন বালজাকের মৃত্যু আসন্ন। অসুবিধাগুলি বেশি দিন ভোগ করতে হবে না। কিন্তু নামের সঙ্গে নাম যুক্ত হয়ে যাবে চিরকালের জন্য।

১৮৫০ সালের ১৪ই মার্চ বালজাক ও ইভলিনের বিয়ে হল। পাত্রীর বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে; পাত্রের বয়স একান্ন। বিয়ের পরে তাঁরা প্যারিস যাত্রা করলেন। দীর্ঘ আঠারো বছরের প্রতীক্ষা সফল হল। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বালজাকের দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর বিশ্বাস, এবার ইভলিনের সাহচর্যে ও পরিচর্যায় শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবেন।

প্যারিসের পথে বালজাকের অবস্থা খুব খারাপ হল। প্যারিস পৌঁছতে পারবেন কি না সে বিষয়েও নিশ্চয়তা ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। রাত হয়েছে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে বাড়ি আলোকমালায় সজ্জিত। কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই। শত ধাক্কাতেও দরজা খুলছে না। মিস্ত্রি ডেকে দরজা খুলে দেখা গেল, বালজাকের ভৃত্য ফ্রাঁসোয়া বদ্ধ পাগল হয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাহিরের ডাকাডাকি তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

বালজাকের জীবনের দরজা বন্ধ হয়ে এল। খুলে গেল মৃত্যুর দরজা। ধীরে ধীরে বালজাক শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল। গতিয়েরকে আঁকাবাঁকা অক্ষরে শেষ এক লাইন চিঠি লিখলেন: 'এখন আমি পড়তে বা লিখতে পারি না।'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তৃষ্ণার জল যখন মুখের কাছে এসে পৌছল তখন আর পান করবার ক্ষমতা নেই। ইভলিনের জন্য বাড়ি সাজানো হয়েছিল। প্যারিসের শিল্পী, সাহিত্যিক ও অভিজাত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে উৎসব করবেন ; ইভলিন হবে সেই উৎসবের মধ্যমণি। কত আশা ছিল। কিছুই হল না।

১৮৫০ সালের ১৭ই অগাস্ট রাত্রি সাড়ে দশটায় বালজাক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইভলিন কাছে ছিলেন না। অনেকক্ষণ পূর্বে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মূর্তিমতী শোকের মতো শীর্ণকায়া এক বৃদ্ধা শিয়রে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নেত্রে বালজাকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইনি মা। জীবনে যাঁর স্নেহ পাননি, মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর শোকাচ্ছন্ন মূর্তি দেখে হয়ত একটু শান্তি পেয়েছিলেন বালজাক।

ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক

১৮৮৫—

মোরিয়াক বর্তমান ফরাসী সাহিত্যের অগ্রগামী লেখকদের একজন। তাঁর বই ইংরেজীতে অনুবাদ হবার পর ইংরেজ সমালোচকরা অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, শুধু ফরাসী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সমসাময়িক কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর স্থান প্রথম শ্রেণীতে। একালের শ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক ঔপন্যাসিক হিসাবেও তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্য-রসিক সমাজে এখনো তিনি সুপরিচিত নন। জিদ ও সার্ত্তর স্বদেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন; অথচ মোরিয়াকের নাম জানে খুব কম লোকেই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও এমনিতরো খামখেয়ালীর অভাব নেই। প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার আসে সকলের শেষে; কখনো বা আসেই না। ১৯৫২ সালের নোবেল পুরস্কার মোরিয়াককে সম্মান দিয়েছে, কিন্তু জনপ্রিয়তা দেবে কিনা তা আজও অনিশ্চিত। এখন পর্যন্ত যে মোরিয়াক লোকপ্রিয় হয়ে ওঠেন নি তার কারণ হয়ত তাঁর রচনার মধ্যেই পাওয়া যাবে। মোরিয়াকের রচনায় বর্তমান জীবনের সমস্যাগুলির প্রতিবিম্ব নেই; তাদের সমাধানের ইঙ্গিতও নেই। তাই সমস্যা-জর্জর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হিসাবে তাঁর রচনাবলী আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না। মনোজগতের অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে তাঁর যাতায়াত; আজকের জীবনের অন্তরালে যে শাশ্বত জীবন তার প্রশ্ন নিয়ে মোরিয়াকের কারবার। বর্তমান খণ্ড-জীবনের অচিরস্থায়ী সমস্যার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করবার ক্ষমতা থাকলেই মোরিয়াকের রচনাবলীর সম্যক্ আস্বাদন সম্ভব।

১৮৭৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্য যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং বিদেশে মর্যাদা পেয়েছে তা বোধ হয় আর কোনো সাহিত্য পায়নি। বহুসংখ্যক প্রথম শ্রেণীর লেখক কাব্য, উপন্যাস ও নাটক দিয়ে ফরাসী সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। ১৮৭৫ সালকে ফরাসী সাহিত্যের যুগ-সন্ধি বলে নির্দেশ করা যেতে পারে। ঐ বছরের মধ্যে দুমা, গতিয়ের, মেরিমে, সাঁ প্রভৃতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক যুগ শেষ হয়ে গেল; এল বাস্তববাদ। কিন্তু বছর

দশেক পরই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করল। সহানুভূতিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা চরিত্র চিত্রণ আরম্ভ করলেন আনাতোল ফ্রাঁস্ ও লোটি। ফরাসী সাহিত্যের গতি যখন বাস্তববাদ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ,—এই দুই রীতির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত তখন মোরিয়াকের জন্ম হল।

১৮৮৫ সালের ১১ই অক্টোবর দক্ষিণ ফ্রান্সের বোর্দো শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক (Francois Mauriac) জন্মগ্রহণ করেন। বোর্দো একটি বিখ্যাত কৃষি ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে নানা ধরণের লোকের সমাবেশ ; তাদের বিচিত্র জীবন-যাত্রা মোরিয়াককে ছেলেবেলাতেই আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি বোর্দো শহরের পরিবেশকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমিকারূপে ব্যবহার করেছেন। মোরিয়াকের বয়স যখন মাত্র বাইশ মাস তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তাঁদের চার ভাই এবং এক বোনকে মানুষ করবার ভার পড়ল মা'র উপর। পরিবারের প্রচলিত গোঁড়া রোম্যান ক্যাথলিক আদর্শানুযায়ী মা ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলতে লাগলেন। ছেলেবেলায় অন্যায় গোঁড়ামি সহ্য করতে হয়েছিল বলে বড হয়ে মোরিয়াক গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি।

পাঁচ বছর বয়সে মোরিয়াককে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। স্কুলের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। সকাল সাড়ে পাঁচটায় স্কুলে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরুতে হত, আর ফিরতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যেত। স্কুলের পড়া থেকে মুক্তি পেয়ে মোরিয়াক অন্য ছেলেদের মতো খেলা-ধূলায় যোগ দিতেন না, বসতেন বই নিয়ে। আর একটা অভ্যাস ছিল তাঁর ; নিজের খাতায় লিখে রাখতেন টুকিটাকি কথা যখন যা মনে আসত। জুলে ভার্নের মোহ কাটিয়ে তেরো চৌদ্দ বছর বয়স থেকে উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করেন। একজন অজ্ঞাতনামা লেখিকার 'মাটির পা' উপন্যাসটি তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বালজাক ও দস্তয়ভেস্কির রচনা তাঁর উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে ; কিন্তু তবু ঐ উপন্যাসটির কথা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে পাসকাল ও রাসিন মোরিয়াকের পড়তে ভালো লাগত। রাসিনের ট্র্যাজেডির সুর মোরিয়াকের রচনাকেও স্পর্শ করেছে। পাসকাল (১৬২৩—'৬২) শুধু তাঁর রচনাতে নয়, জীবনেও প্রবেশ করেছেন। যে পাসকাল স্কুলে না পড়ে নিজের চেষ্টায় ষোল বছর বয়সের মধ্যে গণিতশাস্ত্র আয়ত্ত করেছিলেন, যিনি আধুনিক হিসাবযন্ত্রের আদিরূপ আবিষ্কার

করেছিলেন, যিনি বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ধর্মজীবনের প্রশ্নগুলির মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন, জীবনে প্রেমের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও যিনি প্রেমতত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছিলেন, সেই অদ্ভুত রোমাণ্টিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পাসকালের জীবন মোরিয়াককে ছেলেবেলা থেকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। আজও তাঁর টেবিলের উপর দৈনন্দিন হস্তস্পর্শে মলিন পাসকালের এক খণ্ড 'Pensees' বা 'চিন্তাধারা' দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পাসকালের বাণী সঙ্কলন ও সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন মোরিয়াক।

ছেলেবেলায় মোরিয়াক বড় অভিমানী ও বিষণ্ণ প্রকৃতির ছিলেন। এর জন্য হয়ত তাঁর দুর্বল দেহ দায়ী। এবং এদিক থেকেও পাসকালের প্রতি মোরিয়াকের আকর্ষণের একটা কারণ রয়েছে। পাসকাল আজীবন স্বাস্থ্যহীনতার গ্লানি ভোগ করে গিয়েছেন।

বোর্দোর স্কুলে মোরিয়াকের মেধাবী ছাত্র বলে খুব নাম হল। বিশেষ করে সাহিত্য-পত্রে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। এখানকার পড়া শেষ করে ১৯০৬ সালে মোরিয়াক উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিস এলেন। হোস্টেলের সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের সাহচর্যে সাহিত্য-চর্চার সুযোগ পাওয়া গেল। আগেই কিছু কিছু লেখবার অভ্যাস ছিল; এখন অনুকূল পরিবেশে সে অভ্যাস নিয়মিত হল; গুণের দিক থেকেও রচনায় উন্নতি দেখা দিল। এ সময় মরিস বারেস, আঁদ্রে জিদ, পল ক্লদেল প্রভৃতি ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। জিদকে অবশ্য পরে তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন অশ্লীলতার অভিযোগে।

প্যারিসের সাময়িকপত্রে একে একে তাঁর কবিতা ও সাহিত্য সমালোচনা বেরুতে শুরু হল। ১৯০৯ সালে বেরুলো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ Les Mains jointes. বারেস প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা তাঁর কবিতার প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের উৎসাহবাক্য থেকে সাহিত্যের পথে চলবার প্রেরণা পেলেন মোরিয়াক। দু' বছর পরে তাঁর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি কাব্য ছেড়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস L'Enfant Chargé de Chaînes বা শৃঙ্খলাবদ্ধ শিশু; এই উপন্যাসে এবং Commencements d'une vie (১৯৩২) বা জীবনপ্রভাতে মোরিয়াকের ছেলেবেলার ছবি দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরে ফরাসী সরকারের রাজস্ব-বিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মেয়েকে মোরিয়াক বিয়ে করেন। নবদম্পতি

ইতালিতে মধুচন্দ্র যাপন করে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। হাসপাতালের সহকারীরূপে মোরিয়াক নাম লেখালেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় যুদ্ধ শেষ হবার আগেই তাঁকে ফিরে আসতে হল।

এবার মোরিয়াক আত্মনিয়োগ করলেন সাহিত্য সাধনায়। ১৯২০ সাল থেকে গড়ে প্রতি বৎসর একখানা করে উপন্যাস বেরুতে লাগল। তাঁর প্রথম কয়েকটি উপন্যাসে বোর্দো অঞ্চলের সমাজের ছবি পাওয়া যাবে। সেখানকার ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা এবং অর্থের প্রতি অদম্য লালসা তাঁর পাত্র-পাত্রীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ-সব উপন্যাস অপরিণত হাতের রচনা হলেও মোরিয়াকের মূল সুরটি সহজেই অনুভব করা যায়। একদিকে ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে জাগতিক জীবনের মোহ,—এই দোটানায় পড়ে মানুষের মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাঁর সকল কাহিনীর অন্তরালে আছে তারই চিত্র। মোরিয়াকের প্রথম যুগের পাত্র-পাত্রীরা প্রায় সকলেই জাগতিক সুখের প্রতি আকর্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কৃপাভিক্ষা করেছে।

মোরিয়াকের সাহিত্য-জীবনে একটা নতুন যুগের সূচনা হল যখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ বছর। Le Baiser au Lépreux বা 'কুষ্ঠরোগীর জন্য চুম্বন' উপন্যাসটি তাঁকে ফরাসী পাঠক মহলে প্রতিষ্ঠা দিল। এই উপন্যাসেই প্রথম দেখা গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধাপটা পার হয়েছে, দেখা দিয়েছে মুন্শীয়ানা। তাঁর লক্ষ্য স্থির হয়েছে, জীবন-দর্শন সম্বন্ধে আর দ্বিধা নেই। এর পর থেকে একে একে অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন মোরিয়াক; উত্তরোত্তর তাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়ে পাঠকদের আনন্দ দিয়েছে। মোট প্রায় পঁচিশখানি উপন্যাসের মধ্যে এই তিনখানি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য : (১) Le Désert del'Amour (১৯২৫); (২) Thérése Desqueyroux (১৯২৭); এবং (৩) Le Noeud des Viperés (১৯৩২)। কথা-সাহিত্যে ফরাসী একাডেমির সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার Grand Prix du Roman ১৯২৫ সালে মোরিয়াককে দেওয়া হয়।

Asmodée (১৯৩৮) এবং Les Mal Aimes (১৯৪৫) লিখে নাট্যকার হিসাবেও মোরিয়াক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। Asmodée প্যারিসের Comédie Francaise (সরকারী থিয়েটার) এ অভিনীত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সাধারণত জীবিত লেখকের নাটক সরকারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় না।

প্রবন্ধ-সাহিত্যেও মোরিয়াকের দান কম নয়। তিনি রাসিন (১৯২৮) ও যীশুখ্রীষ্টের (১৯৩৬) জীবনী লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহ Le Roman (১৯২৮) ও Dieu et Mammon (১৯২৯) বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। তিন খণ্ড জার্নালে (১৯৩৪-'৪০) পাওয়া যাবে মোরিয়াকের উৎকৃষ্টতম গদ্যের নিদর্শন। তাঁর জার্নাল সাহিত্য, সাহিত্যিক ও শিল্প সম্বন্ধে মন্তব্যে পূর্ণ।

ধর্মপ্রাণ, নীতিপরায়ণ মোরিয়াক সহজেই জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন। ১৯৩৩ সালে তাঁকে বহুবাঞ্ছিত ফরাসী একাডেমির সভ্যপদে নির্বাচিত করা হয়েছে।

গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে, প্রতিরোধ দলে যোগ দিয়ে মোরিয়াক তা থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। শত্রুর আক্রমণে দেশ যখন হতাশায় মুহ্যমান তখন তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, যে শত্রু সব ধ্বংস করতে পারে কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নষ্ট করবার ক্ষমতা তার নেই। এই সাহিত্যের মহৎ বাণীর মধ্যেই রয়েছে নবজীবনের মূলমন্ত্র। ১৯৪০ সাল থেকে ফ্রান্সে যে রাজনীতির খেলা চলছে দুর্ভাগ্যক্রমে মোরিয়াক তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মমত স্বভাবতই তাঁকে কম্যুনিস্ট বিরোধী করে তুলেছে। তিনি প্যারিসের রক্ষণশীল সংবাদপত্র Le Figaro-তে নিয়মিত প্রবন্ধ লেখেন।

নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ জেনে মোরিয়াক বলেছেন, 'জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পেলাম ; এ থেকে ভবিষ্যৎকালের মতামতের আভাসও কিছুটা পাওয়া যেতে পারে। আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মনোভঙ্গীর পাঠকদের চিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেছে সেজন্য আমি আনন্দিত। নোবেল পুরস্কার দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আমার দেশকেই সম্মানিত করা হয়েছে। কারণ আমার অক্ষমতা যত বড়ই হোক না কেন, আমি ফ্রান্সের শাশ্বত বাণীকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছি।'

১৯১১ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রুস্ত, জিদ, রোলাঁ, কলেৎ, দুগার প্রভৃতি বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও মোরিয়াক তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন মোরিয়াক তাঁদের অগ্রগণ্য। ক্যাথলিক আদর্শ, গভীর নীতিবোধ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, কাহিনীর নাটকীয়তা এবং সর্বোপরি আন্তরিক দরদ তাঁর রচনায় স্বকীয়তা এনেছে। ক্যাথলিক হলেও তাঁর মধ্যে প্রাচীন-

পন্থীদের সঙ্কীর্ণতা নেই। মোরিয়াকের ধর্মবোধ ফল্গুধারার ন্যায় কাহিনীর অন্তরালে থাকে। ঈশ্বরের আবির্ভাব গল্পের গতি কখনো ব্যাহত করেনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে ঈশ্বরের উল্লেখ দু' একবারের বেশি পাওয়া যাবে না।

মোরিয়াক 'তেরেসের' (Therese) মুখবন্ধে বলেছেন, 'লোকে হয়ত বলবে আমি তাদের কথা লিখি না কেন যাদের গা দিয়ে ধর্ম চুইয়ে পড়ছে, যাদের জীবন স্বচ্ছ, গোপন কিছুই নেই ? এদের জীবন এমনিতেই স্বপ্রকাশ, গল্প রচনার সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি তাদের কথা জানি যাদের হৃদয় কামনা-বাসনার নীচে চাপা পড়ে আছে। এদের হৃদয়ের কথা উদ্ধার করে প্রকাশ করাই আমার কাজ।'

মোরিয়াক বার বার বলেছেন, খনিগর্ভে চাপা পড়া শ্রমিকের মতো আমরা যেন জীবন্ত সমাধি লাভ করেছি। আমাদের হৃদয় নিষ্ক্রমণের পথ পায় না ; সহস্র লোভ ও কামনার গহ্বরে আমাদের সমাধি হয়েছে। তাই আমাদের সত্য পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। মোরিয়াকের পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে যথার্থরূপে চেনে না ; যে যাকে সত্যি ভালোবাসে জীবনে সে তাকে পায় না। এই অপরিচিতি থেকে জীবনে দুঃখ আসে। নিজেকেও ভালো করে চিনি না বলে পাপের পথে পা বাড়াই। সমাজে ও ন্যায়াধিকরণে যারা অন্যায়ের বিচার করে তারা অনুচিত কার্যের সত্যিকার পটভূমিকাটা উপলব্ধি করতে পারে না। এমন কি, অপরাধী নিজেও তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। তেরেসকে যখন প্রশ্ন করা হল সে কেন তার স্বামীকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন হঠাৎ সে আবিষ্কার করল এ কথার জবাব দেওয়া সহজ নয়। অপরাধীকে নির্মম ঘৃণায় আমরা নীচে ঠেলে দিই, পাপের কুণ্ড থেকে উঠে আসবার পথে তথাকথিত ধার্মিকরাই প্রাচীর সৃষ্টি করে। তাই একবারের পতনটা চিরদিনের পতন হয়ে দাঁড়ায়।

মোরিয়াক সমাহিত মানুষের আত্মার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন। মাটির তলায় হীরা জহরতের খনি কোথায় আছে তা তো উপর থেকে বোঝবার উপায় নেই! তার জন্য মাটি খুঁড়তে হয়। মোরিয়াক এই খননের ভার নিয়েছেন। তিনি পাপীকে উদ্ধারের দাবি করেন না। কিন্তু পাপমণ্ডিত জীবনের নীচে অস্পষ্ট যে হৃদয় রয়েছে তার প্রকৃত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলে দুষ্কৃতিকারীর উপর ঘৃণা দূর হয়ে সহানুভূতি জাগে।

অনুভব করতে পারি একবার ভুল পথে গেলেই জীবনের সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

তাঁর পাত্র-পাত্রীরা পাপাসক্ত, কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়কে ভুলতে পারে না। তাই নিরন্তর তাদের অন্তর ভালো-মন্দর দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। দেহ ও আত্মার বিরোধ আদিতম, শাশ্বত এবং চরম যন্ত্রণাদায়ক। রুশ-জার্মান সংগ্রাম একদিন থেমে যায়, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের যে সংগ্রাম তার বিরাম নেই। এই নিষ্করুণ মর্মান্তিক যুদ্ধ গভীর বেদনার ছায়া ফেলেছে মোরিয়াকের সকল কাহিনীর উপর। এ বেদনা কোনো এক বিশেষ কাল বা দেশের নয়; সর্বকালের সকল মানুষ এর হাতে পীড়িত হয়েছে। তাই মোরিয়াকের ট্র্যাজেডির মহান্ গাম্ভীর্য সহজেই আমাদের আকৃষ্ট করে।

পাপকে মোরিয়াক ঘৃণা করেন, তাঁর সহানুভূতি পাপীর উপর। এ জন্য পাপের ছবি তাঁর রচনায় নেই। তিনি শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। যৌন আবেদনের চিত্রও মোরিয়াকের উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন।

শুধু বিকৃতচরিত্র নরনারীই তাঁর গল্পে ভিড় করেনি। মাঝে মাঝে কয়েকটি মধুর পার্শ্ব চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। Le Fin de la Nuit-এর তরুণী পরিচারিকা অ্যানা এমনি একটি সৃষ্টি। তেরেস একা থাকে একটা ফ্ল্যাটে। অ্যানা তার কাজ সেরে সন্ধ্যার পর বাড়ি চলে যায়। কয়েকদিন যাবৎ তেরেসের মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, একা থাকতে ভয় পায়; মানুষের সান্নিধ্য কামনা করে। সেদিন সন্ধ্যায় বিদায় নিতে গিয়ে অ্যানা চলে আসতে পারল না। তেরেস তাকে আঁকড়ে ধরল; একা থাকতে পারবে না, অন্তত ঘুম না আসা পর্যন্ত বসতে হবে। ইচ্ছা করলেই অ্যানা এই অনুরোধ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত; কিন্তু তবু সে বসল। ভেবেছিল একটু বসেই উঠবে। কিন্তু তেরেসের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ঘুম নামে না। রাত ন'টা বাজল ঢং ঢং করে। কথা ছিল ন'টায় সে আসবে। নতুন প্রেমে পড়েছে অ্যানা। তেরেসের ঘন সান্নিধ্যে বসে সে শুনতে পাচ্ছে তার প্রেমিকের পদধ্বনি। তার ঘরের সামনে এসে পায়ের শব্দ থেমে গেল। সে চাপা গলায় ডাকছে, অ্যানা, অ্যানা! সাড়া না পেয়ে দ্বিধাজড়িত হাতে আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছে। তারপর হতাশ হয়ে সে চলে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল তাদের প্রথম প্রেমের একটা রোমাঞ্চ-মধুর রাত। যার সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক, সেই কর্ত্রীর জন্য এমন

একটা রাতকে বলি দেওয়া সাধারণ পরিচারিকার পক্ষে বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়।

মোরিয়াকের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ কখনো নীরস হয়ে ওঠে না, কারণ তাঁর কাহিনী নাটকীয় পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে খরধার হয়। গল্প বলবার একটা বিশেষ রীতি আছে তাঁর, তা হল অতীতের রোমন্থন,—বর্তমান ঘটনা থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া। তাঁর 'সাপের গেরো' উপন্যাসের নায়ক বৃদ্ধ বয়সে নিজের জীবনের কাহিনী লিখে রাখছে এই আশায় যে, মৃত্যুর পরে স্ত্রী এ থেকে তার সত্য পরিচয়টা জানতে পারবে। কারণ দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করেও তারা পরস্পরের নিকট অপরিচিত। তেরেসের গল্প বলতেও মোরিয়াক এই রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামী হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে তেরেস বাড়ি যাচ্ছে, আর তার ভ্রমণের পটভূমিকায় আগের ঘটনাগুলি বলে দেওয়া হল। 'প্রেমের মরুভূমি'-র রেমণ্ড দীর্ঘ সতেরো বছর পরে এক রেস্তোরাঁয় নায়িকার দেখা পেল। এই সুযোগে মোরিয়াক তাঁর গল্পটা বলে নিলেন। তাঁর মতো শক্তিশালী লেখকের হাতে কাহিনী এগিয়ে নেবার এই কৌশল চমৎকার উৎরে গেছে।

মোরিয়াক ক্ল্যাসিকাল রীতির পক্ষপাতী। যা অনাবশ্যক তাকে তিনি কখনো রচনায় স্থান দেননি। তাঁর কাহিনী শাখ-প্রশাখায় পল্লবিত নয়; অনেক উপন্যাসই একটি বড় গল্পের মতো। ভাষায় কিংবা অনুভূতিতে কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ সৃষ্টির প্রয়াস নেই। বোর্দো অঞ্চলের প্রাদেশিকতা দোষ খানিকটা থাকলেও তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, বেগবান, কবিত্বময়। ভাষার পিঠে চড়ে কাহিনী অনায়াস গতিতে ছুটে চলে।

এত সব বলবার পরও মনে হয়, আসল কথাটাই বলা হয়নি। হয়ত বলা যায়ও না। হাজারো ব্যাখ্যার মধ্যে শিল্পীর মন্ত্রগুপ্তি, তাঁর নিগূঢ় কৌশল ধরা পড়ে না। মোরিয়াকের বই হাতে নিয়ে গল্পের মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

তেরেস বোর্দোর এক বনেদী ক্যাথলিক পরিবারের মেয়ে। ছেলেবেলায় সে এমন পরিবেশে মানুষ হয়েছে যেখানে সর্বদা কেবল টাকা-পয়সা নিয়ে আলোচনা চলত। ছেলেবেলা থেকেই সে বুঝতে শিখেছে, টাকা না থাকলে জীবনে নিরাপত্তা, সুখ বা শান্তি কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বড় হয়ে সে বিয়ে করল তাদের জমির লাগোয়া জমির মালিক বার্নার্ডকে। এ বিয়ের মূলে প্রেম ছিল না; ছিল পারিবারিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া। তার চোখ

পড়েছিল বার্নার্ডের স্বচ্ছলতার উপর। বিয়ের পর তেরেস সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল। বার্নার্ডের পেটে মাঝে মাঝে একটা তীব্র বেদনা দেখা দেয়; এর জন্য তাকে বিষাক্ত ওষুধ খেতে হয়। মাত্রা একটু বেশি হলেই বিপদ। সে বিপদ একদিন সত্যি এল। কিন্তু ডাক্তারের সাহায্যে ফাঁড়া কেটে গেল। আবার কিছুদিন পরে অচৈতন্য বার্নার্ডের জন্য ডাকতে হল ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারের মনে সন্দেহ জাগল। ওষুধের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল তেরেস জাল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান দিয়ে তীব্র বিষ এনেছে। কেন যে এনেছে সে সম্বন্ধে তেরেস কোনো বিশ্বাসযোগ্য জবাব দিতে পারল না। বার্নার্ড ভালো হয়ে উঠল, কিন্তু ডাক্তারের অভিযোগে তেরেসকে উঠতে হল আসামীর কাঠগড়ায়।

বার্নার্ডের সাক্ষ্যের জোরে তেরেস মুক্তি পেল। আদালত থেকে বাড়ি ফেরবার পথে সে স্থির করে এসেছে স্বামীর কাছে সব খুলে বলে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু পৌঁছে দেখল সমস্ত পরিবেশটা পালটে গেছে। স্ত্রীকে ভালোবাসে বলে বার্নার্ড মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি। পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য সে বিচারকে ঠকিয়েছে। অভিযোগটা সত্য প্রমাণিত হলে বার্নার্ডের বোনের বিয়ে হবে না এবং তাঁদের মেয়ে মেরির ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই স্ত্রীকে বাঁচিয়েছে।

তেরেস স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহলেও তো কুলে কালি পড়বে। তাই বার্নার্ড আদেশ দিল তেরেস তার মেয়েকে চোখের দেখাও দেখতে পাবে না; রান্নাঘরে যেতে পারবে না; আবার কবে বিষ দেবে কে জানে? একটা আলাদা বাড়িতে ঝি-চাকর নিয়ে থাকবে। যদি পালিয়ে যায় তেরেস? বার্নার্ড ক্রূর হাসি হাসল। তাহলে হাতকড়া পড়বে। পুলিশের হাতে দেবার মতো অকাট্য প্রমাণ আছে তার জিম্মায়। শিউরে নীরব হয়ে গেল তেরেস। আদালত যাকে মুক্তি দিয়েছে বার্নার্ডের হাতে তার বন্দীদশা শুরু হল।

নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বয়ে বয়ে তেরেস প্রায় পাগল হয়ে উঠল। পথে বেরুতে পারে না, লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে চুপি চুপি কথা বলে। এদিকে বার্নার্ডের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে; তার মেয়েকেও পাঠানো হয়েছে বোর্ডিং-এ; আর কলঙ্কের ভয় নেই। বার্নার্ড তেরেসকে নিয়ে প্যারিস এসেছে; তাকে এখানে রেখে যাবে। চরম বিচ্ছেদের আগে একটা কথা

জেনে যেতে চায় বার্নার্ড। তাকে কেন হত্যা করতে চেয়েছিল তেরেস? এ কথার উত্তর তেরেসও জানে না। অনেকগুলি অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে যেন সম্মোহিত করেছিল। বোধ হয় বার্নার্ড কিছুদিন পর পর যে বেদনা ভোগ করত তার হাত থেকে মুক্তি দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। ঠিক জানে না। বার্নার্ড ভাবল ইচ্ছা করেই সত্য গোপন করছে।

বার্নার্ড ক্ষমা করলে তেরেস সানন্দে তার সঙ্গে ফিরে যেত। সে নিজে ক্ষমা চাইল; অভিমান করে বলল, আমি মরে গেলেই ভালো হত, তাহলে তুমি আবার বিয়ে করতে পারতে। কিন্তু এ সব মান-অভিমানের কথা বার্নার্ডের অন্তর স্পর্শ করল না; সে তাকে প্যারিসের রাস্তায় ফেলে চলে গেল। তেরেস দোকানের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করল। এখনো যৌবন আছে। আছে মুখের লাবণ্যমাধুরী এবং মোহময় হাসিটুকু। সে সুন্দরী নয়, কিন্তু এর জন্য তার খ্যাতি ছিল গ্রামে। এই দেহকে সম্বল করে সে প্যারিসের জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

এর পরে তেরেসের দেখা পাই এক মানসিক ব্যাধির ডাক্তারের চেম্বারে। তেরেস উন্মত্তপ্রায়; খুন করবার একটা দুর্নিবার প্রবৃত্তি তাকে তাড়া করছে। ডাক্তার নিজেও ভয় পেয়ে গেছে। তেরেসের স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারি কী ঘৃণিত জীবন তার। এত নীচে নেমেও মহৎ সুন্দর জীবনকে সে ভোলেনি। তাই তাকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে।

কয়েক বছর পরের কথা। তেরেস প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে। মাথার চুল উঠে উঠে কপাল হয়েছে প্রশস্ত। হাতের শিরাগুলি দেখা যায়। মাঝে মাঝে বুকের বেদনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরিচারিকা অ্যানাকে নিয়ে তার দিন কাটে। হঠাৎ মেরি একদিন সেই সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হল,—সঙ্গে নিয়ে এল জীবনের স্রোত। মা ও মেয়ের মধ্যে এই প্রথম প্রকৃত পরিচয়। তেরেসের মনে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জাগল। বার বার আপন মনে বলতে লাগল, 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে।' সেদিনকার ছোট্ট শিশুটি আজ তরুণী হয়ে দেখা দিয়েছে; বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মেরি জর্জকে ভালোবাসে। জর্জ আইন পড়ে প্যারিসে। তার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ পাবে বলেই সে মা'র কাছে এসেছে। আরো একটা উদ্দেশ্য আছে মেরির। তার মা'র সম্বন্ধে সত্য পরিচয়টা জানতে হবে। একটা গোপন ইতিহাস

আছে জানে; কিন্তু স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি তাকে। কল্পনায় সে ধরে নিয়েছে তার মা ভালোবাসার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে। জর্জের বাড়ি থেকে ওদের বিয়েতে আপত্তি উঠেছে তেরেসের জন্য। মেরি জেরা করে তার কাছ থেকে জেনে নিল অবৈধ প্রেম নয়, তার চেয়েও অনেক সাংঘাতিক অপরাধ করেছে তার মা। মা'র জন্য তার জীবন ব্যর্থ হতে বসেছে। মেরি হতাশায় ভেঙে পড়ল। তেরেস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমি তোমাদের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব; তাহলেই তো বাধা দূর হয়ে যাবে। মেরির আবার মা'র জন্য মায়া হল; তাড়াতাড়ি বলল, না, সে বাধা নয়। জর্জের মনটা উড়ু উড়ু; তেরেস যেন প্রভাব বিস্তার করে তার মন মেরির প্রতি আকৃষ্ট করে। তাহলেই সে কৃতজ্ঞ থাকবে। বাবার ভয়ে মেরি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল।

জর্জের সঙ্গে তেরেসের পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে মেরি। মাঝে মাঝে দেখা হয়। একদিন রাত্রিতে জর্জ এসে বলল, সে মেরিকে চায় না, চায় তার মাকে; সে তেরেসকে ভালোবাসে। তেরেস ভয় পেল; স্তম্ভিত হল। তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস বুঝি স্পর্শ করেছে জর্জকেও। পর মুহূর্তে একটা বিজাতীয় আনন্দে মন ভরে গেল। সপ্তদশী তরুণীকে ত্যাগ করে চল্লিশোত্তীর্ণা বিগত-যৌবনা তার দিকে ঝুঁকেছে জর্জ। তার জীবনে এই শেষবারের মতো প্রেমের আবির্ভাব। তেরেসের অভিজ্ঞ চোখ ঠকে না। জর্জের অনুরাগ খাঁটি। শেষ নয়, এই তার প্রথম প্রেম। যারা তার জীবনে এর আগে এসেছে তারা ছিল যৌবনের ভোজে ক্ষণিকের অতিথি। জর্জ তার দেহ দেখে ভোলেনি। এই প্রেমকে গ্রহণ করবার লোভ সে সংবরণ করবে কেমন করে? তার দীর্ঘকালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সংযম ছিল না।

ঘড়ির তাকের উপর নীল খামের চিঠিটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল। আজই মেরির চিঠি এসেছে। লিখেছে, মা, তোমার হাতেই আমার জীবন। ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেল তেরেস। তোমার হাতেই আমার জীবন। জর্জকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল, আর এখানে এস না। তারপর নিঃসঙ্গ শয্যায় এপাশ-ওপাশ করে ক্ষোভ হতে লাগল, জীবনের একমাত্র সুধাপাত্র নিজের হাতে ছুঁড়ে ফেলেছে। কোনো সাক্ষী ছিল না; কেউ জানত না; একটা রাত্রির স্মৃতি অনন্ত সুধায় ভরে দিতে পারত তার জীবন।

লোভ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বে পড়ে তেরেসের মন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। অতীতের

সকল অপরাধের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ এবং তার সন্ধান করছে,—এমনি একটি কাল্পনিক ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো শব্দ শুনলেই মনে করে, পুলিশ এসেছে ; রাত্রে ঘুমাতে পারে না, পাছে অতর্কিতে পুলিশ এসে পড়ে। প্রায় উন্মাদ। অ্যানার চিঠি পেয়ে মেরি এল। তেরেস মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাদের বাড়ি আমাকে নিয়ে চল ; এখানে থাকলে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে জেলে দেবে।

কিন্তু—। বুঝতে পারল তেরেস। বলল, তোমাদের অত বড় বাড়ি ; এক কোণে আমি পড়ে থাকব, কেউ টেরও পাবে না। অগত্যা মেরি রাজী হল। যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল একদিন, সেখানেই ফিরে এল। বার্নার্ড এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের মুখ হল গম্ভীর। কিন্তু তার দেহের অবস্থা দেখে বুঝল আর বেশিদিন নয়। এর পর থেকে শুরু হল শেষ দিনটির প্রতীক্ষা।

জর্জ বাড়ি এসেছে কলেজের ছুটিতে। তেরেসের অসুখের সংবাদ শুনে দেখতে এল। তেরেস মেরি ও জর্জের হাত মিলিত করে আশীর্বাদ করল, তোমরা সুখী হও। মেরি নারীসুলভ অন্তদৃষ্টি দ্বারা আগেই জর্জের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে। তাই বুঝল জর্জ এগিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করেনি, তেরেসের শেষ অনুরোধ রক্ষা করল সে।

মেরি ঘরে নেই ; জর্জ তেরেসের কাছে এসে দাঁড়ালো। তেরেস তার অতীতের দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে মৃত্যুর পূর্বে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। জর্জ ভাবল, তাকে প্রবোধ দেবে ; বলবে, তেরেস, তুমি কোনো পাপ করোনি। তুমি পুরুষের অর্ধমৃত, অনুর্বর হৃদয়ে জীবনের বীজ বপন করেছ। লাঙ্গলের নিষ্ঠুর ফলার মতো তুমি পুরুষের হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করেছ ; এর ফলে আমার মতো অন্য অনেকে জীবনের স্বাদ পেয়েছে ; তুমি পাপ করোনি।

কিন্তু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, বলতে পারল না কিছুই। দেখা করবার জন্য নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল। জর্জ জিজ্ঞাসা করল, একটা বই দিয়ে যাব? পড়বে?

না, আজকাল সে পড়তে পারে না। তেরেস বলল, কিছুই করি না ; শুধু ঘড়ির শব্দ শুনি আর প্রহর গুণি সমাপ্তির…।

কিসের সমাপ্তি? রাত্রির শেষ?

অকস্মাৎ তেরেস তার হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল ; কিসের

দীপ্তিতে চোখ ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বলল, হাঁ, প্রিয়তম, জীবনের শেষ আর রাত্রি শেষের প্রতীক্ষা।

'প্রেমের মরুভূমি'-র ডাক্তার কুরাজ, মারিয়া ক্রশ ও রেমণ্ডকেও ভোলা যায় না। অনেকে বলেন, এটি মোরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'প্রেমের মরুভূমি' প্রকাশের পর তিনি কথা-সাহিত্যে ফরাসী একাডেমির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান।

মারিয়া ক্রশ একটি শিশু সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছে। এই ছেলের চিকিৎসা উপলক্ষ্যে হল ডাক্তার কুরাজের সঙ্গে পরিচয়। ছেলে শেষ পর্যন্ত বাঁচল না, কিন্তু যাতায়াতটা থেকে গেল। ডাক্তার কুরাজ গম্ভীর প্রকৃতির কর্তব্যপরায়ণ লোক। স্ত্রী, পুত্র এবং পরিবারের অন্য কারো সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা নেই। তাঁর মন নিঃসঙ্গ। হঠাৎ বহুনিন্দিতা মারিয়ার প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ জাগল। সমস্ত দিনের কাজের মধ্যে সেই মুহূর্তটির জন্য লালায়িত হয়ে থাকেন কখন মারিয়ার সঙ্গে দেখা হবে। মারিয়া ডাক্তারকে শ্রদ্ধা করে, তার বেশি কিছু দিতে পারল না। এক চিঠি দিয়ে মারিয়া তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিল। চিঠিতে তুলে দিয়েছে মেতারলিঙ্কের একটা লাইন: 'এমন দিন আসবে, এবং সে দিন বেশি দূরে নেই, যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অনুভব করা যাবে।'

ডাক্তারের ছেলে রেমণ্ড তখন স্কুলে পড়ে। অল্প বয়সেই সে বখাটে নাম কিনেছে। স্কুল থেকে ফেরবার পথে ট্রামে মারিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। মারিয়ার নামের সঙ্গে অপবাদ জড়িত ছিল বলে উদ্ভিন্নযৌবন রেমণ্ড সহজেই তার প্রতি আকৃষ্ট হল। তাছাড়া অল্প বয়সে প্রেম-প্রয়াসী বলে অন্য মেয়েরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কিন্তু মারিয়া তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল যাতে রেমণ্ড উৎসাহিত হল। একদিন কামনাজর্জর চিত্তে রেমণ্ড গেল মারিয়ার বাড়ি, কিন্তু মারিয়া সাড়া দিল না। আহত হৃদয়ে অতৃপ্ত কামনা নিয়ে ফিরতে হল রেমণ্ডকে।

এরপর রেমণ্ডের জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচল ; সে গেল প্যারিস। একটি মেয়ের কাছ থেকে যা চেয়ে পায়নি প্যারিসের পথে পথে হাজারো মেয়ের মধ্যে তাই সে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কামনার নির্বাণ কই ? অতীত থেকে একটি অচুম্বিত মুখ সিনেমার ক্লোজ-আপের মতো ক্রমশঃ বড় হয়ে তার চারপাশে ভেসে বেড়ায়। শান্তি নেই। এত মেয়েকে জেনেছে, তবু একটি মেয়ের অভাবে তার কৌমার্য ঘুচল না।

দুর্লভ জীবন ; জীবনের একটি মাত্র কামনা তৃপ্ত হল না ; অথচ এর জন্য সে জীবনটাকে ধুলোর মতো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সতেরো বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘকাল সে আশা করেছে মারিয়া ক্রশের সঙ্গে একদিন দেখা হবে। অন্তত এই আশাটুকু পুর্ণ হল। হঠাৎ রেস্তোরাঁয় দেখা পেল মারিয়া এবং তার স্বামীর। একদিন মারিয়া ভিক্তর লারুসেলের রক্ষিতা ছিল, আজ তাকে বিয়ে করেছে। একটু দূর থেকে দু'জনে দু'জনকে লক্ষ্য করতে লাগল। ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ এল যখন লারুসেল মাতাল হয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। রেমণ্ডের সাহায্যে অচৈতন্য স্বামীকে বাড়ি নিয়ে এল মারিয়া। একটা চিকিৎসক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ডাক্তার কুরাজও প্যারিসে ছিলেন। রেমণ্ড তাঁকে টেলিফোন করে আনালো। রোগীর ব্যবস্থা করে বিদায় নেবার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথা হল মারিয়ার সঙ্গে। তাতেই বোঝা গেল ডাক্তার এখনো ভোলেন নি মারিয়াকে। বরং বহুদিনের ব্যবধানে সে-আকর্ষণ আরো তীব্র হয়েছে। মারিয়া স্বামীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি বিদ্রূপ ক'রো না ; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, ডাক্তার আমাকে সত্যি ভালোবাসত। স্বামী ঘুমাবার পর রেমণ্ড যেখানে বসেছিল সে জায়গায় মারিয়া তার কম্পিত মুখের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

রেমণ্ড তার বাবার নূতন পরিচয় পেল ; সহানুভূতিতে ভরে উঠল তার মন। তাদের শুধু পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নয় ; দু'জনেই মারিয়াকে কামনা করেছিল, দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা তারা একভাবে গ্রহণ করেনি। তার বাবা সংযম ও ধর্মের পথ ধরেছেন, আর সে নিয়েছে পাপের পথ। দেখা গেল কামনা সংযমের দ্বারা গভীর হয়, ভোগের পথে হয় তীব্রতর। তাকে জয় করবার পথ নেই। এই সংসারের মরুভূমিতে আমরা মরুদ্যানের মতো। দুই মরুদ্যানের মধ্যে দুস্তর অনুর্বর বালুরাশির ব্যবধান। মিলতে চাই, এই ব্যবধানের জন্য পারি না। তাই অতৃপ্ত কামনা বুকে করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। রেমণ্ড দেখল সে একটি কামনার সূর্য ; যারা তাকে ভালোবেসে প্রতিদান-পায়নি তারা গ্রহ উপগ্রহের মতো কামনা-সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আর বিকীর্ণ করছে জ্বালাকর উত্তাপ। এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই? হয়ত নেই, একমাত্র ঈশ্বরের করুণা ছাড়া।

'দি কিস্ টু দি লেপার' (১৯২২) মোরিয়াককে ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সহায়তা করেছে। এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, সে বিষয়ে

সন্দেহ নেই। ক্যাথলিক জীবনাদর্শের সঙ্গে বর্তমান কালের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে সংঘাত চলছে তারই বিভিন্ন রূপ মোরিয়াক উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 'দি কিস্ টু দি লেপার' বিবাহের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ক্যাথলিক উচ্চাদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্বের চিত্র। আত্মার মিলন বড়, না দেহের মিলন? এই সমস্যা জঁ্য পেলুয়ের ও নোয়েমির বিবাহিত জীবন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

জঁ্য পেলুয়েরের মা'র মৃত্যু হয়েছে ছেলেবেলায়। দেখতে কুৎসিত। অনাদরে মানুষ হয়েছে বলে তার হৃদয় বড় অনুভূতিপ্রবণ। নানা কারণে তার পড়াশুনাও বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। সবাই বলত বিয়ে করবার মতো কোনো যোগ্যতাই তার নেই। কোনো মেয়েই তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। কিন্তু বাবার আগ্রহে ও মধ্যস্থতায় বিয়ে হল নোয়েমির সঙ্গে। নোয়েমি সুন্দরী, ধর্মপ্রাণ শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তাকে পেয়ে পেলুয়ের হাতে স্বর্গ পেল। কিন্তু ভুল ভাঙল দু'দিনের মধ্যেই। দেহের সম্পর্ক কেউ সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারল না। সহজকে অস্বীকার করবার শাস্তি হিসাবে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠল। বিবাহিত জীবন সফল হবার আশা নেই দেখে পেলুয়ের চলে গেল প্যারিস। বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ তীব্রতর করে তুলল। নোয়েমি লিখল স্বামীকে ফিরে আসবার জন্য। কিন্তু ফিরে আসবার পর আবার যখন দৈহিক সান্নিধ্যের প্রশ্ন উঠল তখনই প্রবল হয়ে দেখা দিল সেই পুরনো দ্বন্দ্ব। শয্যা পৃথক করেও সমস্যা এড়ানো গেল না। দু'জনেই মানসিক যন্ত্রণায় তিলে তিলে দগ্ধ হতে লাগল।

প্যারিসের বাতাস থেকে পেলুয়ের নিয়ে এসেছে ফুসফুসের দুরারোগ্য ব্যাধি। ব্যাধির আক্রমণে দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, দেহ যত ক্ষীণ হতে থাকে, ইন্দ্রিয় যত দুর্বল হয়, ততই সে নোয়েমিকে হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় করে পায়। দেহের কামনা অস্তমিত হল; এবার আর দ্বন্দ্ব নেই; এখন আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। স্বামীর মৃত্যুর পর নোয়েমি তার স্মৃতি-পুজায় জীবন উৎসর্গ করল।

মোরিয়াকের পাত্র-পাত্রীদের হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব নিছক কাল্পনিক নয়। আত্মা ও দেহের দ্বন্দ্ব তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর শিল্পী মন পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ পরিপুর্ণরূপে উপভোগ করবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ক্যাথলিক ঐতিহ্য রয়েছে তার তাড়নায় ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে দেহাতীত

আত্মার উপলব্ধির জন্য সাধনা করবার কথা তাঁকে বলতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে মোরিয়াকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যধর্মী মনে হলেও এদের মূল কথা প্রায় সর্বত্রই এক। মোরিয়াকের নায়ক সুস্থ ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে জীবন আরম্ভ করে। নায়িকার সঙ্গে পরিচয় হবার পর মনে হয়, একে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। অথচ দেহের আকর্ষণের সঙ্গে পাপবোধ জড়িত থাকায় নায়ক প্রত্যয়ের সঙ্গে নায়িকাকে জয় করবার জন্য অগ্রসর হতে পারে না। এর পরিণতি হিসাবে নায়ক হয় বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে ; অথবা, ক্যাথলিক আদর্শ ও সহজাত আকাঙ্ক্ষার নিরন্তর সংঘাত তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

মোরিয়াকের উপন্যাসে কতকগুলি পাপীর চরিত্রের মিছিল পাওয়া যায়। মোরিয়াক ক্যাথলিক হয়েও ধর্ম অপেক্ষা পাপকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পাপীর চরিত্র তিনি এঁকেছেন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে। এদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি আছে বলেই পাপীকে পাঠক ঘৃণা করতে পারে না। যে পাপ করে সে যে আমাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে আমরাও যে যে-কোনো মুহূর্তে পাপীর পর্যায়ে নেমে যেতে পারি,—এই অনুভূতি মোরিয়াকের রচনার প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করে।

জঁ্যা পল সার্তর্

১৯০৫-

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জঁ্যা পল সার্তর্-এর নাম ফ্রান্সের গণ্ডী পার হয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের পূর্বে তাঁর নাম স্বদেশেও সুপরিচিত ছিল না। বায়রণ একদিন অখ্যাতির অন্ধকার থেকে অকস্মাৎ খ্যাতির জগতে জেগে উঠেছিলেন। বায়রণের ছিল নিছক সাহিত্যের খ্যাতি। কিন্তু সার্তর্-এর খ্যাতি শুধু তাঁর রচনার উপর নির্ভরশীল নয়। অস্তিত্ববাদের প্রচারক হিসাবে তিনি বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এ ছাড়া ফ্রান্সে তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল। তিনি জার্মান অধিকারের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং নাৎসী বিবাচক প্রথার কঠোরতা ফাঁকি দিয়ে দেশপ্রেম-মূলক নাটক রচনা করে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের মুক্তির জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টাকে দেশবাসী সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছে যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই। যুদ্ধ শেষ না হতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ছিল না।

প্যারিসের তরুণ সম্প্রদায় আরো একটি কারণে সার্তর্-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সে হল তাঁর কাফে ও রেস্তোরাঁয় বোহেমিয়ান জীবন-যাত্রা। রাজনীতি, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেবার আকর্ষণ তরুণদের মধ্যে কম নয়। সার্তর্-এর রচনায় যত এপিগ্রাম পাওয়া যায় সাম্প্রতিক কালের অন্য কোনো লেখকের মধ্যে তা নেই। যেমন, তিনি তাঁর এক চরিত্রের মুখ দিয়ে মেয়েদের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন: 'A door which shuts, a noose which tightens, an axe which falls—that's woman.' আবার অন্যত্র বলেছেন: 'The only difference between man and beast is that man can put an end to his life and the beast cannot.' এই ধরনের কথাগুলি সহজেই যুবকদের আকৃষ্ট করে। তারা সার্তর্-এর এপিগ্রাম মুখস্থ করে কথায় কথায় উদ্ধৃত করতে আরম্ভ করল; এদের ব্যাখ্যা নিয়ে তর্ক শুরু হল ছাত্র সমাবেশে।

এই সব কারণে তরুণ সম্প্রদায়ে অল্প দিনের মধ্যেই সার্তর্ প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

১৯০৫ সালে প্যারিস শহরে সার্তর্ জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দর্শন ছিল তাঁর খুব প্রিয় বিষয়। ১৯২৯ সালে পাঠ সমাপ্ত করে সার্তর্ আরম্ভ করেন শিক্ষকতা বৃত্তি। পর পর অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবার পর দেশ ভ্রমণে বের হলেন। ইতালী, গ্রীস ও মিশর ঘুরে এলেন জার্মানী। এখানে তিনি দু'বছর যাবং এড্‌মাণ্ড হুসার্ল ও মার্টিন হাইডেগারের নিকট দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। সোরেন কিয়েরকেগার্ডের রচনাবলীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় এখানেই হয়। কিয়েরকেগার্ড অস্তিত্ববাদের দর্শনকে সর্বপ্রথম একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছেন। এই তিনজন দার্শনিকের রচনা ও চিন্তাধারা সার্তর্-এর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করল।

১৯৩৫ সালে সার্তর্ প্যারিস ফিরে এসে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন। আর এ সময় থেকেই বিভিন্ন কাগজে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের উপরে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। এ ছাড়া ফকনার, কল্ডওয়েল, হেমিংওয়ে প্রভৃতি আমেরিকান লেখকদের সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ-সব রচনায় ভবিষ্যৎ সাহিত্য-প্রতিভার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হলেও সার্তর্-এর প্রকৃত সাহিত্য জীবন শুরু হয় ১৯৩৮ সালে। ঐ বছর তাঁর প্রথম উপন্যাস La Nausée প্রকাশিত হল।

পূর্বেই বলেছি যে, সার্তর্ অস্তিত্ববাদের প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে যেরূপ পরিচিতি লাভ করেছেন, লেখক হিসাবে তত নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে অস্তিত্ববাদী সার্তর্ লেখক সার্তর্‌কে ঢেকে রেখেছে। বিচার করলে কিন্তু দেখা যাবে যে, লেখক হিসাবেই তিনি প্রতিষ্ঠা পাবার দাবি করতে পারেন। তাঁর আসল দান সাহিত্যে, দর্শনে নয়। সার্তর্ দার্শনিক নন্; নতুন কোনো দার্শনিক তত্ত্ব তিনি প্রচার করেন নি। কিয়েরকেগার্ড, হুসার্ল ও হাইডেগারের মতবাদকে তিনি বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় সরলভাবে উপস্থিত করেছেন। দর্শনের সঙ্গে এই তাঁর সম্পর্ক। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে তাঁর রচনা দর্শনমূলক—প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, উপন্যাস সবই। সার্তর্ অস্তিত্ববাদকে কি ভাবে গ্রহণ করেছেন তা উপলব্ধি না করলে তাঁর রচনার রসাস্বাদন সম্ভব নয়।

অস্তিত্ববাদের তত্ত্ব সার্তর্ আবিষ্কার করেন নি। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ববাদকে নতুন করে প্রচার করেছেন। আসলে অস্তিত্ববাদের মূল কথা পুরাতন। নোভালিস, দস্তয়ভেস্কি, কাফকা, উনামুনো প্রভৃতি লেখকের রচনায় অস্তিত্ববাদের কথা ওতপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে। সার্তর্-এর রচনার মতো অবশ্য অস্তিত্ববাদ সেখানে সোচ্চার নয়, তবু তাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। তবে হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই অস্তিত্ববাদ এমন জনপ্রিয় হল কেন? আর এই জনপ্রিয়তা প্রধানত ফ্রান্সেই কেন দেখা যায়? সার্তর্, কামু, সিমন দ্য বোভওয়ার, ম্যালর', গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রভৃতি অস্তিত্ববাদের প্রতি কেন আকৃষ্ট হয়েছেন? কামু ও ম্যালর' অবশ্য নিজেদের অস্তিত্ববাদী বলেন না। কিন্তু তাঁদের রচনায় অস্তিত্ববাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। সার্তর্ যুদ্ধপূর্ববর্তী দার্শনিক প্রবন্ধে এবং তাঁর প্রথম উপন্যাসে (১৯৩৮) অস্তিত্ববাদের কথা বলেছেন। ১৯৩৯ সালের পূর্বে প্রকাশিত কামুর কয়েকটি প্রথম পর্যায়ের রচনার মধ্যেও অস্তিত্ববাদের প্রভাব চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অস্তিত্ববাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হতাশ করল। যাকে সত্য ও ন্যায় বলে এতদিন বিশ্বাস করেছে যুদ্ধের আঘাত সেই বিশ্বাস চূর্ণ করে দিল। নীতি, ধর্ম ও জীবনের মূল্য কিছুই আর রইল না। জীবনের ভিত্তি টলে উঠল। এই উপলব্ধি ফ্রান্সে গভীরতর হয়েছিল বিশেষ একটি কারণে। ফ্রান্স য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির জন্য ফরাসীদের বেশ একটু গৌরববোধ ছিল। সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নত হয়েও নাৎসী শক্তির বর্বরতার নিকট পরাজিত হয়ে ফরাসীদের মনে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে গভীর প্রশ্ন জাগল। বেদনার আঘাত মানুষের মনকে সচেতন করে, ভাবতে শেখায়। যুদ্ধের পরে য়ুরোপের নাগরিকরা, বিশেষ করে ফরাসীরা, প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, জীবনের কি অর্থ? যুদ্ধের বর্বরতা যদি মানুষের যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু একান্তরূপে প্রিয়, তা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয় তাহলে কেন আমরা বেঁচে আছি? সংসারে আমাদের এই অস্তিত্বের, এই বেঁচে থাকবার কী অর্থ হতে পারে? পৃথিবীতে যদি মানুষ না থাকত তাহলে কার কী ক্ষতি হত?

নিজের অস্তিত্বের মূল্য সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয় দেখা দিল সংসারের অদ্ভুত ও অযৌক্তিক রীতি দেখে। যা সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয় সংসারে

তার উল্টোটাই ঘটে। হৃদয়ের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি অকারণ বিরোধিতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। বেঁচে থাকার অর্থ ই হল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম,—অযৌক্তিক অকারণ বাধার বিরুদ্ধে লড়াই। আত্মহত্যা করে এই সংগ্রামকে এড়ানো যায়। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা আত্মহত্যার পক্ষপাতী নয়। তাহলে মানবতাবিরোধী শক্তিগুলি আরো প্রবল হবার সুযোগ পাবে। সমাজে সকলের সঙ্গে যোগস্থাপন করে মিলিত ভাবে সংসারের কঠোর বাধাগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করে যেতে হবে। কোনো ফলের আশা না রেখেও এই নিরন্তর সংগ্রাম করে চলাই বিবেকবান মানুষের নিরূপিত ভাগ্য।

বিপদের দিনে মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। এ এক রকম পর-নির্ভরতা। নিজের সমস্যা ও দায়িত্বের বোঝা ঈশ্বর নামধারী এক শক্তির উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তির জীবনবোধ ও কর্মশক্তির উপর বিশ্বাসী। তাই অস্তিত্ববাদে ঈশ্বরের স্থান নেই। (অবশ্য গ্যাব্রিয়েল মার্সেল প্রমুখ খ্রীষ্টান অস্তিত্ববাদীরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন না।) ঈশ্বরকে অস্বীকার করবার অর্থ এ নয় যে অস্তিত্ববাদীরা নীতি-হীনতার সমর্থক। দস্তয়েভ্স্কির 'দি পসেস্‌ড্'-এর কিরিলভের মতো অস্তিত্ববাদীরা বলে না যে, ঈশ্বর যখন নেই, তখন আমরা যা-খুশি করতে পারি। বরং অস্তিত্ববাদ মানুষের উপর অপরিসীম দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। অনুপস্থিত ঈশ্বরের স্থান মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং দায়িত্বহীন জীবনযাপনের সুযোগ তার নেই।

আমি বেঁচে আছি—এই উপলব্ধিটাই সব চেয়ে বড় কথা। মানুষের জীবন কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট ছাঁচে তৈরী নয়। প্রত্যেকটি জীবনেরই বিশিষ্ট রূপ আছে। পুঁথিগত দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে জীবনকে পঙ্গু করা যায়, বিকাশ করা যায় না। জীবন ব্যক্তির উপলব্ধির বস্তু; সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষ তত্ত্বের দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির সাহায্যেই জীবনের পথ নির্দেশ করা উচিত। জীবনের কুৎসিত ও দৈন্যের দিকটা বড় করে দেখানো হয় বলে অস্তিত্ববাদী লেখকদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। মানুষের মৌলিক সত্তাকে উদ্ঘাটিত করবার উদ্দেশ্যেই জীবনের ভালো এবং মন্দ দিকটা ও অবচেতন মনের নগ্নতাকে বিশদরূপে দেখানো হয়। অস্তিত্ববাদী লেখকদের অশ্লীলতার প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই।

অস্তিত্ববাদের একটি প্রধান কথা হল মানুষের স্বাধীনতা। প্রত্যেক

মানুষেরই মুক্তিলাভের স্বাধীনতা আছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না; আকাঙ্ক্ষা থাকলে মুক্তি অর্জন করা যেতে পারে। মুক্তি অর্জনের স্বাধীনতা আছে বলেই আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এবং এই জন্যই সকল প্রকার স্বাধীনতা সম্বন্ধে অস্তিত্ববাদীরা একান্তরূপে সচেতন। সার্তর্ 'সাহিত্য কী' গ্রন্থে বলেছেন :

'There is no such thing as a given freedom. One must conquer oneself over passions, race, class, nation, and one must conquer other men along with oneself.'

সার্তর্-এর অস্তিত্ববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি। প্রথমত, তিনি নিরীশ্বরবাদী; কারণ, তিনি মনে করেন, মানুষ নিজের সুবিধার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, তিনি নিরাশাবাদী; কেননা, মানুষ অন্য কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায় না, এই ধারণা আশাবাদের পরিপন্থী। তৃতীয়ত, সার্তর্ মানবতায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, চেষ্টার দ্বারা সমাজ ও ব্যক্তি-চরিত্র উন্নত করবার ক্ষমতা মানুষের অপরিসীম। সার্তর্ বলেছেন যে, মানুষ 'is alone, abandoned on earth in the midst of his infinite responsibilities, without help, with no other destiny than the one he sets himself, with no other destiny than the one he forges for himself on this earth. Human existence, is thus a void, a total frustration. Man exists, but for this there is no more reason than for his non-existing.'

এখানে সংসারের নির্মম সংগ্রামের উপর জোর দিলেও সার্তর্ যে সম্পূর্ণ নিরাশাবাদী এমন কথা বলা যায় না। মানুষ আত্মনির্ভর হয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে সমাজের মঙ্গল হতে পারে। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব অনেক, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবার উপায় নেই। সার্তর্-এর কথায় এ দায়িত্বের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'man is nothing else but what he makes of himself. You're free, choose, that is, invent.'

সার্তর্ তাঁর সাতশ' পৃষ্ঠার বিরাট বই L' Etre et le néant (Being and Not-Being)-এ অস্তিত্ববাদের ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৪৩ সালে এ-বই বেরিয়েছে। সার্তর্-এর ব্যাখ্যায় সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি এবং কোথাও কোথাও পরস্পর-বিরোধী কথা আছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন।

সাহিত্যে সার্তর্ অস্তিত্ববাদকে একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে ততটা ব্যবহার করেন নি যতটা করেছেন মনোবিজ্ঞান হিসাবে। লেখক সার্তর্-এর নিকট অস্তিত্ববাদ হল পাত্র-পাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত করার জন্য মনোবিজ্ঞান-মূলক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী।

অস্তিত্ববাদের কথা বাদ দিয়ে সার্তর্-এর রচনা বিচার করলে দেখা যাবে যে, সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি দাস প্যাসস, ফকনার প্রভৃতি আমেরিকান ন্যাচারালিস্ট লেখকদের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সার্তর্-এর গল্প, উপন্যাস ও নাটক ন্যাচারালিজম বা অতি-বাস্তবতার ধারা অনুসারে রচিত। জীবনের যে দিকগুলি আমরা সাধারণত গোপন করার জন্য ব্যগ্র, সার্তর্ তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে পাঠকদের চমকিত করেছেন। সার্তর্-এর অধিকাংশ চরিত্রই দুর্বলতা ঢাকবার জন্য কঠোরতার ছদ্ম আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখে।

সার্তর্-এর প্রথম উপন্যাস La Nausée বা Nausea. এই উপন্যাসে আমরা সার্তর্‌কে দস্তয়েভস্কির সগোত্র হিসাবে দেখতে পাই। নায়কের ব্যক্তি-মানসের নিপুণ উদ্‌ঘাটন দস্তয়েভস্কির চরিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির সহিত তুলনীয়। কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে বিংশ শতাব্দীর দস্তয়েভস্কি আখ্যা দিয়েছিলেন।

কাহিনীর নায়ক আঁতোয়ান রোকাতাঁ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক ঐতিহাসিক। য়ুরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সে বুভিল শহরে আপাতত গবেষণা করছে। গবেষণা মার্কুইস্ দ্য রলেবঁর জীবন সম্পর্কে। রলেবঁর জীবন সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রামাণ্য জীবনী লেখাই রোকাতাঁর উদ্দেশ্য। দিনের পর দিন লাইব্রেরিতে বই ও দলিল-পত্র ঘেঁটে তথ্য সংগ্রহ করছে। অন্য কোনো বিষয়ে আগ্রহ নেই। মন আকর্ষণ করবার মতো কিছু ছিলও না সেই শহরে। কাফের কর্ত্রী ফ্রাঁসোয়াজ রাত্রিবেলার একমাত্র সঙ্গিনী। দিন কাটে পুঁথি-পত্র নিয়ে।

জীবনী একটু একটু করে লিখছে। কাজ সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে না। তৃতীয় বৎসরে এক দিন হঠাৎ কি হল। একটা অনুচ্ছেদের মধ্যভাগেই বন্ধ করল তার জীবনী। আর লিখবে না। মনে হল, এ-সব কাজের কোনো অর্থ নেই। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রোকাতাঁর আকস্মিক মানসিক পরিবর্তন হল। চারপাশের সকল বস্তু, এমন কি নিজের হাত পা মুখও নতুন রূপে দেখা

দিল তার চোখের সামনে। যে আবরণ পৃথিবীর সব কিছু সুন্দর করে তোলে, হঠাৎ কে যেন সেই আবরণটা তুলে নিয়েছে। তার ফলে তাদের কুশ্রী ও বিকৃত অস্তিত্বের দৃশ্য বেদনাদায়ক হয়েছে রোকাতাঁর চোখে। বিবমিষা ও বিতৃষ্ণার যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। অস্তিত্বের বিকৃতিটা যদি একমাত্র বাহিরের বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলে রোকাতাঁ যন্ত্রণা অনুভব করত না। কিন্তু সে উপলব্ধি করল যে বিকৃত মনের প্রসারই বাহিরের বস্তুর রূপকে তার চোখে বিকৃত করেছে। সেই জন্যেই তার বেদনা। রোকাতাঁ আরো গভীর আঘাত পেল যখন সে দেখল শুধু চারপাশের বস্তুগুলিই তার কাছে বিকৃত হয়নি; তার বহু দিনের প্রণয়িনী এবং ভ্রমণের সঙ্গিনী অ্যানিরও পরিবর্তন হয়েছে। অ্যানি তাকে আর ভালবাসে না। এবার থেকে রোকাতাঁর অস্তিত্ব ঠিক জড় পদার্থের মতো হবে। সার্ত্‌র্ রোকাতাঁর চরিত্রে অস্তিত্ববাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

পর বৎসর সার্ত্‌র্ Le Mur নাম দিয়ে তাঁর পাঁচটি গল্পের সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য পাঠক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'দেওয়াল' ও 'অন্তরঙ্গতা' গল্প দু'টি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'দেওয়াল' গল্পে মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নায়ক মৃত্যুর ভয়ে ভীত নয়। ভবিষ্যৎ জীবনের যে ছবিটা মৃত্যুর স্পর্শে মুছে যাবে নায়কের বিবৃতি থেকে তার মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। গল্প শেষ করে পাঠকের মনে হবে সমস্ত ব্যাপারটাই অ্যাবসার্ড,—অদ্ভুত ও অযৌক্তিক। 'অন্তরঙ্গতা' গল্পের লুলু ও তার স্বামীর পরস্পরকে ঠকানোর কাহিনীও মনের উপর দাগ রেখে যায়। এই গল্পগুলি সার্ত্‌র্‌কে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বিশেষরূপে সহায়তা করেছে।

গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হবার কিছু দিন পরেই সার্ত্‌র্ ফরাসী সেনা-বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪০ সালের জুন মাসে জার্মানদের হাতে বন্দী হয়ে নয় মাস তাঁকে নাৎসী ক্যাম্পে থাকতে হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি ফিরে এলেন ফ্রান্সে। কিন্তু স্বাধীন ফ্রান্স নয়। ফ্রান্স তখন নাৎসী সেনার অধিকারে। তিনি ফরাসীদের স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য নাৎসী সেন্সার এড়িয়ে গোপনে চোরাই সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা হল একটি নাটক,—Les Mouches অথবা The Flies. সফোক্লিসের 'ইলেক্ট্রা' নাটকের উপর ভিত্তি করে

সার্ত্র্ তাঁর নাটক রচনা করেছেন। ওরিস্টিস দীর্ঘকাল পরে দেশে ফিরে এসেছে। ঈগিসথাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মা ক্লাইটেমনেস্ট্রা যে পিতা অ্যাগামেমননকে হত্যা করেছে তার জন্য প্রতিশোধের সঙ্কল্প সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বোন ইলেক্ট্রা প্রতিহিংসা জাগিয়ে তুলল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজের মা এবং তাঁর প্রণয়ী ঈগিসথাসকে হত্যা করে বোনকে নিয়ে সে পালিয়ে গেল অ্যাপোলোর মন্দিরে। মাতৃহত্যার অনু-শোচনায় ইলেক্ট্রা অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ল, জুপিটারের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে ফিরে পেতে চাইল মনের শান্তি। কিন্তু ওরিস্টিস নিজের কাজের সকল দায়িত্ব স্বীকার করে নিল, দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না। সে তার বন্ধুকে নিয়ে শহর ত্যাগ করে চলে গেল।

প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে এই নাটক অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ একে তৎকালীন ফ্রান্সের রূপক হিসাবে গ্রহণ করল। ওরিস্টিস হল ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিভূ ; প্রথমে শত্রু প্রতিরোধের ব্যাপারে তারা নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ ছিল। কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছে যে নাৎসীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে প্রত্যেকের চারিত্রিক ক্রটিগুলি আগে দূর করতে হবে।

এই রূপকটি খুব সময়োপযোগী হওয়ায় ফরাসী দর্শক ও পাঠকদের মধ্যে এর আবেদন গভীর হয়েছিল। নাৎসী বিধি-নিষেধের ভয় না করে এমন নাটক রচনার জন্য তিনি অভিনন্দন লাভ করেছিলেন ; এবং সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেও এই নাটকটি সার্ত্র্কে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে।

১৯৪৪ সালে একাঙ্ক নাটক Huis Clos বা No Exit প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লবী নেতা গারসঁা এবং এস্তেল ও ইনেস নামে দু'টি মেয়ে মৃত্যুর পরে নরকে এসেছে। হোটেলের একটি ঘরই তাদের নরক। বেঁচে থাকতে তারা যত অন্যায় করেছে তার জন্য নরকে কি কঠোর শাস্তি পাবে তার অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর কোনো শাস্তি হল না। তারা প্রত্যেকেই অন্য দু'জনের দুষ্কৃতির কথা সব জানে,—কিছুই গোপন নেই। কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, অথচ অনন্তকাল ধরে তাদের পাশাপাশি বসে কাটাতে হবে। এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নরকেও আর কিছু হতে পারে না। আত্মহত্যা করে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার উপায় নেই, কারণ একবার তো মৃত্যু হয়েই গেছে।

সার্ত্র্-এর সবচেয়ে বড় সাহিত্য-কীর্তি Les Chemins de la Liberté বা The Roads to Freedom উপন্যাসমালা। এ পর্যন্ত তিন খণ্ড বেরিয়েছে। প্রথম খণ্ড The Age of Reason বেরিয়েছে ১৯৪৫ সালে। স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের পটভূমিকায় প্যারিসের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশের জীবনের কাহিনী এই খণ্ডে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড The Reprieve ও ঐ বছরই প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আট দিনের ঘটনা এই খণ্ডে বলা হয়েছে। মিউনিক কনফারেন্সের পটভূমিকায় কাহিনী রচিত। যুদ্ধের আশঙ্কায় ফ্রান্স উপযুক্ত নাগরিকদের সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আহ্বান করেছে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে এর প্রতিক্রিয়া কি ভাবে দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাবে। তৃতীয় খণ্ড Troubled Sleep বেরিয়েছে চার বছর পরে। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের সময়কার পটভূমিকায় এই খণ্ডের কাহিনী বলা হয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক মাতিয়া দেলারয়ে একজন অধ্যাপক। সে ফরাসী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাকে কেন্দ্র করে মার্সেল, লোলা, বোরিস, দানিয়েল, গোমেজ প্রভৃতি বহু নারী ও পুরুষ চরিত্র ফুটে উঠেছে। সার্ত্র্ এই কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অস্তিত্ববাদের তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছেন।

সার্ত্র্-এর 'দি চিপস্ আর ডাউন' (১৯৪৭) নাটকের কাহিনী ফিল্মে রূপান্তরিত হওয়ায় অনেকের নিকট সুপরিচিত। সমালোচনা সাহিত্যে সার্ত্র্-এর উল্লেখযোগ্য দান 'বোদ্‌লেয়ার' (১৯৪৭)।

যুদ্ধ শেষ হবার পর সার্ত্র্-এর রচনাবলী বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সর্বত্র ফ্রান্সের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নবীন লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি নাৎসী শক্তি প্রতিরোধ করেছেন—এটাও খ্যাতির একটি অন্যতম কারণ ছিল। সার্ত্র্ কম্যুনিস্ট বিরোধী বলে আমেরিকায় প্রথমে তাঁর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মনে করে তাঁর সম্বন্ধে আমেরিকার আগ্রহ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

সার্ত্র্-এর রচনা দু'টি বিশেষ গুণের দ্বারা চিহ্নিত। প্রথম তাঁর অস্তিত্ববাদ; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং স্বাধীনতা প্রীতি। এই দু'টি বৈশিষ্ট্যেরই বর্তমানে বিশেষ মূল্য আছে। আধুনিক নাগরিক কতকগুলি

মিথ্যা মতবাদের মোহে নিজের প্রকৃত কর্তব্য ভুলে আছে। এই কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য অস্তিত্ববাদী সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে 'সাহিত্য কী' গ্রন্থে সার্তর্ বলেছেন, 'The freedom to write presupposes the freedom of the citizen. One does not write for slaves. Prose-writing is bound up in solidarity with the only regime in which prose retains a meaning: democracy ..'

আলবেয়ার কামু

১৯১৩—

সাহিত্যের পুরস্কার সাধারণত তাঁদেরই দেওয়া হয় যাঁদের রচনা স্থিতি ও পরিণতি লাভ করেছে। যে-সব লেখকের আঙ্গিক ও বক্তব্য একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতি লাভ করেছে এবং যাঁদের রচনাধারায় নতুন বাঁক সৃষ্টির আর আশা নেই, পুরস্কার দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করি এবং বিদায় দিই। আলবেয়ার কামু এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তিনি যে অল্প বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেটাই বড় কথা নয়; তাঁর রচনা এখনো পরিণত রূপ লাভ না করা সত্ত্বেও যে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হল সেটাই আশার কথা। কামুর সাহিত্য সাধনার ধারা গত বিশ বছর ধরে যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, তাঁর মন ও লেখনী দুই-ই সৃষ্টিশীল, সর্বদা নতুন পথে চলবার জন্য উৎসুক। এ পর্যন্ত কামুর সাহিত্য-কৃতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, সুপরিণতির শিখরে স্থিতিলাভ করতে এখনো তাঁর বিলম্ব আছে। ফরাসী সাহিত্যেও এ জন্য তাঁর কোনো তর্কাতীত স্থান নির্দিষ্ট হয়নি। পুরস্কারের সংবাদ পেয়ে কামু নিজেই বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার ধারণা ছিল যাঁরা জীবনের সাধনা সম্পূর্ণ করেছেন অথবা যাঁরা বয়সে প্রবীণ, এ পুরস্কার শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।' তাঁর মতে এ পুরস্কার পাবার যোগ্যতম ফরাসী লেখক হলেন আঁদ্রে মালরু।

অবশ্য অপূর্ণতা সৃষ্টিশীলতার একটি প্রধান লক্ষণ। সকল শিল্পীর পক্ষেই এটা সত্য। কিন্তু কামুর পক্ষে এর সত্যতা আরো বেশি। কারণ তিনি নিছক গল্পকার নন; তাঁর উপন্যাসে কাহিনী অপ্রধান। তিনি দর্শনভিত্তিক উপন্যাস লেখেন নি; জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ চিন্তাধারাকে কাহিনীর রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কামু তাঁর জীবনদর্শন অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে অর্জন করেছেন। সুতরাং জীবনের পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নতুন কোণ লাভ করেছে এবং এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। যাঁরা মূলত গল্পকার তাঁদের চিন্তাধারার পরিবর্তনটা গল্পরসের

প্রাচুর্যে চাপা পড়ে যায়। কামুর রচনায় গল্পের তেমন কোনো আড়াল নেই। তাই তাঁর চিন্তা ও রচনার ক্রমবিবর্তন পাঠকের নিকট সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য এবং মারাত্মক রোগের আক্রমণ কামুকে গভীর নিরাশাবাদী করেছিল। পৃথিবীকে তখন তাঁর মনে হয়েছিল নির্দয় সংগ্রামশালা। নিরস্ত্র মানুষ এই সংগ্রামশালায় চারদিক থেকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হয়। আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবন; এ ছাড়া জীবনের অন্য কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যখন তিনি একটু স্বস্তি লাভ করলেন, তখন তাঁর চোখে সংসারের অকারণ নির্দয়তার কঠোরতা অনেকটা কোমল হয়েছে দেখতে পাই। নোবেল পুরস্কার যে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিষ্ঠা দেবে তার ফলে কামুর জীবনদর্শন প্রভাবান্বিত হবে বলে আশা করা যায়। দারিদ্র্য, মৃত্যুর আশঙ্কা এবং যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে চিন্তাধারার জন্ম, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর অ্যালজিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে আলবেয়ার কামুর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষিক্ষেত্রের কর্মী। মা ছিলেন স্পেনের মেয়ে। অন্যের খামারে কাজ করে উপার্জন হত সামান্য। সুতরাং দারিদ্র্যের মধ্যে কামুর জীবন শুরু হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে বাবার মৃত্যু হওয়ায় সমগ্র পরিবার একান্তরূপে অসহায় হয়ে পড়ে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কামু নিজের চেষ্টায় ১৯৩৬ সালে অ্যালজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দর্শন ছিল তাঁর বিশেষ পাঠ্য বিষয়। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জাঁ গ্রেনিয়ার-এর নিকট থেকে কামু যে প্রেরণা লাভ করেছেন এখনো কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি সে কথা স্মরণ করেন। কামু তাঁর জীবনে দু'জনের প্রভাব বিশেষরূপে স্বীকার করেন: একজন এই অধ্যাপক, আর একজন আঁদ্রে মালরো।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কামু অ্যালজিয়ার্স শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ওখানে নবনাট্য আন্দোলনের সংগঠনে। তিনি একটি থিয়েটারের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং মালরো, জিদ, সিঞ্জ, দস্তয়েভস্কি, বেন জনসন প্রভৃতির নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। অভিনয় করবার জন্য তাঁকে অনেক নাটক অনুবাদ করতে হয়েছে। এ-সব অনুবাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ঈস্কাইলাসের 'প্রমিথিউস'-এর যুগোপযোগী ফরাসী সংস্করণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে কামু সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকা থেকে য়ুরোপ

ভ্রমণ করতে আসেন। মধ্য য়ুরোপ, ইতালী ও ফ্রান্স ভ্রমণ করে অ্যালজিরিয়ায় ফিরে এসে তিনি যোগ দেন Alger Republicain কাগজের দপ্তরে। ১৯৪০ সালে কামু Paris-Soir-এর সম্পাদকীয় দপ্তরে চাকরি পেয়ে ফ্রান্স চলে আসেন। কিন্তু সে বছর জুন মাসে জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের পরাজয় হওয়ায় তাঁকে অ্যালজিরিয়ায় ফিরে আসতে হয়। এবার তিনি ছোট একটা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। স্কুলের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে কামু সাহিত্য-চর্চার সুযোগ পেলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম দু'টি বই এ সময় রচিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের বিপদের দিনে দূরে থেকে কামু শান্তি পাচ্ছিলেন না। ১৯৪২ সালে তিনি প্যারিস এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। প্রতিরোধ আন্দোলনের বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি Combat নামে একটি কাগজ বের করলেন। ভিচি সরকার ও জার্মান সেন্সরের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে কাগজ বের করতে হত। কামুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মুক্তিকামী ফরাসীদের উদ্দীপ্ত করে তুলত। তিনি যে শুধু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন, তাই নয়; কাগজ প্রকাশের সকল দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। জীবন বিপন্ন করে পথে পথে কাগজ ফেরি করতেও তাঁকে দেখা গেছে। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবার ফলে কয়েক বছর কামুর জীবন কেটেছে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে। বছরখানেক তিনি কম্যুনিস্টদের সমর্থক ছিলেন। ক্রমশঃ তাঁর মত বদলে যায়। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের সমালোচনা করায় অনেক সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। কামু সকল প্রকার একনায়কত্বের ঘোর বিরোধী।

কামু সাংবাদিকতা একেবারে ত্যাগ করেননি। একটি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত আছেন। কামু নাটক রচনা করেছেন চারখানি। ফ্রান্সের বাইরে তাঁর নাটক সামান্যই পরিচিতি লাভ করেছে। তথাপি কামু বলেন, থিয়েটারেই তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান; ভবিষ্যতে আবার নাটক পরিচালনা আরম্ভ করবেন বলে ভাবছেন। কামু একটি বড় উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি মানুষের জীবন কি ভাবে কেটেছে, এই কাহিনীতে তা বর্ণনা করা হবে। কাহিনীর পটভূমিকা অ্যালজিরিয়া। বলা বাহুল্য, এটি হবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

কামুর প্রথম বই কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন। এর পরে

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় Noces বা বিবাহ : এক নবযুবকের রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা অ্যালজিরিয়ার জীবনের রেখাচিত্র। লেখকের সৌন্দর্যপিপাসু আনন্দোজ্জ্বল মনের স্বাক্ষর এ বইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট। এক জায়গায় তিনি বলছেন : 'Except the sun, kisses and wild perfumes all seems futile to us' নারীর স্পর্শে যে আশ্চর্য সুখানুভূতি জাগ্রত হয় তাকেও তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। কারণ তরুণ লেখক সেদিন বিশ্বাস করতেন যে, যে আনন্দ প্রকৃত, তা কোন্ পথ দিয়ে এসেছে সে কথা ভেবে সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই।

একজন তরুণ ফরাসী লেখকের কাছ থেকে এরূপ রোমান্টিক ও নিবিড় জীবনানন্দময় রচনা আশা করাই স্বাভাবিক। কামু এই প্রত্যাশিত পথেই সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন বছর পরে লেখক হিসাবে কামুর যে নতুন পরিচয় পাওয়া গেল তা বিস্ময়কর। সেই রোমান্টিক ভাববিলাস, নারীর প্রতি আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের প্রতি মোহ তাঁর রচনা থেকে যেন অকস্মাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। উর্বর ভূমির স্নিগ্ধতা থেকে পাঠক অতর্কিতে এসে পড়ে নিষ্ঠুর মরুভূমির বুকে। এই পার্থক্য শুধু লেখকের মানসিক বিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায় না। তিন বৎসর পরে একেবারে নবজন্ম লাভ করেছেন লেখক। এই নবজন্মের সূচনা দেখতে পাই ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর দু'টি বই থেকে। একটি উপন্যাস, আর একটি দার্শনিক প্রবন্ধের বই। দু'টি একই সময়ের রচনা।

L'E´tranger (ব্রিটিশ অনুবাদ : দি আউটসাইডার; আমেরিকান অনুবাদ : দি স্ট্রেঞ্জার) যুদ্ধোত্তর ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট উপন্যাস বলে অনেকে মনে করেন। যুদ্ধের সংঘাতে বুদ্ধিজীবী নাগরিকের মনের চিন্তাধারা কোন পথে চলেছিল এই উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 'দি স্ট্রেঞ্জার' পড়ে য়ুরোপ-আমেরিকার সমালোচকদের দৃষ্টি কামুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ছোট উপন্যাসটিতে কাফকা ও হেমিংওয়ের প্রভাব পড়েছে। তথাপি লেখকের বৈশিষ্ট্য পাঠককে স্বীকার করতেই হবে। লেখকের জীবন-দর্শন এবং তাঁর বাহুল্যবর্জিত সাবলীল ও ইঙ্গিতসমৃদ্ধ ভাষা এই কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ।

উপন্যাসের নায়ক মারসো অ্যালজিয়ার্সের এক সওদাগরী আপিসের সামান্য কেরাণী। তার একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলি এক রকম কেটে যায়। বৈচিত্র্যহীন

জীবনের প্রধান ঘটনা মা'র মৃত্যু। কিন্তু মারসোর কাছে এটা একান্তই বাইরের ঘটনা। মা'র মৃত্যু তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল না, কিংবা কথা ও ব্যবহারে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল না। মৃত্যুর বছর তিনেক পূর্বে মা'কে সে একটা আশ্রমে এনে রেখেছিল। কারণ মাতা-পুত্রের মধ্যে সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল; নতুন কিছু বলবার নেই, তবু এক বাড়িতে থাকবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে সে চায়নি। মা'কে কবর দেবার পর দিন তার পরিচয় হল মারি নামে একটি তরুণীর সঙ্গে; সারাটা দিন ও রাত্রি কাটল তারই সাহচর্যে। পরের সপ্তাহে মারি জিজ্ঞাসা করল, সে তাকে ভালোবাসে কি না; মারসো মনে মনে হেসে উঠল, ভালোবাসা আবার কী! কিন্তু সে মারিকে বিয়ে করতে সম্মত হল। এই সম্মতির মধ্যে ছিল তাচ্ছিল্যবোধ। যেন বিয়ে করা আর না-করায় কিছুই এসে যায় না।

সেদিন মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য, পায়ের নীচে উত্তপ্ত বালি। কয়েকজন আরবের সঙ্গে কলহ বাধল। হঠাৎ মারসো একজন আরবকে হত্যা করল পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে। কেন এমন কাজ করল সে সম্বন্ধে মারসো নিজেই সচেতন নয়। হয়ত উত্তপ্ত আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া, কিংবা আরবের হাতে দেখেছিল ছোরার ঝলকানি, অথবা নিজের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে ছিল চরম ঔদাসীন্য। গ্রেপ্তার করবার পর পুলিস তার অতীত জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করল। দেখা গেল মারসোর সামাজিক জীবন বলে কিছু ছিল না। বন্ধুত্ব, প্রেম, আতিথেয়তা, আবেগ ইত্যাদির প্রমাণ নেই তার জীবনে। মা'র মৃত্যুতেও যে সে শোক প্রকাশ করেনি এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়ালো। তাকে যখন প্রশ্ন করা হল সে মা'কে ভালোবাসত কি না, তখন সে উত্তর দিল হাঁ, অন্য সকলের মতোই ভালোবাসতাম। কর্ডেলিয়ার উত্তরে যেমন লিয়র সন্তুষ্ট হয়নি, তেমনি বিচারকও মারসোর উত্তরকে-যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারলেন না। পূর্ব-পরিকল্পিত নরহত্যার অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পাদ্রি যখন জেলে তাকে শান্তির বাণী শোনাতে এল তখন মারসোকে সর্বপ্রথম উত্তেজিত হতে দেখি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে পাদ্রিকে জানিয়ে দিল, ধর্মের পথে প্রচলিত উপায়ে শান্তি পাওয়া যায় এ বিশ্বাস তার নেই। তার কাছে বর্তমান জীবনটাই একমাত্র সত্য; ঈশ্বর ও জন্মান্তর নিয়ে সে একটুও ভাবে না।

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই লেখকের বক্তব্যের ইঙ্গিতটা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীতে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত আগন্তুকের মতো কয়েক-দিনের জন্য বাস করতে আসে। তার নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারের রীতি-নীতির কোনো মিল নেই। তাই মারসোর কাছে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, হৃদয়াবেগের প্রকাশ ইত্যাদি অর্থহীন বলে মনে হয়। কামুর নায়ক আদর্শ চরিত্রের লোক নয়; কিন্তু তিনি কাহিনীর বিন্যাস এমন কৌশলের সঙ্গে করেছেন যে পাঠকের সকল সহানুভূতি মারসোর উপরে পড়বে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরূপতাকে প্রাধান্য দিয়ে কামু ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছেন। এই ট্র্যাজেডির জন্য মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দায়িত্ব বেশি।

কামুর নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সব এক চিন্তাসূত্রে গাঁথা। সুতরাং তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য উপলব্ধি করতে হলে দার্শনিক প্রবন্ধও বিচার করতে হয়। 'দি স্ট্রেঞ্জারের' সমকালীন The Myth of Sisyphus থেকে কামুর জীবন-দর্শন উপলব্ধি করা যাবে। গ্রীক পুরাণে সিসিফাসের কাহিনী আছে। করিন্থের রাজা সিসিফাস দেবতার অভিশাপে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তোলে; চূড়ার কাছে গিয়ে প্রস্তরখণ্ড আবার গড়িয়ে নামতে শুরু করে, আর সিসিফাস তাকে ধরে রাখবার জন্য পিছনে পিছনে ছোটে। দিবারাত্রি অবিশ্রাম প্রস্তরখণ্ড ঠেলে উপরে তোলা এবং আবার পিছনে ছুটে নামা হল সিসিফাসের একমাত্র কাজ।

সিসিফাসের মতো মানুষের ভাগ্যেও আছে অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস। ঠুলিবাঁধা বলদের মতো একই বৃত্তে ঘুরে মরাই আমাদের ললাটলিপি। 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং 'দি মিথ অব সিসিফাস' মানুষের এই নির্দয় ভাগ্যের উপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরূপ গভীর নিরাশাবাদ কামু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে; প্রথম জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মূলত জীবন-প্রেমিক। Noces তার প্রমাণ। কিন্তু অবচেতন মনে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর ডাক্তারের একটি কথায় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। অকস্মাৎ জানতে পারলেন, তিনি যক্ষ্মারোগী, মৃত্যু হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। অল্পদিন পরে আরম্ভ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে এবং

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যা কিছু সত্য ও মহৎ বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তা মিথ্যা হয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, যাকে আমরা সত্য ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিশ্বাস করি বাস্তব জীবনে তার কোনো মূল্য নেই। এক অন্ধশক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আদর্শ জীবনযাপন করেও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে বা নালিশ জানালে অনন্ত নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে তা ফিরে আসে। মানুষ চার দিকের অসম্ভবের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী। আমাদের জীবন যে-সব বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে তারা অসম্ভব এবং অদ্ভুত। বাধাগুলি অযৌক্তিক, সুতরাং যুক্তিবান মানুষ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে কোনো ফলের আশা করতে পারে না। একমাত্র বেঁচে থাকবার অনুভূতিটাই মানুষের জীবন। তাই অস্তিত্ববাদীরা বলেন: 'We and things in general exit, and that is all there is to this absurd business called life.'

এই উক্তির মধ্যে যে নিষ্ক্রিয়তা আছে, কামু তা সমর্থন করেন না। 'অ্যাবসার্ডের' সঙ্গে সংগ্রাম করে কোনো ফল নেই, এ কথা নিশ্চিত জেনেও আমরা নিরন্তর লড়াই করে যাব। নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ তাঁর মন। জয়ের আশা নেই, তবু 'অ্যাবসার্ডের' বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম করবার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই সংগ্রামই মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

শুভ প্রচেষ্টার সকল পথ রুদ্ধ দেখে আত্মহত্যার প্রতি মন ঝুঁকতে পারে। কামুর সিসিফাস প্রবন্ধ এই আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আত্মহত্যার প্রশ্ন তিনি বাতিল করে দিয়েছেন এই জন্য যে, মানুষ যদি জীবন-বিদ্বেষী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে 'অ্যাবসার্ডের' বাধা আরো শক্তি লাভ করবে। সুতরাং আত্মহত্যা নয়, বিদ্রোহ ঘোষণা হল 'অ্যাবসার্ডের' যোগ্য প্রত্যুত্তর। কামুর মতে শিল্পী ও দার্শনিকের বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। কারণ তাঁরা সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে যতটা নিস্পৃহ এমন আর কেউ নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থে তাঁরা বিদ্রোহের দোহাই দিয়ে অকল্যাণ ডেকে আনবেন না। ফলের আশা না করে শুধুই কাজ করে যাবার আদর্শ কামু তাঁর নিজের জীবনেও অনুসরণ করেছেন। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি কর্তব্য থেকে অবসর গ্রহণ করেননি। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে যা কল্যাণকর বলে ভেবেছেন, প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন।

কামুর পরবর্তী উপন্যাস 'দি প্লেগ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এই উপন্যাসে তাঁর স্বকীয়তা অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং শিল্পকলাও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যে 'দি প্লেগ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে এই বইয়ের প্রায় সওয়া লক্ষ কপি বিক্রি হয়। কামুর অন্য কোনো রচনা এরূপ জনপ্রিয় হয়নি।

অ্যালজিরিয়ার বন্দর ওরাঁ; এই শহরের অন্যতম চিকিৎসক ডাক্তার বেরনার রিয়ো হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ইঁদুরের মড়ক শুরু হয়েছে। তাঁর বাড়ির সিঁড়িতেও মরা ইঁদুর দেখতে পেলেন। প্রথম কিছুই সন্দেহ হয়নি। কিন্তু বাড়ির দারোয়ানের মৃত্যুর পর অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝতে পারলেন শহরে প্লেগ আরম্ভ হয়েছে। শহরের কর্তৃপক্ষ প্রথম প্লেগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্যারিস থেকে নির্দেশ আসায় শহর থেকে কারো বাইরে যাওয়া বা ভিতরে আসা নিষিদ্ধ হল। ডাক্তার রিয়োর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়ে আরম্ভ হল শহর পরিষ্কার ও মৃতদেহ সংকারের কাজ। ডাক্তার রিয়ো হাসপাতালে প্লেগ রোগীদের চিকিৎসা করেন। প্যারিস থেকে যে সিরাম এসেছে তা মোটেই ফলপ্রদ নয়। কোনো ফল হবে না জেনেও ডাক্তার নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য করে যান। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এই ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে আমরা পাই তারো, র‍্যাঁবার, পাদ্রি প্যানেলো প্রভৃতি কতকগুলি উজ্জ্বল পার্শ্বচরিত্র। র‍্যাঁবার প্যারিসের সাংবাদিক; এই শহরে এসেছিল রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। কোয়েরাণ্টাইন জারী হবার পর পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কিন্তু প্লেগ প্রতিরোধে নাগরিকদের উদ্যোগ দেখে সে মুগ্ধ হল। যোগ দিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। প্লেগ আরম্ভ হবার পর পাদ্রি প্যানেলো নাগরিকদের বলেছিলেন যে, তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে ভগবান প্লেগ পাঠিয়েছেন। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ নিরাপরাধ বালককে প্লেগে মরতে দেখে ভগবানের বিচারের উপর তাঁর আস্থা রইল না। অথচ এতদিনের বিশ্বাসকে অস্বীকার করবার মতো মনের বলও নেই। প্যানেলো শোচনীয় মানসিক অবস্থায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। আর একটি অদ্ভুত চরিত্র পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। সে সামান্য কেরাণী গ্রাঁ। অনেক বছর ধরে কাজ করছে, তবু তার পদোন্নতি হয়নি। স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে গেছে। আপিস থেকে ফিরে সে তার কল্পিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে

বসে। শুধু প্রথম বাক্যটি লেখা হয়েছে। বছরের পর বছর প্রত্যহ সেই একটি বাক্যই সে নতুন করে লেখে, তার বেশি অগ্রসর হতে পারে না।

আট মাস পরে প্লেগ থেমে গেল। ডাক্তার রিয়োর অনেক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এতদিন ভোগ করতে হয়েছে অনেক দুঃখ ও গ্লানি। এখন রোগমুক্ত শহরের রাজপথে স্বাভাবিক জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে তিনি তৃপ্তি অনুভব করলেন। কোনো ফলের কথা না ভেবে একান্ত নিরাসক্ত চিত্তে তিনি সংগ্রাম করেছেন মহামারীর বিরুদ্ধে। এক উদ্দেশ্যের অনেক সাধকের সঙ্গে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সেটাই তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে হল। বিপদে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার উপযোগিতা উপলব্ধি করলেন তিনি। ডাক্তার রিয়ো ধর্ম ও পুঁথিগত আদর্শবাদ ত্যাগ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নিস্পৃহ মানব-প্রীতিকে 'পেসিমিস্টিক হিউম্যানিজম' বলা যেতে পারে।

মারসো একাকী, সে 'আউটসাইডার' ; সিসিফাসেরও সঙ্গী নেই। ডাক্তার রিয়ো একা নন ; তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে সহযোগিতা ও সমাজবোধ। কাজ শেষ হবার পর ডাক্তার তৃপ্তিলাভ করেছেন, তাও কাহিনীর মধ্যে দেখতে পাই। মারসো বা সিসিফাসের মতো তাঁর জীবন ব্যর্থ নয়। তাঁর সহকর্মী তারো পাঠকদের আশার বাণী শুনিয়েছে। সঙ্কটের দিনে কি হারিয়েছে, কি হতে পারত, তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই ; যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই নতুন করে জীবন শুরু হোক। 'বিগিনিং এগেন ফ্রম জিরো' —এই হল তারোর স্লোগান। 'দি স্ট্রেঞ্জার' ও 'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ আমরা নিঃসঙ্গ নিরস্ত্র মানুষকে পৃথিবীর সংগ্রামশালার সম্মুখীন হতে দেখি। 'দি প্লেগ'-ও সংগ্রামের কাহিনী ; কিন্তু নিঃসঙ্গ আশাহীন সংগ্রামের কাহিনী নয়। কামু তাঁর সক্রিয় নিরাশাবাদ থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগের অভিজ্ঞতা থেকেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

এই উপন্যাসে কামু প্লেগের যেরূপ সূক্ষ্ম বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, তার একমাত্র তুলনা পাওয়া যায় ডিফোর Journal of the Plague Year-এ। এই বাস্তব বর্ণনার পশ্চাতে আছে একটি রূপক। প্লেগে আক্রান্ত ওরাঁ হল হিটলারের মতো কোনো স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতির দ্বারা উৎপীড়িত একটি দেশের প্রতীক। শুভবুদ্ধি প্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার

সাহায্যে সেই উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা যেতে পারে, এই আশার মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধের কিছুকাল পরে এরূপ একটি প্রতীকী উপন্যাস য়ুরোপে সহজেই আশাতিরিক্ত সমাদর লাভ করতে পেরেছিল।

'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ কামু আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থ 'দি রিবেল' (১৯৫১)-এ আত্মহত্যার প্রশ্ন নেই, আছে বেঁচে থাকবার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করবার উপায় নির্ধারণের আলোচনা। প্রধান উপায় প্রচলিত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। গত দু'শ বছর ধরে য়ুরোপে যে-সব রাজনৈতিক ও চিন্তা বিপ্লব ঘটেছে কামু তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। কামু বলেন, 'We are living in the era of premeditation and perfect crimes.' তিনি দেখিয়েছেন, ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে স্তালিনের আমল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দার্শনিকদের চিন্তাসম্পদের অপব্যবহার করেছেন। একজন ক্ষমতাশালী নেতার ব্যক্তিগত লোভ ও অপরাধপ্রবৃত্তি যে বিদ্রোহের মূলে থাকে, সে বিদ্রোহ সমাজের মঙ্গল করতে পারে না। বিদ্রোহ কেন করব সে সম্বন্ধে কামুর অভিমত এই : 'We all carry within us our places of exile, our crimes and ravages. But our task is not to unleash them on the world ; it is to fight in ourselves and in others."

কামুর পরবর্তী উপন্যাসের নাম 'দি ফল'। এই বই তাঁর সাহিত্য-সাধনায় সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে। প্রচলিত অর্থে একে উপন্যাস বলা যায় না। ঘটনা নেই, প্রেম নেই, সংঘাত নেই, শুধু এক অনুতপ্ত হৃদয়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট সুদীর্ঘ 'মনোলগ'। প্যারিসের খ্যাতিমান আইন ব্যবসায়ী জঁা-ব্যাপ্তিস্তে ক্ল্যামেন্স সমাজে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল। লোকে তাকে উদারহৃদয়, রুচিবান নাগরিক বলে যে সম্মান করে তা সে জানে, এবং জেনে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু দু'টি ঘটনায় তার আত্মপ্রসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একদিন রাস্তায় সামান্য কারণে কে একজন তাকে 'গাধা' বলে গালি দিল। সেই মুহূর্তে ক্ল্যামেন্স উপলব্ধি করল তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব একান্তই মিথ্যা। আর একদিন এক তরুণী পুলের উপর থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছে জেনেও সে তাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে গেল না, দ্রুত বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু এর পর থেকে শুরু হল তার বিবেকের দংশন।

তরুণীর জীবন সে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু করেনি। সুতরাং সে প্রায় হত্যার অপরাধে অপরাধী। নিজের মন বিশ্লেষণ করে সে দেখল তার পরোপকার-বৃত্তির গৌরব এতদিন নিছক ফাঁকির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। আত্মপ্রেমের বশবর্তী হয়েই সে এতদিন সকল কাজ করেছে,—সেবা, পরোপকার সব মিথ্যা। এই উপলব্ধি তাকে জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ করল। সে লোভনীয় আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিবেকের যন্ত্রণার কাহিনী সে শ্রোতা পেলেই শোনায়। লেখকের আশ্চর্য রচনা কৌশলের গুণে তার বিবেক-দংশনের জ্বালা পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়। আমরা প্রত্যেকেই তো বিবেকের নির্দেশ অমান্য করবার অপরাধে অপরাধী! সুতরাং ক্ল্যামেন্সের বিবেক-জ্বালার যন্ত্রণা আমাদেরও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী কামুর রচনাবলীতে মানুষ অপ্রধান; জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলির প্রাধান্য দেখতে পাই। মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ সে নিজে তত নয়, যত বাইরের পরিবেশ ও ভাগ্যের অন্ধ বিরূপ শক্তি। এই উপন্যাসে কামু সর্বপ্রথম মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছেন। ক্ল্যামেন্সের যে বেদনা তার জন্য অন্য কেউ বা অন্য কিছু দায়ী নয়; দায়ী সে নিজে। ক্ল্যামেন্সের চরিত্র কামু যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা পর্যালোচনা করলে মালর-এর এই উক্তিটি স্বভাবতই মনে পড়ে যায়: 'A man is the sum of his acts, of what he has done and of what he can do—nothing else.'

মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কামুর সাহিত্য নতুন পথে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তাঁর সাহিত্যের পরিণত রূপ লাভ করবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে। সুইডিশ সাহিত্য আকাদামি 'দি ফল' এবং তাঁর গল্প সংগ্রহ 'The Exile and the Kingdom'-এর মধ্যে মহৎ সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছেন। 'দি ফল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে কামুর রচনাধারায় নতুন বাঁক সৃষ্টি হয়েছে তা স্বীকার করে তাঁরা বলেছেন: 'Camus has left nihilism far behind him and existentialism can reasonably be called a form of humanism.'

কিন্তু এই উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেও তো কামুর লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তার কারণ কি?

প্রধান কারণ তাঁর জীবনদর্শনের আকর্ষণ। বিশেষ করে যুবচিত্তে এই জীবনদর্শনের আবেদন গভীর হওয়া স্বাভাবিক। আদর্শবাদী তরুণ বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয়ে যখন ক্ষুব্ধ হয় তখন কামুর চিন্তাধারার মধ্যে সে নিজের

মনের প্রতিফলন দেখতে পায়। অবশ্য জীবন যে নিরর্থক সংগ্রামের দুঃখময় ইতিহাস, এটা কামুর মৌলিক চিন্তা নয়। অনেক লেখকই এ কথা বলেছেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল ইউনিটির কৌশল অবলম্বন করে কামু যেমন সুস্পষ্টরূপে জোরের সহিত বলতে পেরেছেন, এমন আর কেউ পারেন নি। কামুর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ নয়, তাদের এক একটি আইডিয়ার প্রতীক হিসাবে আনা হয়েছে। কোনো চরিত্রেরই সামগ্রিক পরিচয় পাই না, যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু তাদের দেখি। ভাষা প্রয়োগে, দৃশ্য বর্ণনায় এবং চরিত্র-চিত্রণে কামুর অসামান্য সংযম। তিনি লিখতে বসে কোথাও বক্তৃতা দিতে বসেন না, হা-হুতাশ নেই ; আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সঙ্গে তিনি কাহিনী বলে যান। রচনার এই সংযম ও বাহুল্যহীনতা পাঠকের মন গভীরভাবে অভিভূত করে।

একমাত্র তত্ত্ব দিয়ে মানুষের জীবনকে বিচার করতে গিয়ে কামু ভুলও করেছেন। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, স্নেহ-প্রীতি ইত্যাদি কামুর রচনায় মর্যাদা লাভ করেনি। অথচ এ-সব নিয়েই তো আমাদের জীবন।

আর একটি কারণে কামু জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। য়ুরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভের বিশ্লেষণ এবং সমাধানের ইঙ্গিত তাঁর রচনায় ওতপ্রোতভাবে ছড়ানো আছে। সুতরাং ভুক্তভোগীদের নিকট কামুর বই সমাদৃত হয়েছে। 'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে সুইডিশ আকাদামি কামুকে দেখেছেন 'as the world's foremost literary antagonist to totalitarianism.'

'দি ফল'-এর নায়কের যে বিবেক-দংশন তার মধ্যে যেন আমরা একালের মানুষের বিবেক-জ্বালার সামগ্রিক ছবি দেখতে পাই। তাঁকে পুরস্কার দেবার কারণ স্বরূপ নোবেল কমিটি তাই বলেছেন যে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে 'for his important literary production, which with clearsighted earnestness illuminated the problems of the human conscience in our times.'

গ্যা ব্রি য়ে লা মি স্ত্রা ল

১৮৮৯—১৯৫৭

সমসাময়িক নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের মতো উপেক্ষিত আর কেউ নন। বিশ্ব-সাহিত্যে যে-সব লেখক সামান্য একটু স্থান লাভ করেছেন তাঁদের বই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাবার এগারো বছর পরে একটি ছোট সঙ্কলন ছাড়া শ্রীমতী মিস্ত্রালের আর কোনো কাব্য-গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হয়নি। এমন কি, স্প্যানিশ কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ-সঞ্চয়নগুলিতে শ্রীমতী মিস্ত্রালের কবিতা পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষায় স্প্যানিশ সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা আছে তাদের মধ্যেও তাঁর নাম সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয় না। শ্রীমতী মিস্ত্রালের মূল রচনাবলীর কোনো প্রামাণিক সংগ্রহ এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাঁর অনেক রচনা আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। ১৯৫৭ সালের ১০ই জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের উপকণ্ঠে শ্রীমতী মিস্ত্রাল ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পরিবেশনেও উপেক্ষার ভাবটা সুস্পষ্ট। অনেক কাগজ আদৌ এ সংবাদ প্রকাশ করেনি। চিলির আর একজন কবি পাবলো নেরুদার নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত; অথচ নোবেল পুরস্কার পেয়েও মিস্ত্রালের কাব্য কেন উপেক্ষিত হয়ে রইল সে বিচার স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরাই করতে পারেন।

চিলির উত্তরাঞ্চলে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম লুসিলা গদয় আলকায়াগা (Lucila Godoy Alcayaga)। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মিস্ত্রালের বাবা ছিলেন গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক। শিক্ষকতা অপেক্ষা তাঁর কিন্তু বেশি আগ্রহ ছিল গান লেখার। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গানের প্রতিযোগিতা হত। মিস্ত্রালের বাবা বরাবরই ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগী। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে মেয়ে কাব্য-প্রতিভা লাভ করেছিলেন।

বাবা ও দিদির কাছে মিস্ত্রালের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর দিদিও ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি শিক্ষকতা বৃত্তির পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর মাত্র পনেরো বছর বয়সে চাকরি আরম্ভ করেন দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। কয়েক বছর যাবৎ পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তাঁকে চাকরি করতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছেন। তাঁর রচনায় এই অভিজ্ঞতার প্রভাব খুব গভীর।

গ্যাব্রিয়েলা তখন বিশ বছরের তরুণী। বাড়ি থেকে কিছু দূরে ছোট একটি গ্রাম্য স্কুলে চাকরি করেন। ওখানকার এক রেল-কর্মীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রোমেলিও উরেতা তার নাম। এই পরিচয় গভীর প্রেমে পরিণত হতে দেরী হল না। গ্যাব্রিয়েলা উরেতাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলেন। সন্তান-সন্ততিপূর্ণ সংসারের কল্পনা তাঁকে তন্ময় করেছে। কিন্তু উরেতা অকস্মাৎ অজ্ঞাত কারণে একদিন আত্মহত্যা করে সে স্বপ্ন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে দিল।

এই বেদনা থেকেই তাঁর প্রথম কবিতার জন্ম। কিন্তু আরো ছ'-সাত বছর পার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাব্য-চর্চার কথা কেউ জানতে পারেনি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চিলির লেখক সমিতি সান্টিয়াগোতে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। গ্যাব্রিয়েলা পাঠালেন তিনটি সনেট। সনেটগুলি মৃত্যুর উপরে রচিত। তাঁর প্রেমিকের মৃত্যু। তিনি গ্রামের মেয়ে। খুব লাজুক। শহরে নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ হল। তাছাড়া প্রথম দিকের রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার বেদনা এবং হৃদয়ের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এমন সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে গ্যাব্রিয়েলার নিজেরই আশঙ্কা হয়েছিল যে এর জন্য তাঁর চাকরির ক্ষতি হতে পারে। তাই তিনি আসল নাম গোপন করে ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। তাঁর দু'জন প্রিয় লেখকের নাম থেকে দু'টি অংশ নিয়ে ছদ্মনামটি তৈরী করেছেন। এ দু'জন হলেন ইতালীর কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক Gabriele D' Annunzio এবং ফ্রান্সের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি Frederic Mistral.

প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণার দিন সভায় খুব ভিড়। একদিকে প্রতিযোগী কবিদের আসন, অন্যদিকে উৎসুক জনতার সমাবেশ। গ্যাব্রিয়েলা জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর কবিতা পাঠ করে শোনাল অন্য

একজন। তিনিই প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এই ঘোষণার পরও গ্যাব্রিয়েলা সহজে নিজের পরিচয় দিতে পারেন নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে শ্রীমতী মিস্ত্রাল বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে পড়াতে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মেক্সিকো থেকে আমন্ত্রণ এল সেখানকার গ্রামের বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলি পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করবার জন্য। এ কাজ তিনি খুব সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।

দেশের লেখকদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে অন্য দেশে পাঠাবার রীতি আছে চিলি সরকারের। দু'বছর মেক্সিকোতে কাটাবার পর তিনি লীগ অব নেশন্‌সের ইন্‌স্টিট্যুট অব ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশানে চিলির প্রতিনিধি হয়ে আসেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রীমতী মিস্ত্রাল চিলির রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তাঁকে স্বদেশ থেকে বহু দূরে থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্যে একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে চিলির গভর্নমেণ্টে। মিস্ত্রালের উপর সকল দলেরই সমান শ্রদ্ধা। সুতরাং সরকারের পরিবর্তন হলেও তাঁর রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিস্ত্রাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কমিটির কাজে তিনি সহযোগিতা করেছেন।

কবিতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার পর থেকে মিস্ত্রাল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কয়েক বৎসর ধরে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন। চিলির কাব্য-রসিকদের মধ্যে সহজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হল। তাঁর আবৃত্তি শোনবার জন্য কাব্য-পাঠের আসরে শ্রোতাদের ভিড় হত। কিন্তু তবু মিস্ত্রালের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ সহজে প্রকাশ হয়নি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ সাহিত্যের অধ্যাপক ওনিস ক্লাশে প্রায়ই মিস্ত্রালের কবিতা আবৃত্তি করতেন। ছাত্ররা তাঁর কাব্য-সংগ্রহ পেতে চায়। কিন্তু মিস্ত্রালের কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করবার মতো সংগতি নেই। ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা তুলল। প্রধানতঃ সেই টাকার উপর নির্ভর করে মিস্ত্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ Desolacio´n ১৯২২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী বইয়ের নাম Tenura বা Tenderness. এটি বিশেষ করে ছেলেদের জন্য রচিত কবিতার সংগ্রহ। সর্বশেষ বই Tala বা Havoc প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর

নির্মম আধিপত্যের পটভূমিকায় রচিত কবিতাগুলিতে লেখিকা রাজনৈতিক একনায়কত্বকে আক্রমণ করেছেন। এখন পর্যন্ত মিস্ত্রালের বহু গদ্য ও পদ্য রচনা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

শ্রীমতী মিস্ত্রাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রভাবান্বিত করেছে। মিস্ত্রাল নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্প্যানিশ অনুবাদকের অনুরোধে তিনি অনূদিত কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় টীকা লিখে দিয়েছিলেন।

সুইডেনের কবি গুলবার্গ মিস্ত্রালের কবিতা সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৫ সালে মিস্ত্রাল নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় 'for her lyric poetry, which is inspired by powerful emotions and which has made her name a symbol of the idealistic aspirations of the entire Latin-American world.'

লাতিন-আমেরিকার সমকালীন সাহিত্যে য়ুরোপীয় লেখকদেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে মিস্ত্রালের রচনা কিন্তু নিয়ে এল এক নতুন জগতের পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। মিস্ত্রালের কবিতায় সর্বত্র গভীর মমতাবোধ পরিস্ফুট; কিন্তু সেই মমতা চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি। পাঠক কবির সরল, অকৃত্রিম ও সবল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য অনুভব করে তৃপ্তিলাভ করেন। মিস্ত্রালের রচনার পরিধি বিস্তৃত নয়; এবং আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর রচনা বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হবে. কিন্তু ছোট একটি বাদ্যযন্ত্রে যেমন সবগুলি সুর বাঁধা থাকে তেমনি তাঁর ছোট ছোট কবিতার মধ্যেও পাওয়া যাবে হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতির বিচিত্র সমাবেশ।

মিস্ত্রাল দুঃখের কবি। তিনি বলতেন, জীবন মধুময় বলে যাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। ভাবী স্বামীর আত্মহত্যার ফলে প্রথম যৌবনেই তাঁর ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটেছিল। বিয়ে করবার কথা তিনি আর ভাবেন নি। কিন্তু তবু সন্তান ও গৃহ সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সারা জীবন তাড়না করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন অসঙ্কোচে। ব্যক্তিগত বেদনার নিরাবরণ প্রকাশকে অনেক সমালোচক বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সন্তানহীনা রমণীর বেদনার

কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে মিস্ত্রালের কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তিনি দুর্ভাগ্যপীড়িত গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মমত্ববোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত বেদনা যুক্ত হয়ে এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতাগুলিকে মর্মস্পর্শী করেছে।

প্রেমিকের মৃত্যু ছাড়া পরিবারের একজন প্রিয়পাত্রের আত্মহত্যার শোকও মিস্ত্রালকে সইতে হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর অত্যাচারের ফলে যে-সব বালক-বালিকা অনাথ হয়ে পড়েছিল, চিলি তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি গভীর বেদনা পেয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ Tala-র লভ্যাংশ এদের জন্যই উৎসর্গ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বেদনা তাঁকে জীবনবিমুখ করতে পারেনি। বরং যারা দুঃখ পেয়েছে তাদের প্রতি মাতৃসুলভ মমতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। মিস্ত্রালের রচনায় মাতৃত্বের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে।

মিস্ত্রাল যেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতি রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সেখানে তিনি মা। মাতৃত্বের আবেশে তিনি তন্ময়। নিজের বাইরে তাঁর নিকট প্রধান হয়ে উঠেছে সন্তান এবং শিশুর জগৎ। তাঁর কবিতা প্রধানতঃ সন্তান ও জননীর বিভিন্ন সম্পর্ক কেন্দ্র করে রচিত। মাতৃত্বানুভূতির যে আবেগময় বিচিত্র প্রকাশ মিস্ত্রালের কবিতায় দেখতে পাই তা অন্য কোনো কবির রচনায় আছে বলে জানি না। একটি দু'টি কবিতায় থাকতে পারে; কিন্তু মূলত এই একটি অনুভূতিকে কেন্দ্র করে কাব্য সাধনার এবং কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর নেই।

উরেতার মৃত্যুর পর মা হবার আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার আর্তনাদ তাঁর প্রথম রচিত কয়েকটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। Poem of the Son এ দিক থেকে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কবিতার প্রথম তিনটি পংক্তি এই :

'A son, a son, a son ! I wanted a son of yours
and mine, in those distant days of burning bliss
when my bones would tremble at your least murmur
and my brow would glow with a radiant mist.

I said *a son*, as a tree in spring
lifts its branches yearning toward the skies,

a son with innocent mien and anxious mouth,
and wondering, wide and Christ-like eyes.

His arms like a garland entwine around my neck,
the fertile river of my life is within him pent,
and from the depth of my being over all the hills
a sweet perfume spreads its gentle scent.'

আবার সন্তানধারণক্ষম যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে হতাশাকে মেনে নিতে মন রাজী হয় না :

'Oh, no ! How could God let the bud of my breasts go dry when
He himself so swelled my girth ?'

মিস্ত্রাল যৌনানুভূতির কবি নন। তাঁর কবিতায় নারীর প্রিয়ার রূপ কদাচিৎ দেখা যায় ; মাতৃত্বের রূপই সর্বত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। সন্তান ধারণ করে বলেই দেহের মূল্য। মাতৃত্বের স্পর্শে দেহ নতুন মর্যাদা লাভ করে :

'He kissed me and now I am someone else ; ...
... Now my belly is as noble as my heart.'

এরপরে কবির মধ্যে আর আক্ষেপের সুর পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে মায়ের স্থলাভিষিক্ত করে মাতৃত্বের বিভিন্ন রূপের ছবি এঁকেছেন। মা'র মনে সন্তানকে কেন্দ্র করে কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়! মিস্ত্রাল তাদের দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। জন্মের পূর্ব পর্যন্ত মা'র মনে কেবল ভাবনা সন্তান না জানি কেমন হবে। সন্তান জন্মাবার পরে তার লাবণ্য দেখে মায়ের হৃদয় মুগ্ধ। এতদিনে বোঝা গেল প্রকৃতি তাকে এমন করে প্রস্তুত করে তুলেছে কেন :

'Now I know why I have had twenty summer of sunshine on my
head and it was given me to gather flowers in the field.
Why, I once asked myself on the most beautiful of days,
this wonderful gift of warm sun and cool grass ?

Like the blue cluster, I took in light for the sweetness
I am to give forth. That which is deep within me comes
into being, drop by drop, from the wine of my veins.

সন্তানের মঙ্গল-কামনায় স্বামীর স্পর্শ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেও মা'র মনে দ্বিধা নেই :

'Husband, do not embrace me. You caused it to rise
from the
depths of me like a water lily. Let me be like still water.'

স্বামী এই ত্যাগের পুরস্কার পাবে। সন্তানের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ হবে :

'I, so small, will
duplicate you on all the highways. I, so poor, will give
you other eyes, other lips, through which you may
enjoy the
world ! I, so frail, will split myself asunder for love's
sake like a broken jar, that the wine of life might flow.'

চিলির সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের প্রবর্তনের কৃতিত্ব মিস্ত্রালের। তাঁর অলংকারভারমুক্ত বেগবান ভাষা, অকৃত্রিম অনুভূতির গভীরতা এবং আন্তরিক মানবতাবোধ পরবর্তী কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁর কাব্য উপদেশমূলক বলে আধুনিক কবিরা অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগ বিশেষ করে Tala ও তার পরে প্রকাশিত কবিতার বিরুদ্ধে। ইংরেজী অনুবাদের সংকীর্ণ পরিচয় থেকে মনে হয় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রাধান্যই তাঁর কাব্য-প্রচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে

উদ্ধৃত কাব্যাংশের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন Langston Hughes.

গা র থি য়া ল র কা

১৮৯৯—১৯৩৬

লরকার শোচনীয় মৃত্যুই তাঁর কবি-খ্যাতির প্রধান কারণ, কোনো কোনো সমালোচক এমন কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্য ও নাটকের নতুন নতুন ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে এই উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত করছে। হয়ত প্রথম প্রথম লরকার মৃত্যুর ঘটনা তাঁর কাব্যকে সাময়িক ভাবে পশ্চাতে ঠেলে রেখেছিল। কিন্তু আজ ক্রমশঃ লরকার ব্যক্তিগত জীবন ভুলে কাব্য-রসিক পাঠক তাঁর কাব্যকেই গ্রহণ করছেন। ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতরূপে, লরকার রচনা পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। তিনি যে আধুনিক স্প্যানিশ সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, এবং বিশেষ করে স্পেনের জনগণের প্রিয় কবি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

ফাদারিকো গারথিয়া লরকা (Federico Garcia Lorca) ১৮৯৯ সালের ৫ই জুন গ্রানাডা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে ছোট্ট শহর আন্দালুশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সম্পন্ন জোতদার। মা ছিলেন ও অঞ্চলের নামকরা পিয়ানো বাজিয়ে। লরকা মা'র কাছ থেকেই সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছেন। ছেলেবেলাটা সঙ্গীতের পরিবেশে কাটাবার সুযোগ পাওয়ায় পরবর্তী জীবনে লরকা স্পেনের একজন শ্রেষ্ঠ সুরকার হতে পেরেছিলেন।

ছেলেবেলায় লরকার স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। খেলাধূলায় যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাড়ির কাছাকাছি মাঠে মাঠে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, চাষী ও ভবঘুরে জিপসীদের মুখ থেকে শুনতেন উপকথা ও লোকসঙ্গীত; মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় ভাই-বোনদের সঙ্গে প্রচলিত লোকগাথাগুলি অভিনয় করতেন। দৈহিক পরিশ্রমে অপারগ ছিলেন বলেই লরকার নিকট স্বপ্নের জগৎ বড় হয়ে উঠল। কিন্তু সে স্বপ্ন শুধুই কল্পনাকে আশ্রয় করে নয়। স্পেনের পল্লী অঞ্চল থেকে মধ্যযুগের জীবন তখনো সম্পূর্ণরূপে বিদায় নেয়নি। ষাঁড়ের লড়াই, প্রেম ও প্রতিহিংসা, কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও খুন তখনো সাধারণ

জীবনের অঙ্গ ছিল। আর ছিল জিপসীদের রোমান্টিক জীবন এবং লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত ও লোকগাথার আকর্ষণ। সর্বোপরি ছিল গীটার, যার তারে তারে স্পেনের প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে লরকা স্পেনের জনসাধারণের অন্তরকে এই পরিবেশের মধ্য দিয়ে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন ; তাই তাঁর পক্ষে জনগণের কবি হওয়া সহজ হয়েছিল।

গান, অভিনয় ও উপকথা লরকার ছেলেবেলার দিনগুলি প্রভাবান্বিত করলেও তাঁর লেখাপড়ায় বাধা সৃষ্টি করেনি। নিয়মিতভাবে তিনি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। স্কুলের পড়া শেষ করে লরকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও সাহিত্যের ক্লাশে ভর্তি হলেন। ১৯১৭ সালে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ক্যাস্টিল বেড়াতে যান। ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ক্যাস্টিল তাঁকে গভীর-ভাবে প্রভাবান্বিত করে। পর বৎসর তিনি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাব্যময় গদ্যে প্রকাশ করেন। লরকার এটি প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টা।

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে লরকা সম্পূর্ণরূপে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কবিতা লিখে প্রকাশ্য রাজপথে কিংবা পার্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতেন ; আবৃত্তি শুনতে লোক জমে যেত। এ ছাড়া নিত্য নতুন অভিনয়ের আয়োজন করতেও ছিল তাঁর বিশেষ উৎসাহ। কিন্তু লরকার এ সময়কার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে লোকগাথা সংগ্রহ করা। ১৯২১ সালে লরকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ লোক-গাথার উপর ভিত্তি করে রচিত কবিতার সঙ্কলন। এই সময় মাদ্রিদের রঙ্গমঞ্চে তাঁর একটি নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। কাব্য ও নাটকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পপ্রতিভা ছবির মধ্যেও রূপায়িত হয়েছিল। লরকার ছবির প্রধান গুণ সারল্য ও সুস্পষ্টতা।

১৯২৯ সালে লরকা আমেরিকার কলাম্বিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে বেড়াতে যান। আমেরিকা আসবার পর তাঁর কবিতা ইংরেজীতে প্রথম অনুবাদ হয় এবং পৃথিবীর সকল দেশের কাব্যরসিকরা সেই অনুবাদের সাহায্যে তার কাব্যমাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। আমেরিকার জীবন ও আদর্শ তাঁকে কাব্যরচনায় নতুন প্রেরণা দিতে পারেনি। নিউ ইয়র্কে বসেও তিনি স্পেনের ঐতিহ্যের উপর কবিতা লিখেছেন। আমেরিকার নিগ্রোদের জীবন লরকাকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি নিগ্রোদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের রীতি-নীতি ও উপকথা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতেন। লরকার মেক্সিকো

ও কিউবা ভ্রমণের সময় স্পেনে আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। তার ফলে তাঁকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসতে হয়। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের বিরাট সাফল্যের পর ১৯৩১ সালে রাজা ত্রয়োদশ আলফান্‌সোকে সিংহাসনচ্যুত করে স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই শীতকালে স্পেনের ছাত্র-কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয় যে মাদ্রিদের কেন্দ্রস্থলে একটি 'বারাকা' (La Barraca) প্রতিষ্ঠা করা হোক। এখানে প্রসিদ্ধ স্প্যানিশ নাটকগুলির অভিনয় হবে; এই অভিনয় দেখবার জন্য জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে। ষাঁড়ের লড়াইর পর্যায় থেকে জনগণের রুচিকে উন্নত করাই ছিল 'লা বারাকা' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের শিক্ষামন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহে 'লা বারাকার' পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হল। জনগণের প্রিয় কবি ও নাট্যকার লরকা 'লা বারাকার' ডিরেক্টার নিযুক্ত হলেন। এই প্রগতিবাদী সাহিত্যিক ও অভিনয়-কুশলী সঙ্গীতজ্ঞকে পেয়ে ছাত্রমহল উৎসাহিত হয়ে উঠল। ছাত্ররা এগিয়ে এল অভিনয় করতে এবং প্রচার কার্যে সাহায্য করতে। ছাত্র-সমাজের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং লরকার সুদক্ষ পরিচালনার ফলে 'লা বারাকা' অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল। 'লা বারাকার' কর্মতৎপরতা মাদ্রিদেই সীমাবদ্ধ রইল না। এই সংস্থা স্পেনের ভ্রাম্যমাণ জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত হল। দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে 'লা বারাকা' ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক নাটকের অভিনয় দেখাত। অভিনয় দেখবার জন্য লোকে আসত দূর দূরান্তর থেকে; তিলধারণের স্থান থাকত না। স্পেনের সাংস্কৃতিক জীবনে 'লা বারাকা' বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্পেনের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে 'লা বারাকার' বেশিদিন কাজ করা সম্ভব হল না। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট (কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট, রিপাব্লিকান প্রভৃতির সম্মিলিত দল) বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ়তর হল বলে প্রগতিবাদীরা যখন আশান্বিত হয়ে উঠেছে তখন অপ্রত্যাশিতভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে একদল সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে যোগ দিল রাজতন্ত্রের সমর্থক, ক্যাথলিক পাদ্রি, জমিদার, পুঁজিপতি প্রভৃতি রক্ষণশীল দলের লোক। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়কামী জনসাধারণ প্রগতি-বিরোধী শক্তির সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করল। আরম্ভ হল গৃহযুদ্ধ। দেশময় অরাজকতা, কখন কার প্রাণ যাবে ঠিক নেই।

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসের শেষের দিক। লরকা তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। ফ্রাঙ্কোর চর সেখানে উপস্থিত হল। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল জেলখানায়। কয়েকদিন পরে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা তাঁকে জেলখানা থেকে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে এল। এখানেই অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁর ভগ্নীপতি গ্রানাডার ভূতপুর্ব সোসালিস্ট মেয়রকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। ফ্রাঙ্কোর অনুচরেরা মেয়রকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার মৃতদেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে কুকুরের মতো টেনে এনেছে শহরের রাস্তা দিয়ে। ভগ্নীপতির কবরের সামনে এসে দাঁড়াতেই চারদিক থেকে সৈন্যরা বন্দুকের কুঁদা দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার শুরু করল। রক্তাক্ত দেহে লরকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এতেও রক্ষা নেই। বন্দুকের মুখ থেকে বৃষ্টির মতো বুলেট বেরিয়ে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা করে দিল। আর বেঁচে ওঠবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গুলি বন্ধ করল সৈন্যরা। কিন্তু লরকার জন্য এ মৃত্যুর চেয়ে বড় মৃত্যুর আয়োজন হয়েছিল গ্রানাডায়। লরকার যত বই পাওয়া গেল সব সংগ্রহ করে বহ্ন্যুৎসব করা হল গ্রানাডার প্রকাশ্য স্থানে। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত সরকার তাঁর সকল রচনা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল।

অনেকে বলেন, গৃহযুদ্ধের ডামাডোলে শত শত লোকের মতো লরকাকেও প্রাণ হারাতে হয়েছে আকস্মিক ভাবে। বিশেষরূপে চিহ্নিত করে তাঁকে হত্যা করা হয়নি। কিন্তু এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। লরকার ছাত্র সমাজে যে বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রগতিবাদী কবি হিসাবে জনগণের হৃদয়ে তাঁর যে আসন ছিল, তা ফ্রাঙ্কো সরকারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা সমাদৃত স্প্যানিশ কবি লরকা। তাঁর কাব্যে স্পেনের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক ভাবধারা এবং আদিম প্রবৃত্তি ও সংস্কৃতিবান মনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কবির হৃদয়ের উদ্দীপনা তাঁর রচনায় যেভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তার তুলনা বেশি পাওয়া যায় না। লরকার জন্ম স্থান আন্দালুসিয়া অধিকাংশ কবিতার প্রেরণা যুগিয়েছে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, সরল অধিবাসী, তাদের নৃত্য ও সঙ্গীত এবং প্রচলিত কাহিনী লরকার কাব্যের প্রধান উৎস। ১৯২৮ সালে লরকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ 'জিপসী গাথা' প্রকাশিত হয়। সকল শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট করবার মতো এমন একখানি বই স্প্যানিশ সাহিত্যে দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়নি। স্পেনের লোকগাথার উপরেই অধিকাংশ রচনার ভিত্তি। এই কবিতাগুলি

লোকের মুখে মুখে স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল ; কোথাও কোথাও ছোট ছোট কবিতাগুলির নাট্যরূপ দেওয়া হত ; কোনো কোনো কবিতা লোকের মুখে মুখে গান হয়ে ঘুরে বেড়াত। কবির জীবিতকালে তাঁর কাব্যের এমন জনপ্রিয়তা দুর্লভ।

লরকার শেষের দিকের রচনায় নানা কাব্য-রীতির মিশ্রণ দেখা যায়। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে সুররিয়ালিজমের প্রভাব পড়েছে। হুইটম্যানের উপরে রচিত প্রশস্তিটি এই প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কোনো বিশেষ রীতিকে কাব্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়ে কবিতার মাধুর্য তিনি কখনো ক্ষুণ্ণ করেন নি। লরকা ছিলেন সুরস্রষ্টা ও চিত্রশিল্পী, তাই তাঁর কবিতা ধ্বনি ও চিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ। বড় বড় সবুজ গাছগুলি দেখে কবি কয়েকটি কথায় কী চমৎকার ছবি এঁকেছেন!

'Trees.
Have you been arrows
Let fall from the azure ?
What terrible warriors shot you forth ?
Were they the stars ?'

সঙ্গীতের উপরে একটি কবিতায় লরকা বলেছেন—

'The song wishes to be light.
In the darkness the song has
Threads of phosphorous and moon light.
The light does not know what it wishes.
Within its boundaries of opal
It meets with itself
And turns back home.'

স্থানাভাবের জন্য লরকার কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে হল। শুধু তাঁর 'গীটার' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

'The lament begins
Of the guitar.
The wine cups of dawn
Are splintered afar.
The lament begins
Of the guitar.

It's impossible, useless,
To get it to stop.
It weeps monotonously,
As the rain, drop by drop,
Or as the wind weeps
On the snowpeak's top.
It's impossible
To get it to stop.
It grieves for things
Far out of sight—
Like the hot southern sands
For camellias white.
It weeps, the targetless arrow,
The eve without morrow,
And the first bird on the bough
To perish in sorrow.
O the guitar, the heart
That bleeds in the shades
Terribly wounded
By its own five blades.'

লরকার কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে আমরা বাস্তব ও প্রতীকী জগতকে একই সঙ্গে পাশাপাশি পাই। স্টিফেন স্পেণ্ডার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন: 'One is aware often in his poems of a double picture : the reality on which his poetry is drawing, and, superimposed above this reality, an independent, unreal picture.'

বাস্তব জগতকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে প্রতীকী জগৎ সার্থকরূপে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। লরকা এ কথা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন: 'A poet must be a Professor of the five bodily senses. Of the five senses, in the following order : sight, touch, hearing, smell and taste. To command the most perfect images, he must open doors of communication between all the senses.' কবিকে দৃশ্য, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ, আস্বাদন—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিশেষজ্ঞ হতে হবে। আর এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কবি যদি

যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারেন তাহলে তাঁর কাব্যের পূর্ণতা আশা করা যায় না।

আধুনিক কাব্য-রীতি লরকার রচনাকে সামান্যই প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি খাঁটি স্প্যানিশ ঐতিহ্যানুসারী। আন্দালুসিয়ার লোকগাথা, জিপসী কাহিনী, স্পেনের চিরাগত রোমান্স ও লোকসঙ্গীত লরকার কাব্যের প্রধান প্রেরণা। ১৯২৯-'৩০ সালে লরকা যখন নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলেন তখন সালভাদোর দালির (Salvador Dali) সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দালির প্রভাবে তিনি স্যুররিয়েলিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

লরকা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন। 'লা বারাকা'-র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর থেকে নাটক রচনা ও অভিনয়ের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। লরকার নাটক বিচার করলে উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না যে, এগুলি কবির রচিত। কবির মনের ভাবনা ও কল্পনা নাট্যরূপ পেয়েছে; প্রকৃত নাট্যকার বক্তব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবার জন্য কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। লরকার পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রে জটিলতা নেই। তারা মোটা রেখায় আঁকা ছবি, সূক্ষ্ম তুলির টানে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের গণ্ডীতে সাধারণতঃ তাদের আবদ্ধ করা হয়নি। নাটকের নরনারীদের মতো স্থান ও কালকেও লেখক সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য উৎসুক নন। তিনি এক্সপ্রেশানিজম রীতিতে নাটক রচনা করেছেন; ভাবনার সুন্দর প্রকাশই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। নাটকের চরিত্রগুলির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা পৃথক করে দেখা হয় না; সমগ্র ভাবটিকে প্রকাশ করতে যতটুকু তারা সহায়তা করে ততটুকুই তাদের মূল্য। লরকার অনেক চরিত্রের তাই বিশেষ কোনো নামকরণ করা হয়নি। তারা কেউ বর, কেউ কনে, কেউ মুচির বৌ নামে চিহ্নিত।

রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র না থাকা সত্ত্বেও যে লরকার নাটক সমাদর লাভ করেছে তার কারণ পাওয়া যাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে লরকা এমন বিষয় গ্রহণ করেছেন যা স্প্যানিশ ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িত, সুতরাং সহজেই হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম। হিংসা ও রক্তপাত, গভীর বেদনা, ইন্দ্রিয়াসক্ত প্রেমের যন্ত্রণা, বন্ধ্যা নারীর দুঃখ প্রভৃতি কেন্দ্র করে যে ভাবনা ও অনুভূতি দেখা দেয় তারা স্প্যানিশ জনসাধারণের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। মানব চরিত্রের এই মৌলিক অনুভূতিগুলির প্রতি সকল দেশের লোকেরই সহজাত আকর্ষণ আছে। লরকা মার্জিতরুচি লেখক নন বলে তাঁর নাটকে পাপ, নিষ্ঠুরতা,

লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি আদিম প্রবৃত্তির ছবিগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে তিনি বোদ্‌লেয়ার ও দস্তয়েভস্কির সগোত্র।

Bodas de Sangre বা Blood Wedding (১৯৩৩) লরকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি। এই নাটকের বিষয়বস্তু প্রেম ও প্রতিহিংসা। প্রকৃত পক্ষে নাট্যগুণ অপেক্ষা কাব্যগুণই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। এক্সপ্রেশানিস্ট পদ্ধতিতে রচিত নাটক হিসাবে প্রধান চরিত্রগুলির নামকরণ করা হয়নি। এরা একেকটি টাইপ চরিত্র, টাইপের নাম দিয়েই এদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

কনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বরের সঙ্গে। বরের মা'র এ বিয়েতে মত নেই। কিন্তু তার মত উপেক্ষা করেই বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। বরের মা ছাড়া এ বিয়েতে আর একজন বাধা দিল। সে ক'নের ভূতপূর্ব প্রেমিক লিওনার্দো। লিওনার্দো অবশ্য ক'নের সম্মতির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারেনি। সে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। কিন্তু ক'নের বিয়ের খবর পেয়ে লিওনার্দোর পুরনো প্রেম প্রবল হয়ে উঠল। সে জোর করে বিয়ে বন্ধ করবার চেষ্টা করল। বিয়ের দিন কথা বলল ক'নের সঙ্গে। পুরনো দিনের স্মৃতি আলোড়িত করল দু'জনের মন। ক'নে যে এখনো লিওনার্দোর প্রতি আকৃষ্ট এ কথা সে অস্বীকার করতে পারল না।

তবু নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পরেই কনেকে নিয়ে উধাও হল লিওনার্দো। বর ছুটল ক'নেকে উদ্ধার করতে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হল দু'জনেই। শোকের বন্ধন ক'নে ও বরের মা'র মধ্যে মিলন ঘটাল।

'ইয়ার্মা' (১৯৩৪) এক বন্ধ্যা রমণীর মনোবেদনার কাহিনী। ইয়ার্মার সন্তান নেই; অথচ মাতৃত্বের অনুভূতিতে তার হৃদয় পূর্ণ। অন্যের ছেলেমেয়ে ডেকে এনে সে আদর করে। দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটায়। তবু স্বামী জুয়ানকে নিয়ে তার দিনগুলি মোটামুটি শান্তিতেই কাটছিল। কিন্তু ইয়ার্মার ভূতপূর্ব প্রণয়ী ভিক্টরকে তার কাছে আসা-যাওয়া করতে দেখে দর্শকের মনে প্রথম থেকেই ট্র্যাজেডির আশঙ্কা জাগে। ইয়ার্মা ভিক্টরকে এড়িয়ে চলে। স্বামীকে প্রতারণা করবার কথা তার কল্পনারও অতীত। কিন্তু স্বামীর প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন হল এক ডাইনীর কথা শুনে। ডাইনী বলল, ইয়ার্মার যে সন্তান হয়নি তার জন্য দায়ী সে নয়, দায়ী জুয়ান। ইয়ার্মার মনে হল, কথাটা হয়ত সত্য। স্ত্রীর এই সন্দেহ উপলব্ধি করতে জুয়ানের বিলম্ব হল না। সঙ্কোচ ও সহানুভূতির পরিবর্তে স্ত্রীর উপরে সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

স্ত্রীকে আদেশ করল সন্তানের জন্য এই মিথ্যা অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে। বিস্মিত হয়ে গেল ইয়ার্মা। এমন গভীর আকাঙ্ক্ষা যে স্বামী তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চায় সে স্ত্রীকে কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছে? এতদিন ধরে জুয়ান যে তাকে চেয়েছে তার মধ্যে ভালোবাসার পরিচয় নেই। যেমন করে সে কবুতরের মাংস খেতে চায় ঠিক তেমনি ভাবেই স্ত্রীর সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত। জুয়ান শুধু নিজের ভোগের কথাই ভেবেছে; স্ত্রীর তৃপ্তির কথা মনে হয়নি তার। এতদিনের বিবাহিত জীবনের পর ভালোবাসার অভিনয়টা ধরা পড়ল। স্বামীর স্বার্থপরতা উপলব্ধি করে দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি মুহূর্তে টলে উঠল। আকস্মিক আবিষ্কারের বেদনায় ইয়ার্মা উন্মত্ত হয়ে গলা টিপে স্বামীকে হত্যা করল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, সন্তানধারণের আর কোনো আশাই রইল না এই জীবনে। ইয়ার্মা সাধ্বী স্ত্রী। জুয়ান বেঁচে থাক আর মারা যাক,—সে তারই স্ত্রী। ভিক্টর আসবে, ঘোরাঘুরি করবে। কিন্তু এ দেহ সে আর কাউকে দিতে পারবে না। জুয়ান যেখানেই থাক,— এ দেহ তার।

The House of Bernerda Alba লরকার সর্বশেষ ট্র্যাজেডি। লরকার মৃত্যুর পরে ১৯৩৬ সালে এই নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে। বার্নার্দার মধ্যে আমরা এক প্রভুত্বকামী নারীর উন্মত্ততা দেখতে পাই। স্বামী তার ক্ষমতালিপ্সা সংযত করতে চেষ্টা করত। স্বামীর মৃত্যুর পর বাধা দেবার কেউ রইল না। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য মেয়েদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করল। বড় মেয়ে আঙ্গুস্তিয়াসের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল মা'র খেয়ালে। ছোট মেয়ে আদেলা যাকে ভালোবাসল মা তাকে রাইফেলের ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। আদেলা আশাভঙ্গের বেদনায় আত্মহত্যা করল। তথাপি বার্নার্দার হৃদয়ের পরিবর্তন হল না। বার্নার্দার মতো এমন ভয়ঙ্কর নারী-চরিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল।

নাটকীয় গুণে, চরিত্র-চিত্রণে ও বাস্তবানুগতায় এটি লরকার শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে। এই নাটকের প্রায় সর্বত্র গদ্য ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের সবগুলিই স্ত্রী চরিত্র।

'মুচির স্ত্রী' দু' অঙ্কের একটি ছোট প্রহসন। ছোট হলেও এর মৌলিকত্ব লক্ষ্যণীয়। ঝগড়াটে বৃদ্ধ মুচি বিয়ে করেছে এক সুন্দরী তরুণীকে। বিয়ের পরে মুচির স্ত্রী নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা করে। কত উজ্জ্বল তরুণ তার

পাণিপ্রার্থী ছিল। তাদের উপেক্ষা করে কেন এই বৃদ্ধকে বিয়ে করল? মুচিরও তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে বিপদ কম নয়। তার মনে কেবলই সন্দেহ স্ত্রী হয়ত খদ্দেরদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। স্বামী না থাকলে স্ত্রীর অবস্থা কেমন হয় তা স্ত্রী যেন সম্যক উপলব্ধি করতে পারে এই উদ্দেশ্যে মুচি বাড়ি ছেড়ে কোথায় একদিন চলে গেল।

স্বামীর অনুপস্থিতে মুচির বৌ বিপদে পড়ল। রক্ষক নেই দেখে পাড়ার যত বখাটে ছেলেরা তাকে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই তার চরিত্র সম্বন্ধে নানা অশোভন মন্তব্য প্রচারিত হল শহরের বিভিন্ন মহলে। মেয়র পর্যন্ত এই 'সহজলভ্যা' সুন্দরী মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

মুচি-বৌয়ের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তখন বৃদ্ধ মুচি ছদ্মবেশে শহরে ফিরে এল। সে পুতুলের নাচ দেখায়। নানা পালা আছে। একটি পালার নাম 'কু-লোকের মুখ বন্ধের উপায়।' মুচি-বৌ এসেছে পালা দেখতে। মুচি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল স্ত্রীর মুখের উপর। মুখের ভাবান্তর থেকে মনের নির্দেশ পাবে। হ্যামলেট যেমন অভিনয়ের আয়োজন করেছিল পিতৃহন্তাকে চিহ্নিত করতে। পালা শেষ হবার পর মুচি-বৌ ছদ্মবেশী পুতুল খেলুড়েকে অকপটে খুলে বলল তার বিপদের কথা। স্বামী বৃদ্ধ হলেও সে তাকেই ভালোবাসে। স্বামী ফিরে এলে সে বাঁচে; স্বামী বাড়ি নেই বলে সে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে। স্ত্রীর মুখ থেকে এই অকপট স্বীকৃতি শোনবার পর মুচির মনে আর কোনো ক্ষোভ রইল না। বিয়ের এতদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সত্যিকার মিলন এই প্রথম ঘটল।

লরকার কাব্যে ও নাটকে বারবার মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। এটা হয়ত তাঁর নিজের শোচনীয় মৃত্যুর অলক্ষ্য ইঙ্গিত। কীটস ছাড়া আর কোনো কবি নিজের মৃত্যুকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাননি। পতঙ্গ যে আকর্ষণে আলোর কাছে ছুটে যায়, লরকার মৃত্যুর প্রতিও ছিল তেমনি আকর্ষণ। সে আকর্ষণ ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার। ষাঁড়ের সঙ্গে স্পেনের বীর সন্তানরা এই আকর্ষণেই লড়াই করতে যায়, খেলতে খেলতে প্রাণ দেয়। স্প্যানিশ ঐতিহ্য অনুসারে গাথা রচনা করবার মতো কবি লরকার পরে কেউ আসেনি। তেমন কবি থাকলে লরকার মৃত্যু নিয়ে একটি শোকগাথা রচিত হত। কিন্তু লরকা নিজেই অলক্ষ্যে তাঁর মৃত্যু-গাথা রচনা করে গেছেন। লরকার পাঠক তাঁর কাব্যে ও নাটকে তাদের দেখা পাবেন।

লরকার প্রিয়তম বন্ধু ইগ্‌নাশিও ষাঁড়ের গুঁতোয় হাজার হাজার দর্শকের চোখের সামনে প্রাণ দিয়েছে। এই মৃত্যু উপলক্ষ্য করে রচিত শোকগাথাটি স্প্যানিশ সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি এখানে মৃত্যুর রূপ এ ভাবে দেখেছেন :

'And already his blood comes singing,
singing across marshes and meadows,
gliding off chill, stiff horns,
reeling soulless through the mist,
stumbling on a thousand hooves
like a long, dark, woeful tongue,
to gather in a pool of agony
by the Guadalquivir of the stars.'

শুধু মৃত্যু নয়, প্রেমও লরকার রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। লরকা মৃত্যু ও প্রেমের মধ্যে বিরোধ দেখতে পাননি। তাঁর চোখে প্রেম ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত। ভালোবাসার পশ্চাতে মৃত্যু ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চুম্বনের মাদকতার অন্তরালে কবি দেখতে পান মৃত্যুর বিদ্রূপাত্মক হাসি। প্রিয়তমার মুখের স্পর্শে তাঁর মনে পড়ে যায় রক্তমাংসহীন কঙ্কালসার মুখের (মৃত্যুর) কথা :

'There is no one who in giving a kiss
does not feel the smile of the faceless people...'

গ্যাব্রিয়েল দানুন্‌ৎসিও

১৮৬৩-১৯৩৮

প্রাচীনতম ইতালিয়ান সাহিত্যের নিদর্শন ইতালীর মূল ভূখণ্ডে পাওয়া যায় না। ইতালিয়ান কবিতার চর্চা প্রথম শুরু হয় সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের পৃষ্ঠপোষকতায়। ফরাসী ত্রুবাদুর কবিতার অনুকরণের মধ্যেই কাব্য-চর্চা প্রধানত নিবদ্ধ ছিল। সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। তারপর দীর্ঘ কাল এই রীতি অনুসরণ করেই কাব্য রচিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দান্তের আবির্ভাব ইতালিয়ান সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করল। প্রকৃতপক্ষে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' প্রকাশের পর থেকেই ইতালিয়ান সাহিত্যের জন্ম বলা যেতে পারে। তুস্কানের উপভাষায় দান্তে কাব্য রচনা করায় ক্রমে ক্রমে সেই আঞ্চলিক ভাষাই ইতালিয়ান সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠল। এরপরে বোক্কাচিয়োর গল্প এবং পেত্রার্কের সনেটও এই উপভাষায় লেখা হবার ফলে জাতীয় ভাষা হিসাবে এর দাবি দৃঢ়তর হল। দান্তে, বোক্কাচিয়ো ও পেত্রার্কের প্রভাব পরবর্তী কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। এঁদের মৃত্যুর পর ইতালিয়ান সাহিত্যের প্রথম যুগ সমাপ্ত হল।

দ্বিতীয় পর্ব রেনেসাঁসের যুগ। কবি পলিৎসিয়ানো মানবতাবাদ প্রচার করলেন। গ্রাৎসিনি ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইতালিয়ান ভাষা সংস্কারে উদ্যোগী হলেন। প্রথম প্রামাণ্য ইতালিয়ান ভাষার অভিধান বের হল ১৬১২ সালে। লরেঞ্জো দ্য মেদিসির পৃষ্ঠপোষকতায় ইতালিয়ান সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল। তাসো, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, সেলিনি প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ হল ইতালিয়ান সাহিত্যের ভাণ্ডার। ম্যাকিয়াভেলির 'দি প্রিন্স' এবং ভাসারির 'লাইভস অব পেইণ্টারস' এ যুগের দু'টি বিখ্যাত গ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক রচনা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু রচিত হয়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাহিত্যে ক্লাসিক্‌সের প্রভাব দেখতে পাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাহিত্যের বিখ্যাত বই ক্যাসানোভার 'স্মৃতিকথা'। বিশ্ব-সাহিত্যে এ বই স্থান পেয়েছে।

আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্যের সূচনা হয় উনবিংশ শতকে। ইতালীর ভূগোল ও ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। ইতালী টুকরো টুকরো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। য়ুরোপে ইতালীর জাতি হিসাবে কোনো মর্যাদা ছিল না। ১৮৭০ সালে সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল বিচ্ছিন্ন ইতালীকে সংহত করে নতুন ইতালী রাষ্ট্র গঠন করেন। ইতালিয়ান লেখকদের মনে ইতালীর প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাঁরা কাব্যে ও উপন্যাসে ইতালিয়ান জনসাধারণকে স্বদেশ-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য মানযোনির উপন্যাস ও কার্দুচির কবিতা।

কার্দুচি ইতালীর প্রথম জাতীয় কবি। ১৯০৬ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর স্বাদেশিকতার বাণী গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্‌ৎসিওর রচনায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাঁকে বলা হত আধুনিক 'ইম্‌পিরিয়েল রোমের' জাতীয় কবি। তিনি সাহিত্যে দেশ-প্রীতি প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। নিজের জীবনে দেশ-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। দুর্বল ঐতিহ্য-বিমুখ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য গ্যাব্রিয়েলের মতো সোচ্চার শক্তিসাধক কবির ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল।

আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের তীরবর্তী ছোট্ট শহর পেসকারায় ১৮৬৩ সালের ১২ই মার্চ গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্‌ৎসিও (Gabriele D'Annunzio) জন্মগ্রহণ করেন। দান্নুন্‌ৎসিও আভিজাত্যপূর্ণ পারিবারিক উপাধি। গ্যাব্রিয়েলের পারিবারিক উপাধি আসলে দান্নুন্‌ৎসিও ছিল না। মর্যাদা বাড়াবার উদ্দেশ্যে গ্যাব্রিয়েলের জন্মের কিছুদিন পূর্বে তাঁর বাবা এই নতুন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বালজাকের মতোই কুলের গৌরব ছিল গ্যাব্রিয়েলের। তাঁর বংশের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গল্প করতে ভালোবাসতেন তিনি। বলা বাহুল্য, এ-সব ছিল বানানো গল্প।

পরবর্তী জীবনে গ্যাব্রিয়েলের চরিত্রে যে পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার মূলে ছিল পিতামাতার দুই ভিন্নমুখী প্রকৃতির প্রভাব। বাবা ফ্রান্সেসকো রাপাগনেত্তা ছিলেন সম্পন্ন জমিদার; পরে তিনি হয়েছিলেন পেসকারার মেয়র। কিন্তু তাঁর সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রের সামঞ্জস্য ছিল না।

ফ্রান্সেসকোর ইন্দ্রিয়াসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা শহরের কারো অজানা ছিল না। সে যুগের জমিদারদের মধ্যে এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ফ্রান্সেসকোর মতো উন্মাদনা সচরাচর তখনকার দিনেও দেখা যেত না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর ভূতপূর্ব রক্ষিতাদের মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করতেও দ্বিধা করেন নি। এই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য সকল অর্থ ও সম্পত্তি হারিয়ে মৃত্যুর পূর্বেই তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। গ্যাব্রিয়েল বাবার ঋণের বোঝা এবং স্বভাব পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারীসূত্রে। গভীর ইন্দ্রিয়াসক্তি গ্যাব্রিয়েলের জীবন ও সাহিত্য প্রতিভাকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু ভোগাসক্ত ও ক্ষমতালিপ্সু গ্যাব্রিয়েল হঠাৎ কখনো কখনো উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। চরিত্রের এই দিকটা তিনি পেয়েছেন মা'র কাছ থেকে। মা ছিলেন ধর্মভীরু এবং তাঁর প্রকৃতি ছিল শান্ত। অবশ্য গ্যাব্রিয়েলের চরিত্রে মা'র প্রভাব ছিল সামান্যই।

ফ্রান্সেসকো ছেলের প্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করতেন। তাই গ্যাব্রিয়েলকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ভালো স্কুলে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই শিক্ষার ফলে গ্যাব্রিয়েল ক্লাসিক্যাল ইতালিয়ান সাহিত্য ও প্রাচীন ইতালীর গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেছিলেন। এই পরিচয় শুধুই পুঁথিগত ছিল না; জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্যাব্রিয়েলকে ফ্যাসিস্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী ইতালীর কবি করেছে।

স্কুলে পড়বার সময় গ্যাব্রিয়েল তাঁর এক শিক্ষকের মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। এ প্রেমের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। পরবর্তী জীবনের অসংখ্য চমকপ্রদ প্রেমের অন্তরালে প্রথম প্রেম হারিয়ে গেলেও সেই কিশোরীই গ্যাব্রিয়েলের কবিচিত্ত সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ Primo Vere (In early spring)-এর প্রেরণা এসেছিল প্রণয়িনী লিলিয়ার কাছ থেকে। প্রেমের মাদকতাও কিশোর কবিকে সম্পূর্ণ আশাবাদী করতে পারেনি। অবক্ষয়ধর্মিতার বৈশিষ্ট্য এই কাব্য-সংগ্রহের মধ্যেও পাওয়া যায়।

ষোলো বছরের কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ভালো সমালোচনা বের হল বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। এই অল্প বয়সে এমন কবিতা লিখে তিনি ইতালীর পাঠকদের নিকট কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠলেন। এই কৌতূহল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশ্য সমালোচকরা শুধুই তাঁর প্রশংসা করেন নি। গ্যাব্রিয়েলের রচনায় স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রাধান্য দেখে

একজন সমালোচক বলেছেন যে, তিনি কবির শিক্ষক হলে কবিত্বশক্তির জন্য স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে কবিকে বেত মারতেন।

১৮৮২ ও ১৮৮৩ সালে Canto Novo এবং Intermezzo di Rime নামে আরো দু'টি কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হল। এ দু'টি কাব্য-সংগ্রহের মধ্যেও অবক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। নবযৌবনপ্রাপ্ত কবি মধ্যগগনের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অস্তোন্মুখ ক্ষীণ চন্দ্রের ছবি এঁকেছেন :

'O sickle of moonlight declining
That shinest o'er water deserted,
O sickle of silver, what harvest of visions,
Is waving down here, thy mild lustre beneath !'

বোদ্‌লেয়ারের Fleurs du Mal-এর কালোছায়া পড়েছে তাঁরও মনে। তাই গ্যাব্রিয়েল বলেছেন :

'...Within my heart malignant flowers
Of verse swell forth...'

কবিতার ও প্রেমের বিষ-ফুল তাঁর জীবন আচ্ছন্ন করে ফেলল। ছোট শহর ছেড়ে চলে এলেন রোমে। গ্যাব্রিয়েল দেখে বিস্মিত হলেন এই অপরিচিত শহরেও অনেক মহলে তাঁর নাম পরিচিত। তাঁর বয়সের নবীনত্ব পাঠকদের কৌতূহলী করেছে ; আর তাঁর কাব্যে অবক্ষয়ের সুর ইতালীর ক্ষয়িষ্ণু সমাজে স্থান লাভ করেছে সহজেই।

গ্যাব্রিয়েল রোমের লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। অভিজাত পরিবারে তাঁর নিমন্ত্রণ হতে লাগল। বড় বড় ঘরের মেয়েরা প্রকাশ্যে তাঁর লেখার নিন্দা করে, অশ্লীলতার অপবাদ দেয়, কিন্তু বাড়িতে ডেকে এনে আলাপ করে, আত্মদান করে। বিষামৃত তাঁর সঙ্গ। গ্যাব্রিয়েলের দুঃখ, শেলীর মতো সুন্দর মুখ যদি পেতেন তাহলে ইতালীর মেয়েদের তুড়ি দিয়ে জয় করতে পারতেন। খর্বাকৃতি একান্ত সাধারণ চেহারা ; অল্পবয়সে সারা মাথায় টাক ছড়িয়ে পড়েছে। তবু আশ্চর্য তাঁর প্রভাব। প্রভাব মেয়েদের উপর। পোশাক-পরিচ্ছদের উপর গ্যাব্রিয়েল কোনোদিন দৃষ্টি দেননি। এবার তাঁর পোশাক ও প্রসাধন রোমে গল্পের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোশাকের বৈচিত্র্য ছাড়া ছিল তাঁর এসেন্স ক্রীম ও পাউডার প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা। দিনের মধ্যে অনেকবার তিনি প্রসাধন করতেন। সময় ও ক্ষেত্র অনুসারে প্রসাধন

পরিবর্তিত হত। পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি উদাসীন থাকাই তখন লেখকদের রীতি ছিল। গ্যাব্রিয়েল সেই রীতির ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম ছিলেন আরো অনেক বিষয়ে। শহরের অন্যান্য লেখকদের মতো তিনি নন। কখনো তিনি শিশুর মতো সরল ব্যবহার করেন ; কখনো চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে ; কখনো বা হিংস্র বন্যতার আকস্মিক প্রকাশ সবাইকে সচকিত করে তোলে। তিনি যে বাঁধা ছকের মানুষ নন, তাঁর মনের যে সর্বদাই পট পরিবর্তন চলছে—মেয়েদের তা ভালো লাগত। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর কথা শুনে মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে যেত ; কথার মোহে তারা ভুলে যেত অন্য সব কিছু। শুধু সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বরের মালিকের উপস্থিতিটাই সকল সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করত। আর্থার সিমন্সও বলেছেন, গ্যাব্রিয়েলের আবৃত্তি শোনবার পূর্বে ইতালিয়ান ভাষার যাদু সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না।

এক বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে গ্যাব্রিয়েল আমন্ত্রিত হলেন। কর্ত্রী তাঁর কাব্যের মুগ্ধ পাঠিকা। গ্যাব্রিয়েল প্রায়ই যান ; কর্ত্রীকে কবিতা শোনাতে নয়, তাঁর চোখ পড়েছে মারিয়ার উপর। ধনী পিতা-মাতার আদরের সন্তান মারিয়া ; রোমান্টিক স্বভাব। প্রথম কিছুদিন গ্যাব্রিয়েলের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল ; তারপর ধীরে ধীরে মারিয়া আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। রোমান্সের কাজল মারিয়ার চোখে। রক্ত-মাংসে গড়া দোষে-গুণে মেশানো মানুষ গ্যাব্রিয়েলকে সে দেখতে পেল না। কাব্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হিসাবে সে হৃদয়ে বরণ করে নিল গ্যাব্রিয়েলকে। বাবা বললেন, ওর বংশ-মর্যাদা নেই, প্রকৃতপক্ষে গেঁয়ো চাষী। ওর হাতে মেয়ে দেব না।

মেয়ে বলল, ওঁকে ছাড়া আর কাউকে চাই না আমি। হয় ওঁর স্ত্রী হব, না হয় সংসার ছেড়ে কনভেন্টে যাব।

—ওকে বিয়ে করলে এক পয়সা যৌতুক পাবে না, সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে।

—সব যাক, কিছু চাই না। শুধু আমার গ্যাব্রিয়েল থাক।

মারিয়ার জেদ বজায় রইল। মা, বাবা, সম্পত্তি সমাজ সব ত্যাগ করে সে এসে দাঁড়ালো গ্যাব্রিয়েলের পাশে। কবিতা দিয়ে অর্ধেক জয় হয়েছিল ; মারিয়াকে পেয়ে তাঁর জয় সম্পূর্ণ হল। প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন অভিজাত সম্প্রদায়ে। মারিয়াকে পেয়ে গ্যাব্রিয়েলের আত্মবিশ্বাস হল দৃঢ়তর। একটি মেয়ের হৃদয় জয় করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখলেন।

Tribuna কাগজে শহরের নানা গুজবের উপর একটি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ায় গ্যাব্রিয়েলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সাংবাদিকতায় তিনি তৃপ্তি পেতেন না। উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন। আটটি বড় এবং শতাধিক ছোট প্রেমের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরই আছে। আত্মময়তা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের কাহিনীতে তিনি নিজের জীবনের কথাই বলেছেন। এই সব উপন্যাসের কাহিনীতে গ্যাব্রিয়েলের একটি বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। তাঁর নায়কদের সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য কোনো পাপাচরণেই দ্বিধা নেই। এমন কি তা অসঙ্গত যৌনাচরণেও তাঁদের সমর্থন আছে। উপায়ের চেয়ে লক্ষ্য তাঁর কাছে বড়।

প্রথম পর্বের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে Il Piacere বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর নায়ক আন্দ্রিয়া স্পেরেল্লির চরিত্রে গ্যাব্রিয়েলের নিজেরই প্রতিফলন পাওয়া যায়। শিল্পের দাবি আন্দ্রিয়ার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করেছে। আন্দ্রিয়ার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি—সবই আছে। সে লেখক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ দিতে হবে ; তাই সে সকল পথে চলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। কোন পথ ভালো, কোন পথ মন্দ সে বিচারে তার আগ্রহ নেই। সমাজবিরুদ্ধ প্রেম, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, বল নৃত্য, শিকার, কলহ, ঈর্ষা—সবকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে।

১৮৯৪ সালে Il Trionfo della Morte (The Triumph of Death) বা 'মৃত্যুর জয়' প্রকাশিত হল। এটি গ্যাব্রিয়েলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পরেও তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু কাহিনীর বিন্যাস, নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং গল্পের আকর্ষণের জন্য 'মৃত্যুর জয়' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। নীটশে ও সোপেনহাউয়ার গ্যাব্রিয়েলের ভাবনা যে কত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল তার পরিচয়ও এই উপন্যাস থেকে পাওয়া যায়।

হিপ্পোলাইত বিবাহিতা তরুণী। বিয়ে তার সুখের হয়নি। স্বামী তার দেহ ও মনকে জাগাতে পারেনি। আশাভঙ্গের বেদনায় অসুস্থ হয়ে সে ফিরে এল বাবার বাড়ি। স্বামীর নিকট সে শীতল নারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

হিপ্পোলাইতের পরিচয় হল কবি জর্জের সঙ্গে। জর্জ বায়রণের নায়কের মতোই উদ্দাম প্রেমিক। সে ধনী পরিবারের সন্তান, খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য অর্থের অভাব নেই তার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জর্জের দেহ বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু মন সেই অনুপাতে পরিণতি লাভ করেনি। তবু হিপ্পোলাইত

তাকে নিবিড় করে ভালোবাসল ; স্বামী যা পারেনি, জর্জ তা পেরেছে। জর্জ তাকে চেতনাহীন অস্তিত্ব থেকে জাগিয়েছে, খুঁজে পেয়েছে সে জীবনের নতুন অর্থ। বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে না ইতালীতে ; সুতরাং জর্জকে বিয়ে করতে পারবে না। শরীর সুস্থ হয়েছে ; ইতালীর সর্বত্র তারা দু'জন ঘুরে বেড়ায়।

হিপ্পোলাইতের প্রেম স্বাভাবিক। একজন নারী যেমন করে পুরুষকে ভালোবাসে তেমনি। কিন্তু জর্জের সর্বগ্রাসী ভালোবাসা তাকে উন্মত্ত করেছে। হিপ্পোলাইতের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে পেতে চায় ; অন্য কারো, এমন কি হিপ্পোলাইতেরও, তার উপর কোনো অধিকার থাকবে না। হিপ্পোলাইতের থাকবে না পৃথক অস্তিত্ব, আলাদা জীবন।

বন্ধুরা জর্জকে বলল, কেন তুমি ওর জন্য এমন পাগল হয়েছ ? তোমার চেয়ে ধনী কেউ আহ্বান করলে তার কাছে চলে যাবে হিপ্পোলাইত।

জর্জ চমকে উঠল। চলে গেলে সে বাঁচবে কি করে ? তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতি রক্তকণিকায় হিপ্পোলাইতের অস্তিত্বের ঘোষণা। তাকে অস্বীকার করা যায় না। নিজের বন্দিদশার অসহায়তা উপলব্ধি করে জর্জের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আবার, হিপ্পোলাইত যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তার পরিণামটা ভেবেও জর্জের আশঙ্কার শেষ নেই। এই দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে জর্জের জীবন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দু'জনে গির্জায় যায় ; প্রার্থনা করে। কিন্তু ঈশ্বরের নামে কামনার আগুন নেভে না।

এতদিন এ-সব দেখবার চোখ ছিল না। এখন জর্জ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিপ্পোলাইতকে দেখে ; নানা খুঁত চোখে পড়ে। হিপ্পোলাইতও বুঝতে পারে জর্জ আগের মতো নেই ; প্রায়ই বিষণ্ন চিত্তে একান্তে বসে থাকে। অবশ্য তার একটু স্পর্শ পেলেই জর্জ আপন সত্তায় ফিরে আসে। কিন্তু কামনার উত্তাল তরঙ্গের আঘাত সয়ে কতদিন বাঁচা যায় ? আর যাকে চাই, তাকে হারাতেও পারব না। সুতরাং একমাত্র সমাধান মৃত্যু। প্রেম আর মৃত্যু অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দু'টি মর্মান্তিক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে জর্জের মনে হল এই সমাধান ছাড়া অন্য পথ নেই।

জর্জ একই সঙ্গে ভালোবাসে ও ঘৃণা করে হিপ্পোলাইতকে। আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। হিপ্পোলাইতের মনে দ্বন্দ্ব নেই ; মরতে তার ভয়। পরিপূর্ণরূপে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা এখনো তৃপ্ত হয়নি।

একদিন দু'জনে সমুদ্রে নেমেছে স্নান করতে। জর্জ কৌশলে ওকে জলে

ডুবিয়ে হত্যা করতে চাইল। হিপ্পোলাইতের মনে কি কারণে সন্দেহ হল। সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে এসে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন জর্জের সঙ্গে স্নান করতে নামবে না।

কিছুদিন পরের কথা। রাত্রির খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। একটু বিশ্রাম করে শুতে যাবে। এই সময় মিলনের প্রত্যাশায় হিপ্পোলাইতের দেহে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। রসপুষ্ট আঙুরের মতো যৌবনোজ্জ্বল তার দেহ। চোখ ফেরাতে পারে না জর্জ। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলল, চল একটু বেড়িয়ে আসি।

সমুদ্র-খাড়ির উপর এক-তক্তার সঙ্কীর্ণ একটা সাঁকোর উপর উঠে এল ওরা। নীচে পাথরের উপর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ওদের ভারে সাঁকো দুলে উঠল। ভয় নেই, এস আমার বুকে। মরণ-আলিঙ্গনে কঠিন দুই বাহু দিয়ে জর্জ টেনে নিল হিপ্পোলাইতকে। পরমুহূর্তে আলিঙ্গনাবদ্ধ দু'টি ছায়া সাঁকো থেকে নীচের গভীর খাদে মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি। কঠিন উত্তুঙ্গ পাথরের বুকে দু'টি কোমল মাংসপিণ্ড পতনের শব্দ কেউ শুনতে পেল না। ওরা দু'জন অতৃপ্ত কামনা রেখে গেল সমুদ্রের বুকে। তারই তাড়নায় ঢেউগুলি অবিশ্রাম মাথা কুটছে।

এই বইয়ের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠল। যৌন-জীবনের নগ্নচিত্র এঁকেছেন গ্যাব্রিয়েল। অশ্লীলতার অভিযোগ প্রবল হওয়ায় উপন্যাসের জনপ্রিয়তা বাড়ল। সকলের মুখে এখন গ্যাব্রিয়েলের নাম।

কিন্তু এই খ্যাতি গ্যাব্রিয়েলকে নতুন উপন্যাস লিখতে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না। আর এক ভাবনায় তিনি ডুবে আছেন! নীটশে পড়ে সুপারম্যানের আদর্শে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সংসারে শক্তিশালীর প্রাধান্যই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। যারা দুর্বল তারা তাদের বিপদ দেখে আইনের সাহায্যে শক্তিকে বেঁধেছে। ইতিহাসে কিংবা পুরাণে যত অতিমানবের কথা পাওয়া যায় তারা সকলেই যোদ্ধা; শিশু ও নারীর আর্তনাদ অগ্রাহ্য করে তারা লুঠ করেছে, গ্রাম ও নগর পুড়িয়ে দিয়েছে, নারীর অপমান করেছে। গ্যাব্রিয়েল নিজের জীবনে এই শক্তির সাধনা করবেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাফল্য এবং মারিয়াকে জয় করতে পেরে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। কার্লো ম্যাগনিফিকো নামে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি একটি প্রবন্ধে তাঁর অপমান করেছে বলে গ্যাব্রিয়েলের মনে হল। অমনি তিনি ম্যাগনিফিকোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। মাথায়

তলোয়ারের আঘাত লেগে আহত হলেন তিনি। রক্ত বন্ধ করবার জন্য ডাক্তার যে ওষুধ দিল তার ফলে মাথার সব চুল উঠে গেল।

শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, জাতীয় জীবনেও তিনি সুপারম্যানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কার্দুচির কবিতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। ইতালীকে প্রাচীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে ইতালীর আধিপত্য। আফ্রিকা এবং প্রাচীন ইতালীর সাম্রাজ্য পুনরধিকার করতে হবে। দুর্বল ইতালীর পক্ষে এই শক্তির বাণীর ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। শক্তিশালী ইতালীর পুনরুজ্জীবন আহ্বান করে গ্যাব্রিয়েল রচনা করলেন La Nave নাটক। নাট্যকার ভেনিসের প্রাচীন গৌরবের কথা বলে বর্তমান ইতালীকে সে গৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্য প্ররোচিত করেছেন। প্রথম রাত্রির অভিনয় দেখে দর্শকরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রেক্ষাগৃহে এবং রাজপথে সেদিন শত শত কণ্ঠে ইতালীর জয় ধ্বনিত হল, শত শত হৃদয়ে ইতালীর হৃতগৌরব উদ্ধারের সঙ্কল্প মুদ্রিত হয়ে গেল। ফ্যাসিস্ত ইতালীর সূচনা হল সেদিন থেকে। ইতালীর সর্বত্র এই নাটক অভিনীত হয়ে দর্শকদের উন্মত্ত করে তুলল। এই উন্মত্ততা লক্ষ্য করে ইতালীর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অস্ট্রিয়া সরকারী ভাবে পেশ করল প্রতিবাদ-পত্র।

গ্যাব্রিয়েল ভাবলেন কেবল নাটক লিখে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। তিনি সুপারম্যান, ফ্যাসিস্তের প্রায় সগোত্র। তাই পার্লামেণ্টারী গভর্নমেণ্টে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। তথাপি পার্লামেণ্টের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি পার্লামেণ্টে এলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসায় তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতার প্রমাণ পাওয়া গেল। গ্যাব্রিয়েলের খ্যাতি আর সাহিত্য-পাঠকদের মধ্যেই নিবদ্ধ রইল না। ইতালীর সর্বত্র সকল স্তরের লোকদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ইতালীর নব জীবনের অগ্রদূত তিনি।

পার্লামেণ্টের নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মধ্যে সুপারম্যানের আদর্শে বিশ্বাসী গ্যাব্রিয়েল কাজ করবার বিশেষ সুযোগ পেলেন না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের পুজারী গিয়োলিত্তির সঙ্গে বিরোধ বাধল। এই সব কারণে রাজনীতি ত্যাগ করে গ্যাব্রিয়েল আবার সাহিত্য রচনায় মন দিলেন।

এই সন্ধিক্ষণে (১৮৯৭) রোমের গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাঁর আলাপ হল বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিওনোরা দিউসের সঙ্গে। এলিওনোরার অভিনয়ের খ্যাতি

য়ুরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইতালীর নাট্যজগতের মধ্যমণি সে। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এলিওনোরা উপলব্ধি করল, এই আমার কবি যার নাটকে অভিনয় করে আমি তৃপ্তি পাব। ভালো নাটকের দুর্ভিক্ষ। এখন সত্যিকার নাটক পাওয়া যাবে। আর গ্যাব্রিয়েল ভাবলেন, আমার নাটকের নায়িকাকে এতদিনে খুঁজে পেলাম। এর অভিনয়ে আমার নাটক জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এলিওনোরা কিছুই চায়নি গ্যাব্রিয়েলের কাছে। শুধু দিয়েছে। দিয়েছে নিজের দেহ মন অর্থ। আর উৎসাহিত করেছে নতুন নতুন নাটক লিখতে। নাটক একটার পর একটা ব্যর্থ হয়েছে। তাতে এলিওনোরার উৎসাহ ম্লান হয়নি। বরং তার জেদ বেড়েছে। সফল হবেই ; গ্যাব্রিয়েল ও সে নাট্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এলিওনোরার বয়স হল চল্লিশ। নেভার আগে সে জ্বলে উঠেছে। গ্যাব্রিয়েলের আত্মপ্রত্যয়, মানসিক শক্তি, সাহিত্য-প্রতিভা তাকে মুগ্ধ করেছে। গ্যাব্রিয়েলের সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্বে সে এক বন্ধুকে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিল, 'নারকীয় দান্নুনৎসিও'। আর এখন সে কারো সাবধান বাণীতে কান দেয় না। গ্যাব্রিয়েল তাকে উন্মত্ত করেছে।

এলিওনোরার প্রেরণায় গ্যাব্রিয়েল কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন। এদের মধ্যে Francesca ও The Daughter of Jorio বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। দান্তের 'ইনফার্নো'-তে ফ্রান্সেসকার কাহিনী আছে। মধ্যযুগের সেই অবৈধ প্রেমের কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল। রিমিনির অধিপতি গিওভানি মালাতেস্তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ফ্রান্সেসকার। স্বামীকে সে ভালো-বাসতে পারেনি : ভালোবাসল স্বামীর ছোট ভাই তরুণ পাওলোকে। এই অবৈধ প্রেমের কথা জানতে পেরে গিওভানি ওদের দু'জনকেই মৃত্যুদণ্ড দিল।

'দি ডটার অব জোরিও' নাটকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। জোরিওর কন্যা মিলা দি কাদ্রিও একদিন মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। কয়েকজন চাষী তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটে এল। মিলা ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিল অ্যালিগির বাড়ি। মিলা যখন এসে পৌছল তখন অ্যালিগি ও ভিয়েন্দার বিয়ে উপলক্ষে গুরুজনরা বর-ক'নেকে আশীর্বাদ করছিল। শীগগিরই ওদের বিয়ে হবে। অ্যালিগি অনুসরণকারীদের বাধা দিয়ে মিলাকে রক্ষা করল।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা গেল পর্বতের এক নির্জন গুহায় অ্যালিগি ও মিলা বাস করছে। ভিয়েন্দাকে ভুলে গেছে অ্যালিগি। সে এখন মিলার প্রেমে উন্মত্ত।

বাড়ি থেকে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে। ধরতে পারলে রক্ষা নেই। মিলা অ্যালিগিকে বলছে, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমার জন্য ভেব না। কিন্তু অ্যালিগি তাকে ছেড়ে যাবে না।

খুঁজতে খুঁজতে অ্যালিগির বাবা ল্যাজারো এসে উপস্থিত হল সেই গুহায়। তাকে ধরে বেঁধে বাড়ি পাঠানো হল। বাড়ি এসে অ্যালিগি বিষ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হল মিলাকে।

কয়েকজন কামোন্মত্ত লোকের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে একটি তরুণী ছুটছে—এমনি একটি ছবি দেখে এই নাটকের প্লট গ্যাব্রিয়েলের মনে এসেছিল।

এলিওনোরার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার শ্রেষ্ঠ ফল Il Fuoco (The Flame of Life) বা জীবন-শিখা। এলিওনোরার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাস। অবশ্য ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। এক অসাধারণ রমণীর আত্মোৎসর্গের কাব্যময় ইতিহাস। কিন্তু শুধুই বন্দনা নেই, আছে এক নারীর গোপন জীবনের উদ্ঘাটন। তাই এই বইয়ের প্রুফ কপি দেখে এলিওনোরার একান্তসচিব তাকে এসে বলল, এ বই লোকের হাতে পড়লে আপনার অপমানের সীমা থাকবে না। এখনি বন্ধ করুন এ বই।

এলিওনোরা একটু ভেবে বলল, বই বের হোক।

গ্যাব্রিয়েলের শিল্প-প্রতিভার আহুতি হিসাবে নিজের জীবন ও সম্মান অনায়াসে সে উৎসর্গ করতে পারে।

জনপ্রিয় অভিনেত্রীর জীবনের কাহিনী আছে বলে 'দি ফ্লেম অব লাইফ' প্রচুর বিক্রি হল। অল্পদিনের মধ্যেই য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হল এই উপন্যাস। 'দি ফ্লেম অব লাইফের' মতো ব্যবসায়িক সাফল্য গ্যাব্রিয়েলের আর কোনো বইয়ের হয়নি।

এর পরেই এলিওনোরা দিউসের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল গ্যাব্রিয়েলের কাছে। কোনো মেয়েই বেশিদিন তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। স্ত্রী মারিয়া চলে গেছে তাঁকে ত্যাগ করে। সাত বছর পরে গেল এলিওনোরা। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত সাত বছরের স্মৃতি রোমন্থন করবার প্রবৃত্তি নেই গ্যাব্রিয়েলের। হৃদয়ে যার স্থান নেই জীবন থেকে তাকে নির্মম ভাবে বিদায় করেন তিনি। ফিরে তাকাবার সময় নেই।

যে বাড়িতে তাঁরা এতদিন বাস করেছেন তার নাম কাপোনচিনা।

গ্যাব্রিয়েল তখন বাড়ি ছিলেন না। এলিওনোরা এক বন্ধুকে বলল, এ বাড়িতে আগুন দিতে পার ?

বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল, কেন ?

—এ বাড়িতে প্রেমের অপমান হয়েছে। অশুচি হয়েছে এ বাড়ি। এক মাত্র আগুন শুচিশুদ্ধ করতে পারে।

গ্যাব্রিয়েলের পরবর্তী প্রণয়িনীর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এলিওনোরাই একদিন চলে গেল অন্যত্র।

কাপোনচিনায় আগুন দেবার প্রশ্নই ওঠে না। এ বাড়িতে গ্যাব্রিয়েল গ্র্যাণ্ড মোগলের মতো বাস করেন। কুড়িজন ভৃত্য, ত্রিশ-চল্লিশটি কুকুর, ছ'শ কবুতর, জমকালো আসবাব-পত্র নিয়ে তাঁর বাস। শিল্পীদের সহায়তায় নিজের মতো করে সাজিয়েছেন সেই বাড়ি। তাঁর লেখার জন্য বিশেষভাবে তৈরী কাগজ আসে; পালকের কলম ছাড়া তাঁর লেখা হয় না। দিনে গোটা ত্রিশেক কলম লাগে। মৃত পাখির পালকের কলম তিনি স্পর্শ করেন না। তাঁর কলমের জন্য জীবন্ত পাখীর গা থেকে পালক ছিঁড়ে আনা চাই। দিনে তিন চার বার গ্যাব্রিয়েল প্রসাধন করেন। প্রতিদিন অডি-কোলোন লাগে এক পাইণ্ট করে।

আয়ের চেয়ে দশগুণ বেশি ব্যয়। যতদিন এলিওনোরা ছিল ততদিন ব্যয়ের বৃহৎ অংশ সেই বহন করত। সে চলে যাবার পর বিপদ দেখা দিল। দেনার বোঝা কেবল বেড়েই চলল। দেনার দায়ে নালিশ হল। গ্যাব্রিয়েলের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী গিওলিত্তির গভর্নমেণ্ট লেখক বলে তাঁকে খাতির করল না। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে সরকারের লোক এসে অমন সাজানো বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব নীলামে বিক্রি করে দিল। গ্যাব্রিয়েলকে আদালত থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্যাব্রিয়েলের এখন দুঃসময়। আর্থিক অনটন তো আছেই, তার উপর ইতালীর ক্যাথলিক সমাজ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছে। অন্য শত্রুর সংখ্যাও কম নয়। গ্যাব্রিয়েলের রচনাবলী পোপের নিষিদ্ধ অশ্লীল পুস্তকের তালিকায় উঠেছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য গ্যাব্রিয়েল ইতালী ত্যাগ করে ফ্রান্সে এলেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হল। পর বৎসর মে মাস পর্যন্ত ইতালী নিরপেক্ষ ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকেই গ্যাব্রিয়েল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

পড়বার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। ফরাসী সরকার তাঁকে পরামর্শ দিল দেশে গিয়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য ইতালীকে উদ্বুদ্ধ করতে। গ্যাব্রিয়েল ইতালীতে ফিরে কবিতা লিখে, বক্তৃতা করে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইতালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ আসবে। জনসাধারণের মনোভাব বুঝতে পেরে ১৯১৫ সালের ২৪শে মে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ইতালিয়ান গভর্নমেণ্ট।

যুদ্ধ গ্যাব্রিয়েলের নিকট শুধু স্বাদেশিকতা ছিল না। যুদ্ধের আকর্ষণ তাঁর কাছে অনেকটা রোমাণ্টিক ছিল। যুদ্ধ সুপারম্যানকে আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি সৈনিক হিসাবে নাম লেখালেন। কিন্তু পঞ্চাশোত্তীর্ণ এই যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে কর্তৃপক্ষের আপত্তি। গ্যাব্রিয়েল নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সম্মতি পেলেন। পঞ্চাশটিরও অধিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন তিনি। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে বিমানযুদ্ধ ছিল বিশেষ বিপজ্জনক। গ্যাব্রিয়েল সেই বিপদ জোর করে বরণ করেছেন। বিমানযুদ্ধে একটি চোখ তাঁকে হারাতে হয়েছে। তবু ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য করে আবার তিনি বিমানে উঠে যুদ্ধ করেছেন।

যুদ্ধ শেষ হল। এতদিনের উন্মাদনার পর গ্যাব্রিয়েল অবসাদ বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু শীগ্‌গিরই আর একটি ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। ত্রিয়েস্ত থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছোট ফিউম (Fiume) বন্দর। যুদ্ধের পূর্বে ছিল অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধের পরে মিত্র সৈন্যের তাঁবেদারে আছে। গ্যাব্রিয়েল বললেন, এ বন্দর ইতালীরই প্রাপ্য, কারণ অধিবাসীদের অধিকাংশই ইতালিয়ান। মিত্রশক্তিকে অসন্তুষ্ট করবার ভয়ে ইতালিয়ান সরকার এ দাবি সমর্থন করে না। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল ঘুরে ঘুরে ফিউমের উপর ইতালীর দাবি প্রচার করতে লাগলেন। এবার শুধু বক্তৃতা নয়; নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯১৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি প্রায় তিনশ' অনুচর নিয়ে যাত্রা করলেন ফিউম অধিকার করতে। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। দলে দলে লোক এসে যোগ দিতে লাগল তাঁর সঙ্গে।

এক বিরাট বাহিনী নিয়ে গ্যাব্রিয়েল ফিউমের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হলেন। মিত্র সেনার অধিকাংশই ছিল ইতালিয়ান। স্বদেশবাসী অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে কিনা এই নিয়ে তাদের মনে দ্বিধা দেখা দিল। অনিশ্চয়তার সুযোগে সদলবলে গ্যাব্রিয়েল নগরে প্রবেশ করে ফিউম অধিকার করলেন।

বিংশ শতাব্দীর রূপকথা। একজন লেখক সরকারের সমর্থন লাভ না করেও শুধু নিজের চেষ্টায় ও সংগঠন শক্তিতে একটি নগর দখল করলেন। অবিশ্বাস্য; কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। যখন ইতালীতে এ সংবাদ এসে পৌঁছল তখন প্রধানমন্ত্রী নিত্তিও এ খবর বিশ্বাস করতে পারেন নি।

অল্প কয়েকজন ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য শহর ত্যাগ করবার পর ফিউমে গ্যাব্রিয়েলের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। একজন কবি যে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নতুন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র থেকে। শাসনতন্ত্রেও আছে সৌন্দর্যের আহ্বান। শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে: 'Life is beautiful. It is worthy to be lived magnificently and severely, by man re-established in all his integrity by Liberty....The act of work, even the most humble, the most obscure, if well-executed, tends towards Beauty, and thus adorns the world....'

অসবার্ট সিটওয়েল গ্যাব্রিয়েলের শাসনাধীন ফিউম বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিউমের শাসনতন্ত্রের এবং শাসনকর্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মিত্র-শক্তির অবরোধের ফলে ফিউমের বিপদ ঘনিয়ে এল। খাদ্য ও অর্থের অনটন। গ্যাব্রিয়েলের অনুচরেরা লুঠ করে টাকা আনতে আরম্ভ করল। জাহাজ ধরে আনতে লাগল ফিউমের বন্দরে। সেই সব দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার যোগ্য।

ফিউম রাষ্ট্র সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তোলবার পূর্বেই মিত্র-শক্তি এসে আক্রমণ করল। ফিউমের প্রত্যেক নরনারী গ্যাব্রিয়েলের নেতৃত্বে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন প্রতিরোধ চললে ফিউম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে তখন তিনি ফিউম ত্যাগ করে ইতালী চলে এলেন (ডিসেম্বার, ১৯২০)। গ্যাব্রিয়েলের উদ্দেশ্য পরে সফল হয়েছিল। ইতালী পেয়েছিল ফিউমের কর্তৃত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়া এই বন্দর পেয়েছে।

১৮৯৮ সালে রচিত 'লা গ্লোরিয়া' নাটকে গ্যাব্রিয়েল রাগেরো ফ্লামা নামে এক ডিক্টেটরের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্র বেনিতো মুসোলিনীর পূর্বাভাস। মুসোলিনী ইতালীর কর্তৃত্ব পাবার পর গ্যাব্রিয়েল রাজসম্মান লাভ করেছেন। গ্যাব্রিয়েল ছিলেন ফ্যাসিবাদের সমর্থক। ১৯২৪ সালে মুসোলিনী তাঁকে 'প্রিন্স অব মন্তে নেভোসো' উপাধিতে ভূষিত করেন। সরকারী উদ্যোগে গ্যাব্রিয়েলের রচনা-সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের ১লা মার্চ গ্যাব্রিয়েলের মৃত্যু হয়। বিখ্যাত পিয়ানোবাদিকা লুইসা বাকারা তাঁকে সেবা করবার জন্য ১৯৩৭ সালে পিয়ানো বাজানো ত্যাগ করে তাঁর বাড়ি চলে এসেছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তিনি মৃত্যু সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কথা ভাবতেন। কখনো ভাবতেন কামানের সামনে তিনি মারা যাবেন। কখনো ভাবতেন, কোনো আশ্চর্য রাসায়নিক পদার্থ পান করে অদৃশ্য হয়ে পড়বেন। সে সব কিছুই হল না। টেবিলে বসে পালকের কলম দিয়ে লিখতে লিখতে তাঁর মৃত্যু হল। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ তাঁর মৃত্যুর কারণ।

গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ মিলিয়ে গ্যাব্রিয়েল প্রায় পঞ্চাশটি বই লিখেছেন। তাঁর রচনা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর রচনায়—বিশেষ করে কতকগুলি নাটকে—তিনি ইতালীর নবজীবনের উদ্গাতা। ফ্যাসিস্ত ইতালীর পূর্বাভাষ পাওয়া যায় তাঁর নাটকে। অন্য শ্রেণীর রচনায়,—প্রধানত কাব্য ও উপন্যাসে, তিনি রোমান্টিক ও অবক্ষয়ধর্মী। নীটশে শোপেন-হাউয়ার বোদ্‌লেয়ার অস্কার ওয়াইল্ডের রচনাবলী ও জীবনদর্শন ছিল তাঁর আদর্শ। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে যে ধারা শেষ হয়ে গেছে তিনি বিংশ শতাব্দীতে তাকে নতুন করে প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। গ্যাব্রিয়েলের দুর্ভাগ্য, তিনি সময়ের পরে এসেছেন। তথাপি প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও বিপ্লবী মনোবৃত্তির জন্য তাঁর রচনা য়ুরোপের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। আধুনিক ইতালীর তিনিই প্রথম লেখক যাঁর লেখা ইতালীর বাইরে সমাদর পেয়েছে। পাঠকের নিকট তাঁর বিপ্লবী জীবন ও তাঁর রচনা অবিচ্ছেদ্য ছিল বলে তাদের আকর্ষণ বেড়েছে। লেনিন থার্ড ইণ্টারন্যাশন্যালে ঘোষণা করেছিলেন যে, ইতালীতে প্রকৃত বিপ্লবী মাত্র একজন আছেন, তিনি গ্যাব্রিয়েল দান্নুন্‌ৎসিও।

গভীর সৌন্দর্যবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাব্যময় প্রকাশ, বিকৃত কামনার অতৃপ্তি, গ্যাব্রিয়েলের রচনার বৈশিষ্ট্য। আর আশ্চর্য তাঁর ভাষা। গ্যাব্রিয়েলই আধুনিক ইতালিয়ান ভাষায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। বক্তব্য যাই হোক, ভাষার গুণে পাঠক মুগ্ধ হয়ে থাকে। অনুবাদে ভাষার সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না।

গ্যাব্রিয়েলের সব রচনাই জ্বরতপ্ত মস্তিকে লিখিত। সে জ্বর বিপ্লবের এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার। তিনি মানবদেহের চিত্রকর; মানুষের অন্তরে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয়নি। তাই গ্যাব্রিয়েলের রচনা অতৃপ্তি ও অস্থিরতায় পূর্ণ। এই সম্বন্ধে গ্যাব্রিয়েল সচেতন ছিলেন। এর কারণও জানতেন। গ্যাব্রিয়েল নিজেই শেষ জীবনে বলে গেছেন: I was ill with the desease called 'women.'

ইনিয়াৎসিও সিলোনে

১৯০০—

গণতন্ত্রের যুগে কোনো নাগরিকই রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় দেশ শাসন করবার অধিকার একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল লাভ করে। শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের আদর্শ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরোধিতা এবং নির্বাচনের দ্বন্দ্ব দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সর্বদা সরগরম করে রাখে। সংবাদপত্র প্রত্যহ রাজনৈতিক উত্তেজনা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। জীবনে যখন রাজনীতির এত প্রভাব তখন সাহিত্যেও তার ছায়া পড়া স্বাভাবিক। সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিফলন। রাজনীতি শুধু প্রবন্ধ ও পত্রিকা-সাহিত্যকেই প্রভাবান্বিত করেনি, উপন্যাস-সাহিত্যেও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। উপন্যাস প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়ে। সাহিত্যের এই জনপ্রিয় অঙ্গটিকে অনেক লেখক চিত্ত-বিনোদন ছাড়াও সমাজ-সংস্কার, ধর্ম ও রাজনীতির কথা বলবার জন্য ব্যবহার করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, রাজনৈতিক উপন্যাসের একটি বিশেষ শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এ-সব উপন্যাসে শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা অপেক্ষা লেখকের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। কোথাও একটি বিশেষ মতবাদের সমর্থন, কোথাও বা তার বিরোধিতা কাহিনীর উপজীব্য।

বর্তমান ইতালীর অন্যতম ঔপন্যাসিক ইনিয়াৎসিও সিলোনের (Ignazio Silone) রচনাকে সাধারণতঃ রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তবু তাঁর রচনার সঙ্গে এই শ্রেণীর অন্যান্য উপন্যাসের পার্থক্যটা স্পষ্টই ধরা পড়ে। সিলোনে কম্যুনিজমের বিরোধী, কিন্তু তাই বলে অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তিনি জীবন সার্থক হবার ইঙ্গিত খুঁজে পাননি। বরং নীতিবোধ ও ধর্মবোধ থেকে বিযুক্ত কোনো রাজনীতিক পন্থাই মঙ্গলপ্রদ হতে পারে না, সিলোনের উপন্যাসে এই সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়। নীতি ও ধর্মের প্রতি এই আকর্ষণের জন্য তাঁর রচনা রাজনীতি-সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি।

এই বৈশিষ্ট্য সিলোনের রচনাকে হয়ত সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে স্থান নির্দেশ করতে সাহায্য করবে।

সিলোনের আসল নাম Secondo Tranquilli; কিন্তু এ নাম আজ কেউ জানে না। ইতালীর ক্ষুদ্র শহর পেসিনায় ১৯০০ সনের ১লা মে সিলোনে জন্মগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে তাঁর জন্ম হওয়াটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সিলোনের জীবন কেটেছে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। তিনি কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছেন, অত্যাচার উৎপীড়ন সয়েছেন; এবং দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে দীর্ঘকাল তাঁকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের কাহিনী আত্মজীবনীমূলক এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্পর্শে জীবন্ত।

সিলোনের পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র তালুকদার। এত ছোট যে সাধারণ চাষীর মতো তাঁকে জমি চাষ করতে হত। স্বামীকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মা-ও কঠোর পরিশ্রম করতেন। ঐ অঞ্চলের জমির উর্বরা শক্তি ছিল কম। চাষীরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেত না। তার উপর ছিল বন্যা ও ভূমিকম্পের বিপদ। চাষীদের পশুর মতো জীবন ছেলেবেলাতেই সিলোনের মন গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। জনগণের দুর্দশার কথা তিনি বই পড়ে শেখেন নি; দেখেছেন নিজের চোখে। তাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের ভালোবেসেছেন। যে শাসনতন্ত্র কৃষকদের দুর্দশা দূর না করে তাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প সিলোনে কিশোর বয়সেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা এই সঙ্কল্পকে আরও কঠোর করে তুলতে সাহায্য করেছিল। সিলোনের বয়স যখন মাত্র পনেরো তখন প্রবল ভূমিকম্পে পেসিনা বিধ্বস্ত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারায়। সিলোনের দু' ভাই এবং মা ভূমিকম্পে মারা যান। অবশিষ্ট এক ভাই ফ্যাসিস্তদের নির্মম প্রহারের ফলে জেলখানায় প্রাণ ত্যাগ করে।

সিলোনে ক্যাথলিক স্কুলে শিক্ষালাভ করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা সমাপ্ত করে পাদ্রি হবার। স্কুলের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি সিলোনে। না যাবার কারণ দু'টি। প্রথমত তাঁর স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে তিনি বেশি দিন বাঁচবেন বলে ডাক্তারদের ভরসা ছিল না। দ্বিতীয়ত যে শক্তি ও সময় তাঁর ছিল তার সবটুকুই কৃষক আন্দোলনে ব্যয় করতেন। উচ্চশিক্ষার চেয়ে কৃষকদের ভাগ্যোন্নতি অনেক বড় ছিল তাঁর কাছে।

১৯১৭ সনে সিলোনে পেসিনার কৃষক সমিতিতে যোগদান করেন এবং মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে আব্রাৎসি জেলার জমি-মজুর সংঘের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ওই বৎসরই তিনি একদল সমাজবাদী যুবকের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী প্রচার আরম্ভ করেন। দলের মুখপত্র 'অগ্রণী'-র সম্পাদক ছিলেন সিলোনে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র ভাষায় তিনি যুদ্ধের নিন্দা করেছেন। ১৯২২ সনে 'মজদুর' পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ল তাঁর উপর। অল্প দিনের মধ্যেই এই পত্রিকা ফ্যাসিস্ত সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ল। ফ্যাসিস্ত সমর্থকরা 'মজদুর' পত্রিকার আপিস আক্রমণ করে ছাপাখানা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলল।

ফ্যাসিস্ত সরকারের হাতে জীবন বিপন্ন বুঝে সিলোনে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন। গোপনে স্বদেশে ফিরে এলেন ১৯২৫ সনে। তিন বৎসর ধরে তিনি কৃষকদের মধ্যে গোপনে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন চালাতে লাগলেন। সিলোনে তখন কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য। সাম্যবাদের আদর্শে তাঁর ছিল অন্ধ বিশ্বাস। ১৯২১ সনে তিনি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। ১৯২৮ সনের পর ইতালীতে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফ্যাসিস্ত সরকারের হাত এড়িয়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে আসবার ফলে সিলোনের মনে সংশয় জাগল। রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় যে-সব আন্দোলন হয় তারা কি সত্যি জনগণের কল্যাণ করতে পারে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীরা গণসেবক নয়, কোনো রাজনৈতিক দলের অন্ধ ভক্ত মাত্র। এদের দেশের মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই, তাদের গভীর-ভাবে ভালোবাসে না, শুধু একটা পুঁথিগত রাজনৈতিক মতবাদ অনুসরণ করে চলে। অনেক সময় পার্টির নির্দেশ একনায়কত্বের নামান্তর মাত্র। কম্যুনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সিলোনের মোহমুক্তি ঘটল। তিনি সকল দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এর ফলে তাঁর শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল, আততায়ীর হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু সিলোনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নি।

রাজনীতির আবর্ত থেকে দূরে চলে আসবার ফলে তাঁর পক্ষে সাহিত্য রচনায় হাত দেওয়া সম্ভব হল। ১৯৩০ সনে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন; সে বছরই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ফন্টামারা' প্রকাশিত হয়। এক বৎসরের মধ্যে সতেরোটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বইটির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

একটি দরিদ্র গ্রামের নাম ফন্টামারা। দরিদ্রতম কৃষকদের বাস এখানে। কিন্তু এরাও ফ্যাসিস্ত কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল না। গ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র একটা নদী বয়ে যায়; তার জল দিয়ে সামান্য চাষাবাদ করা চলে। এক জমিদার নিকটেই কিছু জমি কিনল। নিজের জমিতে চাষের যাতে সুবিধা হয় সে জন্য ফ্যাসিস্ত সরকারের কর্মচারীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জলের গতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করল জমিদার। আর তাকে সাহায্য করল একজন সরকারী কর্মচারী। কর্মচারী কৃষকদের প্রতারিত করে সম্মতি-পত্রে সই করিয়ে নিল। পরে ভুল বুঝতে পেয়ে তারা প্রতিকারের আশায় গেল সদরে। কিন্তু সেখানে জনগণের বন্ধু সেজে এক উকীল তাদের ঠকালো।

গ্রামের কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। তা দমন করবার জন্য ফ্যাসিস্ত মিলিশিয়া বার বার গ্রাম আক্রমণ করে বাড়ি-ঘর ধ্বংস করল এবং মেয়েদের উপর করল অমানুষিক অত্যাচার। এই উৎপীড়নের সংবাদ শুনে রোম থেকে এক রহস্যময় অপরিচিত যুবক ফন্টামারায় এল কৃষকদের রক্ষা করতে। সে যে আন্দোলন শুরু করল তার ফলে কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকল না। ফ্যাসিস্ত বাহিনী আন্দোলন দমন করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করল; অনেক লোক প্রাণ হারাল, সম্পত্তি ধ্বংস হল। যারা বেঁচে রইল তাদের মনে প্রশ্ন জাগল : এত সংগ্রাম, রক্তপাত ও অত্যাচারের পরে আমরা কি পেলাম? অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলে অত্যাচার আরও তীব্র হয়ে ওঠে, জনগণের দুর্দশার শেষ থাকে না। এ-সব আন্দোলনে নেতৃত্ব করা যাদের পেশা তারা এদিকটা কখনও ভেবে দেখে না। ভবিষ্যতে শান্তি আসবে এই আশায় দুঃখ ভোগ করা যায়, সাধারণতঃ এই যুক্তি দিয়ে আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সত্যি শান্তি আসবে, আজ যার জন্য দুঃখ ভোগ করছি তা সত্যি পাওয়া যাবে, এমন প্রতিশ্রুতি কোথায়? অত্যাচার অবিচার ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিংসা ও রক্তপাত কেন হবে? আর কি কোনো পথ নেই? যে অত্যাচারিত, তাকে বেদনার মূল্য দিয়ে প্রতিকার লাভ করতে হবে কেন? সিলোনে 'ফন্টামারা'-য় যে প্রশ্ন করেছেন তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও সেই জিজ্ঞাসা বার বার এসেছে। এই প্রশ্ন ও তার উত্তর খোঁজাটাই সিলোনের রচনার সবচেয়ে বড় কথা।

সিলোনের পরবর্তী উপন্যাস Bread and Wine শিল্পকর্ম হিসাবে অনেক

বেশি উন্নত। 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইন'-এর নায়ক পিয়েত্রো স্পিনার সঙ্গে সিলোনের অনেক মিল আছে। সিলোনের ব্যক্তিগত জীবন এই উপন্যাসটিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে।

মুসোলিনী তখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। ইতালীর ফ্যাসিস্ত বাহিনী আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে চলছে কঠোর দমননীতি। ইতালীর কৃষক, মজুর ও বুদ্ধিজীবী নাগরিকরা মুসোলিনীর কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। এমন সময় নির্বাসন থেকে গোপনে ইতালীতে ফিরে এল পিয়েত্রো স্পিনা। স্পিনা মুসোলিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে। ইতালীতে থাকা তার পক্ষে যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো তখন সে দেশ ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছিল। গোপনে আবার ফিরে এসেছে। স্পিনার বয়স মাত্র ত্রিশ। কিন্তু তাকে দেখায় বৃদ্ধের মতো। আত্মগোপনের সুবিধা হবে বলে অধিক মাত্রায় আইওডিন ব্যবহার করে শরীরের এই অবস্থা করেছে। কিন্তু গুপ্ত জীবনের অত্যাচার তার দেহ বেশিদিন সইতে পারল না। এক কৃষকের গৃহে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। যে ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য ডেকে আনা হল সে ছিল স্পিনার সহপাঠী। ডাক্তার সাক্কা স্পিনাকে চিনতে পারল। প্রথম ভয় হল চিকিৎসা করতে গিয়ে না জানি ফ্যাসিস্তদের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে ডাক্তার স্পিনাকে সুস্থ করে তুলল ; সংগ্রহ করে দিল পাদ্রির পোশাক। স্পিনা ভ্রাম্যমাণ পাদ্রি সেজে ইতালীর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পাদ্রির ছদ্মবেশ গ্রহণ করায় স্পিনা দেশকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ পেল। আগে তার কাছে লোক আসত শুধু রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। রাজনৈতিক দলের নেতা বলে অনেকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখত। এখন পাদ্রি মনে করে সবাই তাকে মনের কথা খোলাখুলি ভাবে বলে, একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আপনি এসে যায়। দু'টি পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের মেয়ে স্পিনার প্রতি আকৃষ্ট হল। একজন বিয়ান্‌চিনা, আর একজনের নাম ক্রিস্টিনা। বিয়ান্‌চিনার আকর্ষণ দেহসর্বস্ব ; ক্রিস্টিনা ঠিক এর বিপরীত। দেহের দাবি সম্বন্ধে সে উদাসীন, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সে উৎসুক। এই দুই ভিন্নমুখী নারীচরিত্রের সংস্পর্শে স্পিনার সম্মুখে বৃহত্তর জগতের ছবি ভেসে উঠল। এতদিন সে রাজনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অন্ধ হয়ে ছিল। এখন সে সমগ্র জীবনকে দেখতে পেয়েছে ;

মানুষের প্রেম, আশা, আকাজ্ক্ষার কথা যেন এই প্রথম অনুভব করল। স্পিনা নিজেকে প্রশ্ন করল, পার্টির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থেকে কি কেউ অকৃত্রিম জীবন যাপন করতে পারে? জীবনের সত্যকে উপেক্ষা করে পার্টির স্বীকৃত সঙ্কীর্ণ সত্যকে গ্রহণ করতে হয়; সর্বযুগের মহৎ ন্যায়বোধকে অগ্রাহ্য করে পার্টি যা ন্যায় বলবে তা মানতে হয়। জীবন যদি বিকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ না করে, জীবন যদি সঙ্কুচিত হয়ে পার্টির কারাগারে আবদ্ধ হয়, তা হলে এত দুঃখ ভোগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় লাভ কি?

স্পিনার মনে দ্বিধা জেগেছে, কিন্তু এতদিনের বিশ্বাস থেকে হঠাৎ মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। এই দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্য সে আরও উৎসাহের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করল। ফ্যাসিস্ত গুপ্তচরদের হাতে স্পিনার বিপদ ঘনিয়ে এল: আত্মরক্ষার জন্য সে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করল। এই বিপদের দিনে বিয়ান্‌চিনা তার খোঁজ করল না; রোমের এক কুখ্যাত অঞ্চলে সে তখন দেহের পণ্য সাজিয়ে বসেছে। কিন্তু ক্রিস্টিনা ভোলেনি; সে স্পিনার সন্ধানে পর্বতের গভীর বনে ঘুরতে লাগল। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নেকড়ে বাঘের আক্রমণে ক্রিস্টিনা প্রাণ হারালো।

ক্রিস্টিনার শোচনীয় মৃত্যু দিয়ে কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে। এই পরিণতিটা ইঙ্গিতময়। ক্রিস্টিনার বিশ্বাস ছিল আত্মার শক্তিতে, জীবনের স্থূল দিকটা তাকে আকর্ষণ করেনি। অথচ তার অপমৃত্যু ঘটল, বিয়ান্‌চিনা বেঁচে রইল। ক্রিস্টিনা জীবনে যা-কিছু সত্য ও মহৎ তার প্রতীক। ক্রিস্টিনার মৃত্যু পাঠকের মনে এই আশঙ্কা এনে দেয় যে, রাজনীতির বিষাক্ত আবহাওয়ায় সত্য আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

সিলোনে স্পিনার জীবন টেনে এনেছেন তাঁর পরবর্তী উপন্যাস The Seed Beneath the Snow-এর মধ্যে। 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইন' যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে। স্পিনা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করল: A man who is spiritually a slave cannot work for the true freedom. এই উপলব্ধির ফলে তার পক্ষে পুঁথিগত রাজনৈতিক মতবাদের মোহ ত্যাগ করে পার্টির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হল। স্পিনা ও জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতির যে প্রাচীর ছিল তা গেল দূর হয়ে। এবার সে দেশের মানুষকে নিবিড় ভাবে ভালবাসতে পেরেছে। স্পিনা সানন্দে আবিষ্কার করল, গ্রামের সাধারণ লোকের হৃদয় এখনো শুকিয়ে

যায়নি। নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবার বীজ এখনও বেঁচে আছে তাদের মধ্যে। শুধু উৎপীড়নের ফলে অঙ্কুরোদ্গম হতে বিলম্ব ঘটছে। সিলোনে আশার বাণী শুনিয়েছেন; সত্য একদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্পিনা সবাইকে ভালোবাসতে পেরেছে। তাই অন্য একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সানন্দে সে মৃত্যু বরণ করল। এই আত্মত্যাগের মধ্যে স্পিনার চরিত্রের মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

সিলোনের রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় স্পষ্ট করে পাওয়া যায় The School for Dictators নামক গ্রন্থে। স্পষ্ট করে বলছি এই কারণে যে, এখানে মতবাদ প্রকাশের জন্য গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সাহায্যে সিলোনে ফ্যাসিজম এবং ডিক্টেটরশিপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের করায়ত্ত তাদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান থাকলেই কল্যাণ করা সম্ভব হয় না: 'a genuine knowledge of social reality does not suffice if it is not supported by a strong moral sense.'

রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে জনসাধারণের মঙ্গলবিধান কঠিন হয়ে পড়েছে: 'Machines, which ought to be man's instrument, enslave him, the state enslaves society, the bureaucracy enslaves the state, the church enslaves religion, parliament enslaves democracy, institutions enslave justice, academies enslave art, the army enslaves the nation, the party enslaves the cause, the dictatorship of the proletariat enslaves Socialism.' এই পাপচক্র থেকে নীতিবোধ ও ধর্মবোধই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

সিলোনে একটিমাত্র নাটক লিখেছেন,—And He Hid Himself. 'ব্রেড অ্যাণ্ড ওয়াইনে'-র একটি ঘটনাকে এখানে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে, এই হল নাটকের মূল প্রতিপাদ্য।

সিলোনের পরবর্তী উপন্যাস হল A Handful of Blackberries. ইঞ্জিনিয়ার রক্কো ইতালীয় দরিদ্র কৃষকদের জন্য গভীর মমতা বোধ করত। তাদের মঙ্গল করতে পারবে মনে করে সে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল।

কম্যুনিস্ট আদর্শে তার ছিল অন্ধ বিশ্বাস; পার্টির জন্য প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে। বছরের পর বছর পার হয়ে গেল, তবু ইতালীর দরিদ্র জন-সাধারণের দুর্ভাগ্য যখন দূর হল না, এবং পার্টির মধ্যে একনায়কত্ব যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন রক্কো কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করল। তার ফলে রক্কোর জীবনে এল দ্বন্দ্ব। ইহুদী তরুণী স্টেলাকে সে ভালোবাসে। রক্কো কম্যুনিজমের আদর্শে আস্থা হারালেও স্টেলা তার বিশ্বাস হারায় নি। সে পার্টির সভ্য রয়ে গেল। আদর্শের সংঘাতের ফলে হৃদয়ের সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠল। কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। স্টেলারও পার্টি সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটল। এরপরে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে আর বাধা রইল না। এই উপন্যাসে সিলোনে অনেকটা প্রচারধর্মী হয়েছেন বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় এখানে তাঁর শিল্পপ্রতিভা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সিলোনে তাঁর প্রায় সকল গ্রন্থই সুইজারল্যাণ্ডে রচনা করেছেন। ফ্যাসিস্ত সরকারের পতনের পর ১৯৪৪ সনে তিনি স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সিলোনে এখন নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদে আস্থাবান।

লেখক হিসাবে সিলোনের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তিনি অনায়াসেই বর্তমান পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক হতে পারতেন। কিন্তু মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমলে জীবন আরম্ভ হওয়ায় তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিতে পারেন নি।

আলবার্তো মোরাভিয়া

১৯০৭—

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের লেখকরা স্বদেশের গণ্ডির বাইরে যেরূপ খ্যাতি লাভ করেছেন ইতালীর আধুনিক লেখকদের বেলায় তা হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম পিরান্দেল্লো। কিন্তু নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অনেক সাহিত্যিক অপেক্ষা তাঁর খ্যাতির গণ্ডি সঙ্কীর্ণ। ইনিয়াৎসিও সিলোনের নামও ইতালীর বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। তার প্রধান কারণ হয়ত সিলোনের রাজনীতি-প্রবণতা। আধুনিক ইতালিয়ান সাহিত্য যে বাইরে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কারণ কি? প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত, ইতালিয়ান লেখকরা স্বভাবত যা প্রত্যক্ষ করেন তা নিখুঁতভাবে হুবহু ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসেন। ইতালীর দরিদ্র চাষী, ধনী জমিদার, প্রতিপত্তিশালী পাদ্রি—এদের জীবনের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও লালসা-ভালোবাসার কথা যথাযথরূপে বর্ণনা করাই লেখকদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনে তাঁরা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে ইতালীর জীবনের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য তাঁরা যত্নবান হননি। ইতালীর ছবির উপর যে রঙ একটু বুলিয়ে দিলে সর্বজনীন অনুভূতি জাগ্রত করা সম্ভব ছিল, তার অভাব বিদেশে ইতালিয়ান সাহিত্যের জনপ্রিয়তা লাভের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ, মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমল। ১৯২২ থেকে শুরু করে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত লেখকদের চিন্তার স্বাধীনতা ছিল না। ফ্যাসিবাদের সঙ্কীর্ণ জানালা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই ছিল জীবনের সীমানা। তার বাইরে নিষিদ্ধ এলাকা। সুতরাং প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি নিয়েই লেখকদের সন্তুষ্ট থাকতে হত। ঘরের জীবনকে বাইরে প্রসারিত করবার, অথবা বাইরের জীবনকে ঘরে আহ্বান করবার স্বচ্ছন্দ অধিকার তাঁদের ছিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইতালিয়ান সাহিত্য এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। বন্ধনমুক্তির আনন্দে বর্তমান সাহিত্য উজ্জ্বল। পৃথিবীর বৃহত্তর জীবনধারা এবং জীবন-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে অধুনাতম লেখকরা আর উদাসীন নন।

এই জন্য যুদ্ধপরবর্তী ইতালিয়ান সাহিত্য সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পেরেছে। জনপ্রিয়তা অর্জনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আলবার্তো মোরাভিয়ার। যদিও মোরাভিয়ার প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে ১৯২৯ সনে, তবু ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছে গত সাত-আট বছরের মধ্যে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে; এবং এদের প্রচার-সংখ্যা বিপুল জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য শুধু প্রচার-সংখ্যার উপরে মোরাভিয়ার খ্যাতি নির্ভর করে না। তিনি যে একালের একজন বিশেষ শক্তিশালী ঔপন্যাসিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আলবার্তো মোরাভিয়ার আসল নাম Alberto Picherle; কিন্তু ছদ্মনামেই তিনি পরিচিত, তাঁর পিতৃদত্ত নাম ঘনিষ্ঠ মহল ছাড়া কারও জানা নেই। ১৯০৭ সনে রোম নগরীতে মোরাভিয়ার জন্ম হয়। নয় থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ক্রমাগত তাঁকে অসুখে ভুগতে হয়েছে। স্বাস্থ্য এত খারাপ ছিল যে, তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কখনো সম্ভব হয়নি। ষোল বৎসর বয়সে রোগ খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় মোরাভিয়াকে স্বাস্থ্যাবাসে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে একটি ভালো লাইব্রেরি ছিল। মোরাভিয়া বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল বই পড়তেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষা শিখতেও আরম্ভ করলেন। এবং ওই স্বাস্থ্যাবাসে মাত্র সতেরো বছর বয়সে লিখতে আরম্ভ করলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস The Indifferent Ones.

ইতালীর দু'টি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে মোরাভিয়ার কর্মজীবন শুরু হয়। বিদেশী ভাষার জ্ঞান তাঁকে এই কাজে সহায়তা করেছিল। কার্যোপলক্ষে মোরাভিয়াকে লণ্ডন, প্যারিস ও অন্যান্য বহু স্থানে ঘুরতে হয়েছে। ফ্যাসিস্ত আমলের শেষের দিকে মোরাভিয়ার রচনা নিষিদ্ধ করা হয়; তার ফলে তিনি ছদ্মনামে লিখতে আরম্ভ করেন। ইতালী জার্মান অধিকারে আসবার পর থেকে ১৯৪৪ সনের মে মাস পর্যন্ত মোরাভিয়াকে পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে।

মোরাভিয়ার স্ত্রী এলসা মোরান্তেও ইতালীর একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখিকা।

মোরাভিয়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দু'-তিন ঘণ্টা লিখে থাকেন। দু' ঘণ্টার কম কখনো নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Woman of Rome দৈনিক পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখে একশ' দিনে শেষ করেছেন। মোরাভিয়া বলেন, মানুষের কাজ ও জীবন দুই-ই থাকা চাই। তা না হলে সে সম্পূর্ণ হতে পারে না। জীবন

অর্থ তাঁর কাছে অবসর। অবসর না পেলে কোনো মানুষেরই নিজস্ব চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না, এবং মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় তার অবসর যাপনের পদ্ধতি থেকে।

দুপুর একটার মধ্যে মোরাভিয়ার লেখার কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়েন রোমের রাজপথে। মোরাভিয়া রোমের বাসিন্দা। রোমের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি। তাঁর প্রায় সকল গল্প-উপন্যাসের পট-ভূমিকা রোম এবং পাত্র-পাত্রীরাও রোমের নাগরিক। বিকেলবেলা নাগরিকেরা কেউ ঘরে বসে থাকে না। রোমের রাজপথই নাগরিকদের বিকেলবেলার ড্রইং রুম। মোরাভিয়া পথে পার্কে রেস্তোরাঁয় ঘুরে ঘুরে রোমের জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন।

এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য মোরাভিয়ার উপন্যাসে রোমের জীবনের একান্ত বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাস্তবপন্থী লেখকের রচনায় নিখুঁত ছবিটাই মুখ্য, কাহিনী গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু মোরাভিয়ার রচনায় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত এবং গল্পের আকর্ষণ দুই-ই আছে। তাঁর গল্প বলবার রীতি এবং সাবলীল সংযত ভাষা পাঠকদের প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে রাখে। মোরাভিয়া তাঁর পাত্র-পাত্রীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ করেছেন; কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকের মতো করেন নি। আপাতদৃষ্টিতে যাদের ঘৃণা করা স্বাভাবিক, তাদের উপরও মোরাভিয়ার গভীর সহানুভূতি। লেখকের এই দরদ পাঠকদেরও সহানুভূতিশীল করে তোলে। উচ্ছৃঙ্খল তরুণ, ঈর্ষাজর্জর স্বামী, যশঃপ্রার্থী হতাশ লেখক এবং পতিতার অন্তরে প্রবেশ করে পাঠকরা এদের একটি নতুন রূপ দেখতে পায়।

মোরাভিয়ার রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রথম উপন্যাস The Indifferent Ones-এর মধ্যেই দেখা যাবে। এখানেও জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব ছবি এঁকেছেন মোরাভিয়া। নিরাশাবাদের ছায়ায় সে ছবি ম্লান। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে এই নিরাশাবাদের জন্ম হয়নি; বরং জীবনকে উপভোগ করবার গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নীতিবোধের সামঞ্জস্যবিধানের ব্যর্থতাই নিরাশাবাদের কারণ। আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে মোরাভিয়া দেখিয়েছেন, কি করে ধীরে ধীরে, কিন্তু অনিবার্যরূপে, নায়ক অপরাধ-অনুষ্ঠানের পথে এগিয়ে চলেছে। এই অপরাধ নায়কের ধ্বংসের কারণ হবে জেনে পাঠক উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। অপরাধ-প্রবণ নায়কের মনোবিশ্লেষণে মোরাভিয়া দস্তয়েভস্কির সগোত্র।

মোরাভিয়ার রচনার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর নায়ক-নায়িকাদের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা। জীবনের যত সমস্যা এই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাকে কেন্দ্র করেই দেখা যায়। •ইতালীর জীবন ও সাহিত্যে ইন্দ্রিয়ের স্থূল আকর্ষণটা নতুন নয়। ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ মনে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, জীবনকে সহজ পথ থেকে বিচ্যুত করে যে সমস্যা নিয়ে আসে, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মোরাভিয়ার মতো ইতালিয়ান সাহিত্যে আর কেউ করেন নি। অবশ্য এর সূত্রপাত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই। এই প্রসঙ্গে দান্নুন্‌ৎসিও-র বিখ্যাত উপন্যাস 'জীবনশিখা'-র নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

মাত্রাহীন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনেই বিপর্যয় আনে না; বিকৃত যৌনলালসা কিশোরদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করে, বড় হয়েও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দুঃসাধ্য। এমনি একটি করুণ কাহিনী মোরাভিয়া বলেছেন তাঁর The Conformist নামক উপন্যাসে। কিশোর ক্লেরিসি বিকৃত যৌনলালসার ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যে অপরাধ করেছিল, তার হাত থেকে সে বড় হয়েও মুক্তি পায়নি। বালক বয়সে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য পাপবোধ তার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ক্লেরিসির এই পাপবোধ তাকে ফ্যাসিস্ত দলে যোগ দিতে এবং পত্নী নির্বাচন করতে প্রভাবান্বিত করেছিল। Disobedience নামক আর একটি কাহিনীর নায়ক পনেরো বছরের বালক লুকা। লুকা একজন নাম-করা উকীলের পুত্র। তার জীবনে কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে তার মনে হল, কেউ তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমগ্র সংসার যেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে—এমনি একটা মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সকলের ওপরে অভিমান করে লুকা খাওয়া বন্ধ করল। তার ফলে লুকা পড়ল কঠিন রোগে। অসুখের সময় সে যে-সব প্রলাপোক্তি করেছে, মোরাভিয়া তাদের উৎস সন্ধান করেছেন। লুকার শুশ্রূষার জন্য একজন মধ্যবয়সী নার্স নিযুক্ত হল। নার্স প্রাণ দিয়ে তার সেবা করল, কিন্তু শেষে এই নার্সই তাকে ভোলালো।

দাম্পত্য জীবনের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও প্রেমের কাহিনী পাওয়া যাবে Conjugal Love ও A Ghost at Noon-এ। মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস The Woman of Rome.

'রোমের নাগরিকা'-র পটভূমিকা মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত আমলের রোম।

শহরের এক বস্তিতে বাস করে আদ্রিয়ানা ও তার মা। আদ্রিয়ানা মায়ের অবাঞ্ছিত সন্তান। সেলাই করে যে মজুরি পায় তাই দিয়ে মা কষ্টে সংসার চালায়। মেয়ে বড় হওয়ায় এখন খরচ বেড়েছে, শুধু সেলাইয়ের আয়ে আর চলে না। আদ্রিয়ানার বয়স যখন ষোল, তখন মা ওকে নিয়ে গেল এক স্টুডিয়োতে, আর্টিস্টের মডেল হবে। আদ্রিয়ানাকে দেখে শিল্পী বিস্মিত হল। এমন রূপ আজকাল দেখা যায় না। এখন সুন্দরী হতে হলে ক্ষীণাঙ্গী হওয়া চাই। কিন্তু আদ্রিয়ানার দেহ পূর্ণবিকশিত, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপরিপুষ্ট। তাই তার দেহ একটু ভারী, চলাফেরাও মন্থর। শিল্পীর মনে হল, যেন মধ্যযুগের রোমের কোনো দেবী আদ্রিয়ানার মধ্যে রূপ-পরিগ্রহ করেছেন।

মেয়ের রূপ সম্বন্ধে মা সচেতন ছিল। কিন্তু শুধু রূপ থাকলে কি হবে? সামাজিক মর্যাদা তো নেই। সুতরাং ভালো ঘরে বিয়ে হবার আশা করা যায় না। সুখে থাকবার একমাত্র পথ রূপ বিক্রয় করা। এ পথে আদ্রিয়ানাকে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হবে না: টাকা আসবে প্রচুর; কত বড় বড় লোক পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে; মেয়ে সুখে থাকবে।

আদ্রিয়ানা কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের অন্য ছবি দেখে। বিয়ে হবে, স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করবে—এই তার স্বপ্ন। স্টুডিও যাবার পথে একদিন পরিচয় হল মোটর-ড্রাইভার গিনোর সঙ্গে। গিনো দেখতে সুপুরুষ নয়, তার আয়ও সামান্য। কিন্তু বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার স্বপ্নের সমর্থন করেছে বলে আদ্রিয়ানা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গিনোর হাতে সমর্পণ করল।

এদিকে স্টুডিওতে তার সহকর্মিণী ও বন্ধু গিসেলার চক্রান্তে আদ্রিয়ানা ফ্যাসিস্ত সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী অ্যাস্তারিতার কবলে পড়ল। দেহদানের মূল্যস্বরূপ কতকগুলি নোট অ্যাস্তারিতা যখন তার হাতে গুঁজে দিল তখন হাত জ্বালা করলেও আদ্রিয়ানার মনে জাগল এক নতুন অনুভূতি। কত সহজে প্রচুর টাকা উপার্জন করা যেতে পারে! দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের এমন উপায় আর নেই।

কিন্তু আদ্রিয়ানার ও সব কথা ভেবে আর লাভ কি? গিনোর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দিন পর্যন্ত স্থির। আদ্রিয়ানার মা এ বিয়েতে সুখী নয়। মেয়ের বিয়ে সে চায়নি। আর সন্তুষ্ট নয় অ্যাস্তারিতা। সে বুঝল বিয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে বলেই আদ্রিয়ানা তাকে প্রত্যাখ্যান করছে।

অ্যান্তারিতা খবর সংগ্রহ করে জানালো, গিনো বিবাহিত; দেশের বাড়িতে আছে তার স্ত্রী ও সন্তান।

এতবড় প্রতারণায় একেবারে ভেঙে পড়ল আদ্রিয়ানা। গিনোকে সে কিছুই দিতে বাকি রাখেনি। এখন আর কোনো অবলম্বন রইল না। মায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী সন্ধ্যার পরে রোমের রাজপথে দাঁড়িয়ে আদ্রিয়ানা নতুন ব্যবসা আরম্ভ করল। কিন্তু প্রথম যেদিন রাস্তা থেকে ঘরে লোক নিয়ে এল, সেদিন মা খুশি হল না। নিজেই মেয়েকে এ পথে আসবার জন্য প্ররোচিত করেছে। সত্যি যেদিন আদ্রিয়ানা সে পথ বেছে নিল সেদিন মা কেবল কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি।

তারপর একে একে কত লোক আসতে লাগল। কেউ অনভিজ্ঞ তরুণ, কারও বা জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই বাকি নেই। কেউ মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না, কেউ পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে প্রেম ভিক্ষা করে, কেউ বা অর্থের পুর্ণ বিনিময় আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর। আদ্রিয়ানার অতিথিদের মধ্যে কেউ তরুণ ছাত্র, কেউ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, কেউ বা খুনের ফেরারী আসামী। পুরুষের বিচিত্র কামনার স্রোত প্রতিদিন তার দেহের উপর দিয়ে বয়ে যায়। বর্ষার নদীতে বাঁশের খুঁটির মতো সে থরথর করে কাঁপে, কিন্তু ভেসে যায় না।

আদ্রিয়ানা নিজেকে হারালো গিয়াকমোর কাছে। গিয়াকমো ফ্যাসি-বিরোধী ছাত্র। গিয়াকমো আত্মপ্রেমিক এবং গভীর নিরাশাবাদী। নীট্‌শের প্রতিধ্বনি করে সে বলে, ভূ-পৃষ্ঠের আঁচিলের মতো এই মানুষ; পৃথিবীতে তাদের কোনো মূল্য নেই। এই নিরাশাবাদ গিয়াকমোকে আদ্রিয়ানার প্রেমে আত্মহারা হতে দেয়নি। আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব ছিল তার মনে। একবার কাছে আসত, আদ্রিয়ানাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতি দিত, আবার হঠাৎ যেন দূরে সরে যেত। আদ্রিয়ানাকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্য ছিল না; তার মানসিক গঠনের মধ্যে ছিল দ্বন্দ্বের বীজ। আদ্রিয়ানা যখন মিথ্যে করে বলল যে, গিয়াকমোর সন্তান এসেছে তার গর্ভে, তখন সে আত্মহত্যা করল।

গিয়াকমোকে বাঁধবার জন্যই আদ্রিয়ানা হয়তো মিথ্যে কথা বলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এক ফেরারী খুনী আসামীর সন্তান তার গর্ভে। তবু আদ্রিয়ানা গিয়াকমোর নাম তার ভবিষ্যৎ সন্তানের সঙ্গে যোগ করতে চায়। খুনী

আসামীর সন্তান আদ্রিয়ানার ভবিষ্যৎ-জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে, এমনি একটা আশঙ্কার মধ্যে কাহি   হয়েছে

আদ্রিয়ানার চ ত্র মোরাভিয়া এঁকেছেন আশ্চর্য মুন্শীয়ানার সঙ্গে। ঘটনার নাটকীয়তা এবং মনের সংঘাত কাহিনীকে কোথাও শিথিল হবার অবকাশ দেয়নি। পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করা সত্ত্বেও সে হারায় নি তার মনুষ্যত্ব। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যেও গিয়াকমোর প্রতি তার প্রেমকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই জন্যই আদ্রিয়ানাকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখা পাঠকের পক্ষে অসম্ভব।

মোরাভিয়ার বিভিন্ন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা সুনির্দিষ্ট পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর-নারী নয়। চরিত্রগুলি এক কাহিনী থেকে পরবর্তী কাহিনীতে ক্রম-বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে। যে-পদ্ধতিতে প্রথম খসড়া থেকে শিল্পীর ছবি পরিণতির পথে অগ্রসর হয় মোরাভিয়ার পাত্র-পাত্রীরাও সে-ভাবেই এক গল্প থেকে অন্য গল্পে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে ওঠে। মোরাভিয়ার নর-নারীর পরিবেশ এবং জীবনের সমস্যা সর্বত্রই প্রায় এক প্রকার। ইতালীর মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি এঁকেছেন মোরাভিয়া। সে ছবি নিপুণ তুলি দিয়ে আঁকা। এমন বাস্তবানুগ ছবি তুলে ধরা হয়েছে যে মনে হবে, মোরাভিয়া কলমের পরিবর্তে ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন। নিখুঁত ছবি আঁকাটাই কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভের পথ নয়। সমাজ ও মানুষকে শুধু জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। চাই সহানুভূতি। মোরাভিয়ার রচনায় এর অভাব নেই। তাঁর পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে তিনি নিজে সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, পাঠকদেরও অংশ দেন। সহানুভূতির প্রলেপ দিয়ে সংসারের সকল আঘাত ও চারিত্রিক বিকৃতিকে কোমল করা হয়েছে। তাই পতিতা, খুনী, এমন কি যে-মা মেয়েকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করে, তার উপরও বিমুখ হয়ে থাকা কঠিন।

মোরাভিয়ার উপন্যাসে যে-সব সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে তাদের মূল প্রধানত বর্তমান জীবনের বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে। যে অবস্থায় তাঁর পাত্র-পাত্রীদের দিন কাটছে সে অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট নয়। আরও অর্থ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা এবং পোশাক ও অলঙ্কার চাই। এই আকাঙ্ক্ষা সফল করবার জন্য যত ছল, চাতুরী, মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের আয়োজন। সুখোপভোগের স্থূল উপকরণগুলির জন্যই যত লোভ। আর এই লোভই সকল দুঃখের কারণ।

আদ্রিয়ানা ও তার মায়ের দিনগুলি দুঃখে-কষ্টে একরকম কাটছিল। কিন্তু এ জীবনে তারা তৃপ্ত নয়। বিলাসমণ্ডিত জীবনের দুঃস্বপ্ন দেখে পাগল হয়েছে। দরিদ্রের ঘরে বিয়ে হওয়া অপেক্ষা রূপসী পতিতার ঐশ্বর্য ভোগ করা আদ্রিয়ানার পক্ষে অনেক বেশি ভালো—মায়ের এই দৃঢ় অভিমতের ফলে মেয়ের জীবন দুঃখময় হয়ে উঠল। আধ্যাত্মিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মোরাভিয়ার পাত্র-পাত্রীদের জীবন বিক্ষুব্ধ করে না। জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের লোভ থেকেই প্রধানত কাহিনীর গতি সঞ্চারিত হয়।

মোরাভিয়ার জগৎ সঙ্কীর্ণ এবং তাঁর পাত্র-পাত্রীদের জীবনের পরিধি সীমাবদ্ধ। তার ফলে পুনরাবৃত্তিদোষ মোরাভিয়ার উপন্যাসে দেখা যায়। একই দৃশ্য, একই কথোপকথন একটু পরিবর্তিত হয়ে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ফিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ছোটগল্পগুলি এই পুনরাবৃত্তির ত্রুটি থেকে মুক্ত।

যৌনানুভূতির আধিক্যটাই মোরাভিয়ার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ। বাইরে থেকে এই অভিযোগ সত্য মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভালো করে বিচার করলেই দেখা যাবে, তিনি অকারণে কাহিনীর মধ্যে যৌনচিত্র উপস্থিত করেন নি। কাহিনীর প্রয়োজনেই তাদের আনা হয়েছে। মোরাভিয়া বাস্তবধর্মী লেখক। জীবনের খাঁটি রূপটা দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য। যৌনানুভূতিকে বাদ দিয়ে সত্যকার সমগ্র জীবনকে দেখানো যায় না। তা ছাড়া বিশেষ করে তিনি বস্তুতান্ত্রিক মধ্যবিত্ত সমাজের নর-নারীদের সম্বন্ধে লেখেন। এদের জীবনে শান্তি নেই; জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার জন্য নিরন্তর এরা প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে চলেছে। এ সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কোনো নৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। হতাশা থেকে, সংগ্রামের ক্লান্তি থেকে, যৌনমিলনের ক্ষণিক আনন্দের মধ্যে এরা আশ্রয় খোঁজে। এখনো এই আবেশটুকু অবশিষ্ট আছে।

কিন্তু মোরাভিয়া কখনো যৌনলালসার সমর্থন করেন নি। বরং তাঁর রচনা থেকে দেখা যাবে, জীবনে এই একটি অনুভূতিকে যারা প্রাধান্য দিয়েছে তাদের দুঃখের শেষ নেই। আদ্রিয়ানার জীবনের পরিণতি দেখে কোন্ মেয়ে পতিতার ঐশ্বর্যের লোভে লালায়িত হবে? তবু যে আদ্রিয়ানা একেবারে তলিয়ে যায়নি, তার কারণ গিয়াকমোর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা। এই প্রেম তার মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে। পতিতা হয়েও নিরপরাধ দরিদ্র ঝির বিপদের আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হয়েছে। অ্যাস্তারিতাকে সে ভালোবাসতে পারেনি; তবু

তার জন্য কত সহানুভূতি! অ্যাম্ভারতা এবং এমনি আরও কত পুরুষ আসে যাদের উদ্দেশ্য শুধু লালসার পরিতৃপ্তি নয়। অ্যাম্ভারিতা যখন তার কোলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলে হয়ে মায়ের কাছে ফিরে এসেছে। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাতৃজঠরের অন্ধকারে ফিরে যেতে চায়। এই জন্যই নারীদেহের উপর লোভ।

'এ গোস্ট অ্যাট নুন'-এ রিকার্ডো বলছে, দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে আত্মার মিলন ঘটে; এই জন্যই দেহের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ। সুতরাং দেখা যাবে যে, মোরাভিয়া দেহসর্বস্ব প্রেমকে জীবনের সব চেয়ে বড় অনুভূতি বলে স্বীকার করেন নি। যারা স্বীকার করেছে, তাদের সেজন্য দুঃখময় পরিণতি মেনে নিতে হয়েছে। 'দি কনফরমিস্ট'-এর নায়ক মার্সেল্লো ক্লেরিসি নীতিবোধহীন বেপরোয়া জীবন যাপন করে অদৃশ্য বিচারপতির বিচারের হাত থেকে মুক্তি পেল না। মার্সেল্লোর শোচনীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নীতিনিষ্ঠ জীবনাদর্শের জয় সূচিত হয়েছে।

মোরাভিয়া অবশ্য কোনো বিশেষ জীবনাদর্শের জয় অথবা পরাজয় দেখাবার উদ্দেশ্যে লেখেন না। শিল্পীর চোখ দিয়ে জীবনকে তিনি যে ভাবে দেখেছেন পাঠকের সামনে সেই জীবনকে অবিকল তুলে ধরেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, পাঁক ঘাঁটাই তাঁর কাজ। কিন্তু মোরাভিয়ার রচনাকে সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই পঙ্কিল জীবনের মধ্য থেকেও একটি মহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। মোরাভিয়া প্রথম শ্রেণীর গল্পকার; এমন হৃদয়গ্রাহী করে গল্প বলবার ক্ষমতা বর্তমান য়ুরোপের কম লেখকেরই আছে। মোরাভিয়া এখনও লিখছেন; তাঁর মন এখনও সৃষ্টিধর্মী। সুতরাং মোরাভিয়ার কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন সৃষ্টি আশা করি। হয়ত ভবিষ্যৎ রচনাবলীর মধ্যে তাঁর জীবন-দর্শনের সুনির্দিষ্ট রূপটি ধরা পড়বে।

হেনরিক ইবসেন

১৮২৮-১৯০৬

শেক্সপীয়ারের পরে কোনো নাট্যকারের নাম করা যেতে পারে ? ইতালিয়ান নোবেল লরিয়েট লুইগি পিরান্দেল্লো দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, শেক্সপীয়ারের পরে ইবসেনের স্থান। এ কথা যুক্তিসঙ্গত। ইবসেন আধুনিক নাটকের জন্মদাতা। তিনিই প্রথম বাস্তব জীবনের সহিত নাটকের যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এই যোগাযোগ না ঘটলে বর্তমান শতকে যুগোপযোগী নাটক পাওয়া যেত না। পরবর্তী নাট্যকারদের প্রায় প্রত্যেকেই ইবসেনের রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বার্ণার্ড শ'র উপর ইবসেনের প্রভাব যে কত বেশি তা তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম ভাগের রচনা 'দি কুইনটেসেন্স অব ইবসেনিজম (১৮৯৮)' থেকেই জানা যায়। শুধু নাটকে নয়; সাহিত্যের অন্যান্য শাখার উপরেও ইবসেনের প্রভাব পড়েছে। জেমস্ জয়েস-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফিন্নেগান্‌স্ ওয়েক' পড়তে গিয়ে অনেক জায়গায় ইবসেনের কথা মনে পড়ে।

১৮২৮ সালের ২০শে মার্চ হেনরিক ইবসেন নরওয়ের ছোট শহর স্কিয়েনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্নুদ ইবসেন ছিলেন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী। তাঁর সর্বদাই ঝোঁক ছিল অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবার। এই উদ্দেশ্যে তিনি শেয়ার বাজারে এবং ব্যবসায়ে দুঃসাহসিক ঝুঁকি গ্রহণ করতেন। একবার এর ফল বড় মারাত্মক হল। ক্নুদ ইবসেনের সঞ্চিত অর্থ ও ব্যবসা ডুবে গেল। ইবসেনের বয়স তখন আট। হঠাৎ পরিবারের এই ভাগ্য-বিপর্যয় তাঁকে গভীর আঘাত দিয়েছিল। সচ্ছলতার পরে দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা বড় কঠোর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে; এর জন্য বালক বয়সেই কোনো এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল।

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করলেও ইবসেনের শিল্পীসত্তার বিকাশ শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। ইবসেন তখন স্কুলের ছাত্র; তেরো-চোদ্দ বছরের কিশোর। শিক্ষক যার যে বিষয়ে খুশি রচনা লিখতে দিলেন। ইবসেন লিখলেন স্বপ্ন সম্বন্ধে একটি রচনা। ক্লাশে সেটি যখন তিনি পড়লেন তখন সবাই চুপ

করে শুনল। একজন স্কুলের ছাত্র এত ভালো রচনা লিখতে পারে শিক্ষকের বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন অন্য কেউ ইবসেনকে লিখে দিয়েছে।

ছেলেবেলায় ইবসেনের ভবিষ্যতে লেখক হবার কথা কখনো মনে হয়নি। তিনি বেশ ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রোমে গিয়ে চিত্র-শিল্প শিখবেন। কিন্তু স্কুলের সাধারণ শিক্ষার পর ইবসেনের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেলের উচ্চতর শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবার সামর্থ্য পিতার ছিল না।

শুধু যে পড়া বন্ধ হয়ে গেল তাই নয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে ইবসেনকে অবিলম্বে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হল। গ্রিমস্টাড শহরে এক ওষুধের দোকানে শিক্ষানবিস হিসাবে তিনি যোগ দিলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর তাঁকে এই দোকানে থাকতে হয়েছে। দিনের বেলা ক্ষুদ্র বন্ধ দোকান ঘরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। রাত্রিটা কাটাতেন বই পড়ে, যতক্ষণ ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে না আসত। অবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সহজেই। মনিব দু'বেলা খেতে ও সামান্য হাতখরচা দেবে, এই ছিল শিক্ষানবিসীর শর্ত। শর্তটা প্রায়ই ভঙ্গ হত খাবারের বেলায়। প্রায় পেট ভরে খেতে পেতেন না। ইবসেনের তখন প্রথম যৌবন ; খুব লম্বা-চওড়া চেহারা। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বড় কষ্ট হত। ক্ষুধার তাড়না যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে ইবসেন নানা বিষয়ের বই পড়তেন। এই সময়কার বই পড়বার অভ্যাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে।

ইবসেন গ্রিমস্টাডে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। সামাজিক হবার জন্য যে-সব চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন ইবসেনের তা ছিল না। তার উপরে কঠোর জীবনযাত্রা তাঁর তরুণ হৃদয় হতাশায় পূর্ণ করেছিল। উনিশ বছর বয়সে তিনি 'হতাশা' নামে একটি কবিতা লিখলেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এই কবিতায় বলছেন : 'নাম-গোত্রহীন জনতার স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ; তাদের একজন হয়ে আমি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব।' ইবসেনের প্রথম কবিতা 'শরৎ কালে' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় 'ক্রিশ্চিয়ানিয়া পোস্ট' কাগজে।

একদিন বোন হেদভিগ-এর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ইবসেন বললেন, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা লাভ করতে চাই।

বোন জিজ্ঞাসা করল, লাভ করবার পরে কি করবে ?

—তারপর হারিয়ে যাব,—'upwards, toward the peaks. Toward the stars. And toward the great silence.'

মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন। বন্ধু শুলেরাদ বার বার লিখছে ক্রিশ্চিয়ানিয়া (বর্তমান অস্‌লো) এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। ইবসেনেরও তা বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অর্থাভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু একদিন সকল বাধা অগ্রাহ্য করে ক্রিশ্চিয়ানিয়া চলে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভর্তি হলেন স্কুলে। এখানে তাঁর আলাপ হল এমন অনেকের সঙ্গে যাঁরা পরবর্তী জীবনে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরওয়ের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার বিয়র্ন্‌সন। পরবর্তী জীবনে ইবসেনের সঙ্গে তাঁর নানা কারণে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভালো হল না। গণিত ও গ্রীক পরীক্ষায় খুব কম নম্বর পেলেন। শিক্ষকরা তাঁকে আর একবার পরীক্ষা দেবার জন্য উৎসাহিত করলেও তাঁর পড়বার আর আগ্রহ ছিল না।

ক্রিশ্চিয়ানিয়া শহরে ইবসেনের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হল না। কিন্তু ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে নরওয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে এসে তাঁর লাভ হল প্রচুর। তাঁর মনের দিগন্ত অনেক দূর প্রসারিত হল। ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব ইবসেনের মানসিক গঠন রূপান্তরিত করেছে। তিনি শ্রমিক সমস্যা, সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশা এবং সামাজিক অত্যাচার সম্বন্ধে ভাবতে শিখলেন।

১৩৯৭ সালে ডেনমার্ক নরওয়ে জয় করে। প্রায় চারশ' বছর পরে, ১৮১৪ সালে, নরওয়ে স্বাধীনতা ফিরে পায়। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে ডেনমার্কের সংস্কৃতি নরওয়ের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাজধানীতে এসে ইবসেন উপলব্ধি করলেন যে, দেশপ্রেমিক তরুণরা নরওয়ের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায় দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার দূর হবার পরও দীর্ঘকাল যাবৎ সাংস্কৃতিক প্রভাবটা থেকে যায়।

ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার উদ্দীপনা এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ইবসেন কিছুদিন ভবিষ্যৎ জীবনের পথ স্থির করতে পারেন নি। কিছুকালের জন্য রাজনীতির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পী মন রাজনীতি-

বিমুখ হল অল্প দিনের মধ্যেই। তিনি স্থির করলেন নাটকের মাধ্যমে দেশ-বাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবেন।

এই সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইবসেন রচনা করলেন তাঁর প্রথম নাটক 'ক্যাটিলিন' (১৮৫০)। এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে ইবসেন পরিচিত হয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার সময়। পদ্যে রচিত এই ট্র্যাজেডিতে সিসারোর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সত্ত্বেও পাঠকের সহানুভূতি বিদ্রোহী নায়ক ক্যাটিলিনের উপরেই পড়বে। ইবসেনের সে সময়কার মানসিক অবস্থার ছাপ পড়েছে এই নাটকে।

নাটক লেখা হল, কিন্তু কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করতে রাজী হল না। প্রকাশকরা জানালো প্রকাশনের সকল ব্যয়ভার বহন করলে তারা এই নাটক ছাপাতে পারে। বন্ধুর প্রতিভার উপর শুলেরাদের অগাধ বিশ্বাস। সে ঋণ করে আড়াই শ' কপি 'ক্যাটিলিন' ছাপালো। নাটকের কঠোর সমালোচনা বের হল কাগজে। বিক্রি হল না। ঋণের দুশ্চিন্তা তো আছেই; তার উপর দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করবার মতো সামর্থ্য দু'বন্ধুর কারোই ছিল না। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় দু'শ' কপি বই পুরনো কাগজের দরে বিক্রি করে খাবার কিনে আনল।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ বছরই 'ভাইকিঙের কবর' একটি থিয়েটার গ্রহণ করে অভিনয় করল। ইবসেন সামান্য কিছু টাকাও পেলেন। তখন এই উৎসাহটুকু না পেলে নাটক রচনার পথ তিনি গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। নাটক অবশ্য তিন দিনের বেশি চলেনি।

প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক ওল্ বুল বার্গেনে একটি থিয়েটার স্থাপন করে ইবসেনকে আমন্ত্রণ জানালেন স্টেজ ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য। বেতন সামান্য হলেও সাগ্রহে এ আমন্ত্রণে ইবসেন সাড়া দিলেন। স্টেজ-ম্যানেজারের সাধারণ দায়িত্ব ছাড়া অভিনয়ের জন্য যত সীন প্রয়োজন হবে তা আঁকবার ভারও পড়ল তাঁর উপর। আর শর্ত থাকল বছরে একটি করে নতুন নাটক লিখে দেবার। বছর পাঁচেক ইবসেন এই কাজ করেছেন। এই পাঁচ বছরে নাটক রচনা ও প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন পরবর্তী কালে বিখ্যাত নাটকগুলি রচনার সময় তা কাজে লেগেছিল।

'ওস্ট্রাটের লেডি ইঙগার' (১৮৫৫) তাঁর প্রথম নাটক যা দর্শকদের ভালো লেগেছে। অথচ পূর্বের নাটকগুলি সফল হয়নি বলে আশঙ্কায় ইবসেন ছদ্মনাম

ব্যবহার করেছিলেন। 'লেডি ইঙগার' ও 'সোলহাউগের ভোজ' (১৮৫৬) এ দু'টি নাটকেই রোমান্টিসিজমের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ডেনমার্কের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব হয়নি। স্টেজ-ম্যানেজার হিসাবে বার্গেনে ইবসেনের শেষ নাটক 'ওলাফ লিলিয়েক্রান্স্' (১৮৫৭)। এটি স্বাদেশিকতামূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

আইসল্যাণ্ডের প্রাচীন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ইবসেন লিখলেন 'দি ভাইকিঙ্স্ অ্যাট হেলগেল্যাণ্ড' (১৮৫৮)। তাঁর প্রথম যুগে রচিত নাটকগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোনো থিয়েটার এ নাটক অভিনয়ের জন্য নিতে রাজী হল না। নরওয়ের কাছ থেকে হতাশ হয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন ডেনমার্কে ; সেখান থেকেও নাটক ফিরে এল। অনেক বছর পরে এই নাটকই সমাদৃত হয়েছে।

ইবসেনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল। ক্লারা এবেলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন রচনা করেছেন তাকে কেন্দ্র করে। ক্লারাও ইবসেনের লেখা সম্বন্ধে খুব উৎসাহ প্রকাশ করত। কিন্তু একদিন ক্লারা হঠাৎ এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ের কথা জানালো। স্বচ্ছল জীবনের লোভে সে অকস্মাৎ চলে গেল ইবসেনের জীবন-বৃত্তের বাইরে। এই আঘাত ইবসেনকে নারী-বিদ্বেষী করতে পারেনি। পরে ইবসেন সুসানা থোরেসেনকে বিয়ে করেন। সুসানা সুদিনে-দুর্দিনে এবং সাহিত্য-সাধনায় ইবসেনের সত্যকার সঙ্গিনী হতে পেরেছিল।

বিয়ে করবার পরে সংসারের ব্যয় বাড়ল। কিন্তু আয়ের কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই। স্টেজ-ম্যানেজারের চাকরি গেছে। এখন তিনি ছোট একটা থিয়েটারের ডিরেক্টর। নরওয়ের রঙ্গমঞ্চে তখন মন্দার যুগ চলছে। তাই আয় নেই। ১৮৬২ সালে ইবসেনের নতুন নাটক 'ভালোবাসার কমেডি' বের হল। এই নাটকে একজন পাদ্রির চরিত্র যে ভাবে আঁকা হয়েছে তা সাধারণ লোকের নিকট কলঙ্কজনক মনে হয়েছিল। এ নিয়ে বেশ বিরূপ আলোচনাও চলেছিল অনেক দিন। পরবর্তী নাটক 'প্রতারক' (১৮৬৪) নাট্যকৌশলের দিক থেকে উন্নত, যদিও বিষয়বস্তু পুরনো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নরওয়ের গৃহযুদ্ধের গল্প।

দু'টো নাটক লিখলেও আর্থিক সমস্যার কোনো সমাধান হল না। বিয়ার্নসন ও ইবসেন দু'জনেই সরকারের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন করলেন : বিয়ার্নসনের বৃত্তি মঞ্জুর হল। ইবসেনের আবেদনের উপর একজন সরকারী

কর্মচারী মন্তব্য করলেন : 'ভালোবাসার কমেডির' মতো নাটকের লেখককে বৃত্তির পরিবর্তে পিঠের উপর কয়েক ঘা দিয়ে বিদায় করা উচিত।

প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার বিয়ার্‌ন্‌সনের সৌভাগ্য ইবসেনের নিকট ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। ইবসেন তাই বলতেন যে, বিয়ার্‌ন্‌সনের তুলনায় তিনি হলেন 'God's stepchild on earth'. অত্যন্ত সঙ্কটে পড়ে ইবসেন এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যে থিয়েটারে তিনি ডিরেক্টর ছিলেন সেই থিয়েটার ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেছে ; বন্ধুদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের উপর তাঁর নির্ভর। সংসারের অভাব-অনটন ভুলে থাকবার জন্য ইবসেন মদ ধরেছেন। লোকের ধারণা হল তাঁর মধ্যে প্রতিভার যেটুকু স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

রাজার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আবেদন করেও বিশেষ ফল হল না। শুধু সামান্য একটা ভ্রমণ-বৃত্তি পেয়ে ১৮৬৪ সালে নরওয়ে থেকে যাত্রা করে ডেনমার্ক ও জার্মানী ঘুরে রোমে এসে পৌঁছলেন। এরপর থেকে জীবনের বহু বৎসর তাঁর কেটেছে নরওয়ের বাইরে। স্বদেশের উপর তাঁর গভীর অভিমান ছিল। দেশের লোক তাঁকে বুঝতে পারেনি এই ছিল তাঁর ক্ষোভ।

অপরিচিত রোম শহরে অর্থ উপার্জনের কোনো সুযোগ তিনি পেলেন না। অনেক দিন তাঁর বাড়িতে খাবার থাকত না। তথাপি দেশের সমাজের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর মন শান্তি লাভ করল। আর এই শান্তি সহায়ক হল প্রথম শ্রেণীর নতুন সৃষ্টির। এখানে তিনি 'ব্র্যাণ্ড' (১৮৬৬) ও ও 'পীয়ার গিণ্ট' (১৮৬৭) কাব্য-নাটক দু'টি রচনা করেন। এই দু'টি নাটকের মধ্যে ইবসেনের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'ব্র্যাণ্ড' প্রথমে লেখা হয়েছিল এপিক কাব্য হিসাবে। পরে নাট্যরূপ দেওয়া হয়। তরুণ পাদ্রি ব্র্যাণ্ড ধর্ম ও নীতির সঙ্গে কোনো প্রকার আপস করতে রাজী নয়। ধর্মের নির্দেশকে আক্ষরিক অর্থে পালন করাই ছিল তার সাধনা। মানুষের চেয়ে ধর্ম ছিল ব্র্যাণ্ডের কাছে বড়। জীবনের বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সে বিশ্বাস করত 'হয় সব, না হয় কিছু নয়' এই নীতিতে। তাই ধর্মের সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিলন ঘটাতে পারেনি। আপসহীন মনোভাব বজায় রাখতে গিয়ে স্ত্রী অ্যাগ্‌নিস এবং একমাত্র ছেলে আল্‌ফকে হারিয়েছে। তবু সে মাথা নত করেনি। কিন্তু গ্রামের লোক একদিন পাদ্রির নীতি-নিষ্ঠার অত্যাচারে অস্থির হয়ে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে

দিল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নির্জন পাহাড়ের উপরে ব্র্যাণ্ড প্রাণ হারালো। মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরের নিকট ব্র্যাণ্ড জানতে চাইল, সে কি অপরাধ করেছে। দৈববাণী হল, ঈশ্বরই প্রেম। অর্থাৎ, ভগবানের প্রেমময় রূপকে অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রকে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছ বলেই তোমার এই দুর্দশা।

'পীয়ার গিণ্ট' রোমান্টিক কাব্য-নাটক। নরওয়ের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পীয়ার নরওয়ের এক চাষীর ছেলে। আত্মম্ভরি গুণ্ডা প্রকৃতির পীয়ার নানা দেশ ঘুরে মৃত্যুর পূর্বে নরওয়ে ফিরে এল। বিভিন্ন দেশে পীয়ারের বিচিত্র অ্যাড্ভেঞ্চার এবং মা 'আশে' ও প্রণয়িনী 'সল্ভেইগের' চরিত্র কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। কতকগুলি রূপক চরিত্র ও ঘটনার সাহায্যে ইবসেন তাঁর বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছেন। এক হিসাবে পীয়ারকে ব্র্যাণ্ডের প্রতিচরিত্র বলা যেতে পারে। ব্র্যাণ্ডের ছিল আপসহীন শাস্ত্র-বচন-নিষ্ঠা। পীয়ার সমাজের উচ্চ স্তরে উঠে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করে অন্যকে প্রতারণা করেছে। তার জীবনে নীতির কোনো ভিত্তি ছিল না। পীয়ারের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইবসেন সে সময়কার নরওয়ের সমাজের ত্রুটিগুলি দেখাতে চেয়েছেন। সে সময় নরওয়ের সমাজে নীতির ভিত্তি ছিল কাঁচা। কিন্তু ধর্মের আড়ম্বরে কার্পণ্য ছিল না।

'ব্র্যাণ্ড' লেখার পর থেকে ইবসেনের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। বিয়ার্ন্সনের সঙ্গে যতই রেষারেষির ভাব থাক, তিনিই ইবসেনকে 'ব্র্যাণ্ডের' জন্য প্রকাশক স্থির করে দিলেন। নরওয়ের কোনো প্রকাশক পাওয়া গেল না। হেগেল নামে কোপেনহেগেনের এক প্রকাশক 'ব্র্যাণ্ড' প্রকাশ করল। এক বছরের মধ্যে চারটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর নরওয়ের সাহিত্যে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইবসেন যেমন প্রকাশক পেয়েছিলেন তেমন প্রকাশক পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা। এরপর থেকে ইবসেনকে কখনো অনাহারে থাকবার দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়নি। যখনই বিপদে পড়েছেন প্রকাশক বন্ধু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে।

১৮৬৬ সালে সরকার আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করায় ইবসেন নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-সাধনা শুরু করলেন। তবে নরওয়ের পাঠক ও দর্শকদের উপেক্ষা তাঁর পক্ষে গভীর বেদনার কারণ হয়েছিল। ইবসেনের চিন্তা এত অগ্রগামী ছিল যে সমসাময়িক সমাজ তাঁকে ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি।

ইবসেন কুড়িটির বেশি নাটক লিখেছেন। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

আছে। এদের মধ্যে 'পিলারস্ অব সোসাইটি' (১৮৭৭), 'এ ডলস্ হাউস' (১৮৭৯), 'গোস্টস্' (১৮৮১); 'অ্যান্ এনিমি অব দি পীপল্' (১৮৮২), 'দি ওয়াইল্ড ডাক' (১৮৮৪), 'হেড্ডা গ্যাবলার' (১৮৯০), 'দি মাস্টার বিল্ডার' (১৮৯২) প্রভৃতি নাটকগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তবে ইবসেনের রচনায় আধুনিকতা ও বাস্তবতার সূচনা হয়েছে 'দি লীগ অব ইয়ুথ' (১৮৬৯) বা যুবসঙ্ঘ নাটকে। এটি রাজনীতিমূলক নাটক। এত দিন তিনি কাব্য-নাটক লিখেছেন। 'যুবসঙ্ঘ' গদ্যে রচিত। নায়ক একজন তরুণ আইন-ব্যবসায়ী। এক জমিদারের নিকট অপমানিত হয়ে রাতারাতি বামপন্থী রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হল। দলবল নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। জমিদার আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য এক বড় পার্টিতে যুবক নেতাকে আমন্ত্রণ করে সমাজের অ্যারিস্টোক্র্যাটদের দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করালো। যাদের শুধু দূর থেকে দেখেছে তাদের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করল বামপন্থী নেতা। আবার রাতারাতি তার মত বদলে গেল। এবার সে হল অভিজাত সম্প্রদায়ের ভক্ত। রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শের পশ্চাতে যে নিষ্ঠা নেই ইবসেন এই নাটকে সে কথারই ইঙ্গিত করেছেন।

'পিলারস্ অব সোসাইটিতে' ইবসেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত করে বলেছেন যে বামপন্থী, দক্ষিণ-পন্থী বা উদারপন্থী কোনো নেতাই সমাজের উন্নতির জন্য কিছু করতে পারবে না। নেতার উপর নির্ভর না করে ব্যষ্টির কর্তব্য আত্মোন্নতির চেষ্টা করা। ব্যষ্টির উন্নতির দ্বারাই সমাজের স্থায়ী উন্নতি হতে পারে।

'এ ডলস্ হাউস' ইবসেনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। পৃথিবীর সকল দেশে নোরা সমাদর লাভ করেছে। এবং এই আশি বছরের ব্যবধানেও জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়ত আজকাল কমই হয়; কিন্তু পাঠকদের মধ্যে 'ডলস্ হাউসের' চাহিদা এখনো আছে। এই একটি বই নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যা করেছে পৃথিবীর আর কোনো বই তা করতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে একে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচার পুস্তক হিসাবে দেখাও ভুল হবে। ইবসেনের কোনো মতবাদ প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল না। নারী যে পুরুষের মতোই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ না করলে সংসারে যে শান্তি পাওয়া যায় না, এ কথা ইবসেন খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। 'ডলস্ হাউস্' নাট্যগুণেও বিশেষরূপে সমৃদ্ধ।

নোরা হেলমার বাবার বাড়ি এবং স্বামীর বাড়িতে আদরের মধ্যে মানুষ হয়েছে। সবাই তাকে পুতুলের মতো আদর করেছে, সংসারের দুঃখ ও সমস্যা তাকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে সকলেরই ছিল সেই চেষ্টা। স্বামীর অসুখ হয়েছে; তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সে গোপনে টাকা ধার করল। কিন্তু নোরাকে টাকা ধার দেবে কে? তাই সে বাবার সই জাল করল দলিলে। জাল সই ধরা পড়বার পর এ নিয়ে মামলা হবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় হেলমার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। স্ত্রী নীতি-ভ্রষ্ট বলে সে আর ছেলেমেয়েদের তার হাতে দিতে পারে না। নোরার তাদের স্পর্শ করবার অধিকার নেই! কিন্তু অকস্মাৎ যখন মামলার আশঙ্কা দূর হয়ে গেল তখন হেলমার সব কিছু এক নিমেষে ভুলে গিয়ে ঠিক আগের মতোই নোরাকে আদর করতে আরম্ভ করল। নোরা এবার তার জীবনের ফাঁকি বুঝতে পেরেছে। তাকে নিয়ে প্রাণহীন পুতুলের মতো যখন যা খুশি ব্যবহার করতে সে আর দেবে না। দুপুর রাত্রিতে একবস্ত্রে স্বামীর বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল। নিজেকে জানবে, সংসারের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হবে, আত্মনির্ভর হবে; তবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ মিলন সম্ভব।

দুপুর রাত্রিতে বাড়ির বাইরে এসে দরজা বন্ধ করতে নোরা যে শব্দ করেছিল তার প্রতিধ্বনি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রগতিকামী মেয়েরা পেল নতুন উদ্দীপনা; সংরক্ষণশীল সমাজপতিরা ধিক্কার দিল নোরাকে। অন্তঃপুরের পবিত্র পীঠস্থানেও এবার নোংরা হাত এগিয়ে এসেছে। সব গেল, আর রক্ষা নেই। স্বামী-স্ত্রীর এমন বিচ্ছেদ অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে পারেনি। অনেক লেখক নোরা ও হেলমারের মিলন দেখিয়ে বই লিখল। দু'চার জন লোক একত্রিত হলেই নোরার কথা উঠত; বাগবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি শুরু হত। তাই কয়েক বছর যাবৎ পার্টির নিমন্ত্রণ পত্রে গৃহকর্তা লিখে দিত: নোরা সম্বন্ধে পার্টিতে আলোচনা নিষিদ্ধ।

১৮৮০ সালে মিউনিকে 'ডলস্ হাউস্' যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন ইবসেন দর্শকদের মধ্যে বসে অভিনয় দেখতে শঙ্কা বোধ করেছেন। কি জানি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে! ইবসেনের স্ত্রীও হলে আসেন নি। প্রত্যেকটি অঙ্ক নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবার পর লোক মারফৎ স্ত্রীকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। ইবসেন নিজে উইং-এর পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখেছেন।

'গোস্টস্' 'ডলস্ হাউসের' মতোই এখনো জনপ্রিয়। এখনো য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় দর্শকদের আকৃষ্ট করে। জীবনের ট্র্যাজেডি এই নাটকে

এমন শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যে দর্শক ও পাঠক অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস বলেছেন : Ghosts was Ibsen's noblest deed ; forever link the name of Ibsen with that of Sophocles.

যৌনব্যাধির কুফল বংশপরম্পরা জীবনে কী গভীর ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে 'গোস্টস্' তার জীবন্ত আলেখ্য। কিন্তু এই নাটক শুধুই যৌনব্যাধির বিরুদ্ধে সাহিত্যরসাবৃত অভিযান নয়। ইবসেন জীবনের গভীরতর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। চিরাগত কর্তব্যবোধের সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের বিরোধ। নায়িকা শ্রীমতী আল্‌ভিং দুশ্চরিত্র স্বামীকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও নোরার মতো সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারেনি। বন্ধুবান্ধবদের ক্রমাগত উপদেশ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যবোধ। স্বামী যাই হোক স্ত্রী তাকে কখনো ত্যাগ করে যেতে পারে না। শ্রীমতী আল্‌ভিং-এর এই অক্ষমতার মধ্যেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। তাদের ছেলে অস্‌ওয়াল্‌ড বাবার কাছ থেকে যৌন-ব্যাধির বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। অস্‌ওয়াল্‌ড নিরপরাধ, কিন্তু পিতার পাপের মূল্য তাকে দিতে হবে। তরুণ শিল্পী অস্‌ওয়াল্‌ড অকস্মাৎ যৌনব্যাধির আক্রমণে পাগল হয়ে গেল। বেঁচে থেকে যে যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাই অনেক দ্বিধার পর শ্রীমতী আল্‌ভিং মা হয়ে ছেলের মুখে বিষ তুলে দিল।

যৌন বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা তখন নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং নরওয়ের জনসাধারণ এই নাটকের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। ফলে এর অভিনয় নিষিদ্ধ হল। এমন কি, অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অভিনয় করতে রাজী হল না।

'গোস্টস্'-এর বিরূপ অভ্যর্থনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইবসেন জর্জ ব্র্যাণ্ডেস্‌কে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসে এক চিঠিতে লিখছেন : When I think how slow and heavy and dull the general intelligence is at home, when I notice the low standard by which everything is judged, a deep despondency comes over me, and it often seems to me that I might just as well ending literary activity at once. They really do not need poetry at home ; they get along so well with the Parliamentary news and the Lutheran Weekly.

'গোস্টস্'-এর সমালোচকদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ইবসেন 'অ্যান এনিমি অব দি পীপল্' লিখেছেন। বহুলোক মিলিত ভাবে যা বলে তা যে সত্য নয় এটাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকে। গণতন্ত্রের 'মেজরিটি রুলকে' তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বহু লোকে বিরোধিতা করেছে বলে 'গোস্টস্'-এর মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, এটাই তাঁর ইঙ্গিত। ডাক্তার স্টক্‌মান শহরের জল দূষিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দেন। তিনি ভেবেছিলেন, কর্তৃপক্ষ এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। এই তথ্য প্রচারিত হলে টুরিস্টরা আর আসবে না। শহরের আয় কমে যাবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এমন মারাত্মক সত্যকে গোপন করতে ব্যগ্র। আর ডাক্তার স্টক্‌মান জীবন পণ করে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য প্রচার করতে লাগলেন।

'দি ওয়াইল্ড ডাক্' অনেকের মতে ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই প্রতীক-ধর্মী নাটকে ইবসেন দেখিয়েছেন সংস্কারক অনেক সময় কেমন করে মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে। ইবসেন নাটকের গ্রেগারস্ চরিত্রের মাধ্যমে নিজেকেও ব্যঙ্গ করেছেন। গ্রেগারস্ একদিন জানতে পারল তার বন্ধু একডাল বিয়ে করেছে তাদের ভূতপূর্ব পরিচারিকা গিনাকে। স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখেই আছে। গ্রেগারস্ জানে যে তার বাবা গিনার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তার মনে হল বন্ধুকে সত্য কথা জানানো তার অবশ্য কর্তব্য। গিনা স্বামীর কাছে কিছুই গোপন করল না। এর ফলে তাদের সুখের সংসার ছারখার হয়ে গেল। এমন কি, গ্রেগারস্-এর সত্যপ্রীতির দম্ভ হতে মুক্তিলাভের জন্য একডালের ছোট মেয়ে হেদভিগকেও আত্মহত্যা করতে হল।

'হেড্ডা গ্যাব্‌লার' ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চে নাটক উপস্থিত করবার কৌশলের দিক থেকে বিচার করলে এটি যে শ্রেষ্ঠ নাটক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নাটকে নায়িকা অন্য সকল চরিত্রের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। হেড্ডা গ্যাব্‌লারকে ফ্লবেয়ারের এমা বোভারির সগোত্র বলে মনে হয়। ইবসেন এই নাটকে কোনো সামাজিক সমস্যাকে প্রধান করেন নি। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং হৃদয়ের অনুভূতি সহজ ভাবে দেখাতে চেয়েছেন। হেড্ডা ভুল করে এক মধ্যবিত্ত অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। সে এখন এই বিয়ের জন্য অনুতপ্ত। তার ভূতপূর্ব প্রেমিক বই লিখে খ্যাতি লাভ করবার পর হেড্ডা আবার যোগাযোগ স্থাপন করে লভ্‌বর্গকে অধঃপতনের পথে নিয়ে এল। লভ্‌বর্গের দ্বিতীয় বইয়ের পাণ্ডুলিপি

হাতে পেয়ে ধ্বংস করে ফেলল হেড্ডা। তারপর লভ্‌বর্গের হাতে পিস্তল দিয়ে তাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করল। কারণ হেড্ডার নিকট আত্মহত্যা মহৎ ও সুন্দর। যখন ধরা পড়ল যে হেড্ডার প্ররোচনায় লভ্‌বর্গ আত্মহত্যা করেছে তখন হেড্ডাও আত্মহত্যা করল। একটি খেয়ালী নারীর ব্যর্থ জীবনের মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি এই নাটক।

নরওয়ের রাজধানীতে ফিরে ইবসেন লিখেছেন 'মাস্টার বিল্ডার।' এই প্রতীকী নাটকটি অনেকাংশে আত্মজীবনীমূলক। শিল্পী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দৈনন্দিন জীবনের কতটা ত্যাগ করতে পারে? এই উত্তর নাটকের মধ্য দিতে চেয়েছেন ইবসেন। খ্যাতনাম্মা স্থপতি সল্‌নেস্‌কে তরুণী হিল্‌দা প্ররোচিত করে নিয়ে গেল এমন কাজ করতে যা তার ক্ষমতার বাইরে। সল্‌নেস্‌ খুব উঁচু এমন এক স্তম্ভ তৈরী করল যা কেউ দেখেনি। কিন্তু সেই স্তম্ভের চূড়া থেকে পড়ে স্থপতি প্রাণ হারালো। প্রবীণ লেখকদের বাদ দিয়ে তরুণ লেখকদের এগিয়ে যাবার অশোভন ব্যগ্রতার প্রতি ইবসেন ইঙ্গিত করেছেন।

নাটকে বাস্তবতার প্রবর্তন ইবসেনের শ্রেষ্ঠ দান। পদ্যের পরিবর্তে তিনি পাত্র পাত্রীদের মুখে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা দিয়েছেন। সমসাময়িক জীবনের সমস্যায় জর্জরিত নর-নারীকে তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর পূর্বে বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে এ জাতীয় নাটক রচনা কেউ করেন নি। এই সমস্যাগুলি একান্তরূপে সাময়িক ছিল এমন কথা মনে করলে ভুল করা হবে। অধিকাংশ সমস্যার বীজ মানব চরিত্রের গভীরতায় নিহিত। তাই সকল যুগেই এই সমস্যাগুলি আত্মপ্রকাশ করে। হয়ত একটু ভিন্ন রূপে। সুতরাং ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এখনো আমাদের কাছে পুরনো হয়নি। কিন্তু নিছক বাস্তবতার ভিত্তির উপর যদি নাটকগুলি রচিত হত তাহলে এদের ভাগ্য সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। ইঙ্গিতময়তা ও আদর্শবাদ তাদের বাঁচিয়েছে। 'ডলস্‌ হাউসের' কাহিনীর সব কিছুই বাস্তব। কিন্তু নোরা যেখানে কোনো এক অজানিত 'আশ্চর্য ঘটনার' উপর সঙ্কট ত্রাণের জন্য আশা করছে সেখানে সে আদর্শবাদী। তার ঐকান্তিক আশার ব্যর্থতা নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেককে গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

ইবসেনের নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের কৌশল, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ, নাটকের বাণী ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর। তাঁর কৃতিত্বের জন্য আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু

তাঁকে অন্তরঙ্গ মনে হয় না, তাঁকে ভালোবাসতে পারি না—যেমন পারি শেক্সপীয়ারকে। শ্লেষাত্মক সমালোচনার প্রাধান্যই এর জন্য দায়ী। সমালোচনা কারো পছন্দ নয়, সত্য হলেও না। তাই কেউ কেউ বলেন, ইবসেন প্রশংসার স্তর থেকে অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌছতে পারেন নি। তাঁর রচনা সমালোচনাত্মক, গঠনাত্মক নয়। এই অভিযোগের উত্তরে ইবসেন বলেছেন: Different people have different duties assigned to them by Nature ;··· Each bird must sing with his own throat and thus fulfil the task assigned him by Nature, and his justification must be that he can in truth say like Luther : 'I can do no other !'

ইবসেন তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন :

To live is to war with friends,
That invest the brain and the heart ;
To write is to summon oneself,
And play the judge's part.

এখানেও দেখছি ইবসেন লেখককে বিচারক হিসাবে দেখছেন। হৃদয়বত্তা অপেক্ষা সমালোচনার প্রবৃত্তির আধিক্য দেখে বিয়ারন্‌সনও বিদ্রূপ করে বলেছেন : Ibsen is not a man ; he is only a pen.

প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের পীড়নে ইবসেন অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন ; দেশবাসী তাঁর প্রতিভার যোগ্য মর্যাদা দেয়নি ; বরং তাদের বিরূপতার জন্য তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। যাদের বন্ধু হিসাবে দেখেছেন তাদের কাছ থেকেও জ্বালাতন ভোগ করতে হয়েছে। তরুণ লেখক ক্নুট হামসুনের 'বুভুক্ষা' বইটি মাত্র বেরিয়েছে। হামসুন এসে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, সেই বক্তৃতায় ইবসেনকে উপস্থিত থাকতে হবে। জনাকীর্ণ সভায় ইবসেন গিয়ে বসেছেন। আর তখন হামসুন বক্তৃতামঞ্চ থেকে একে একে ইবসেনের নাটকগুলির উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। ইবসেনের রচনা যে কিছুই নয় তাই হল হামসুনের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইবসেন অসহায়। শ্রোতাদের দৃষ্টির শরশয্যার উপর শেষ পর্যন্ত তাঁকে বসে থাকতে হল।

বন্ধুত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ব্র্যাণ্ডেস্‌কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : Friends are an expensive luxury, and if a man's entire capital

is invested in a calling and a mission in life, he cannot afford to keep them. The costliness of keeping friends does not lie in what one does for them, but in what, out of consideration for them, one refrains from doing. জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলে ইবসেনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকরূপেই সমালোচনাত্মক হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ইতালী ও জার্মানীতে কাটিয়ে শেষ বয়সে ইবসেন দেশে ফিরে নানা সম্মান লাভ করেছিলেন। ডেনমার্কের সরকার তাঁকে নাইট পদে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সুইডেনের আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন ডক্টরেট উপাধি। তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে উৎসবের আয়োজন করা হয় তাতে বিদেশ থেকে অনেক শিল্পী ও লেখক এসেছিলেন অভিনন্দন জানাতে। এঁদের মধ্যে বার্ণার্ড শ' অন্যতম।

১৯০৬ সালের ২৩শে মে ইবসেন পরলোক গমন করেন। তাঁর নিরলঙ্কার স্মৃতিমন্দিরে কোনো কথা লেখা নেই; এমন কি, ইবসেনের নাম পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা হয়নি। শুধু আঁকা আছে খনি-মজুরের অত্যাবশ্যক হাতিয়ার একটি হাতুড়ি। খনি-মজুরের মতো তিনিও মানুষের মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর খনি থেকে সম্পদ আহরণ করে বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন।

অ গা স্ট স্ট্রী ণ্ড বা র্গ

১৮৪৯—১৯১২

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। ২২শে জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীতে স্টক্‌হোল্‌মের জীবন-স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আছে। শহরের প্রাণ চাপা পড়ে আছে শাদা বরফের নিচে। বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, পথ-ঘাট সব বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। সকাল বেলা বরফ কেটে পথ করে দেয় মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরা। তবেই পথ চলা সম্ভব। জনবিরল রাজপথে কোলাহল নেই; নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে বরফের উপর দিয়ে ভেসে আসে কুকুর-টানা গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। শীতক্লিষ্ট বাইশে জানুয়ারি স্টক্‌হোল্‌মের এক পড়ন্ত পরিবারে জন্ম হল জোহান অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গের। এই শীতের মতোই শূন্য ছিল স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবন। নাটক, উপন্যাস, গল্প, জীবনী, ইতিহাস প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রায় নব্বুইখানি বই লিখেছেন স্ট্রীণ্ডবার্গ। বস্তুবাদী নাটক-রচনায় তিনি ছিলেন একজন অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর উপন্যাসে এবং আত্মচরিতেও ছিল বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। সমালোচকরা তাই তাঁকে 'সুইডেনের জোলা' আখ্যা দিয়েছিল। জীবনের শেষ ক' বৎসর তিনি অর্থ ও সম্মান দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবী থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল শূন্য হৃদয়ে।

স্ট্রীণ্ডবার্গের জন্ম হয়েছিল যথাসময়ের পূর্বে। দশ মাসের পরিবর্তে সাত মাসে। তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস হবার সুযোগ পায়নি। আর পৃথিবীও প্রস্তুত ছিল না তাঁকে গ্রহণ করতে। আরো কিছুকাল পরে জন্ম হলে হয়ত তাঁর চিন্তাধারা লোকে বুঝতে পারত; কিন্তু আগে জন্ম হয়েছে বলেই তাঁকে পরবর্তীদের জন্য পথ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রতি পদক্ষেপে তিনি আঘাত পেয়েছেন।

নিজের মা-বাবা পর্যন্ত তাঁকে পেয়ে সুখী হতে পারেন নি। স্ট্রীণ্ডবার্গ অভিজাত কুলের বংশধর; ভালো ব্যবসা নিয়ে তিনি জীবন আরম্ভ করেছিলেন,

এখন দেনার দায়ে সে ব্যবসা ডুবেছে। নাম লেখাতে হয়েছে দেউলে হিসাবে। বিয়ের পূর্বে স্ট্রীণ্ডবার্গের মা পরিচারিকার কাজ করতেন। সমাজের নিচুতলার মেয়ে। অর্থ বা কুলের গৌরব করবার মতো কিছু ছিল না। হের স্ট্রীণ্ডবার্গ এঁকে বিয়ে করে সামাজিক মর্যাদা দিলেন। বিয়ের পূর্বে কয়েক বৎসর যাবৎ উল্‌রিকার সঙ্গে ছিল তাঁর অবৈধ প্রণয়।

জোহান অগাস্ট স্ট্রীণ্ডবার্গ চতুর্থ সন্তান। উল্‌রিকার স্বাস্থ্য এর মধ্যেই ভেঙ্গে পড়েছে। অর্থের একান্ত অভাব। সন্তানদের মুখে অন্ন দেবার চিন্তায় স্বামী-স্ত্রী ব্যাকুল। এমন পরিবেশে সংসারে এসে স্ট্রীণ্ডবার্গ কারো কাছ থেকেই সাদর অভ্যর্থনা পেলেন না। ছেলেবেলা থেকেই স্ট্রীণ্ডবার্গের মন বড় অনুভূতিপ্রবণ। একটু বড় হতে তাঁর অনুভব হতে লাগল তিনি যেন অবাঞ্ছিত সন্তান। সম্ভব হলে মা-বাবা তাঁর আগমন ঠেকাতেন। তাঁর উপস্থিতি মা'র স্বাস্থ্য ও বাবার সামর্থ্যের উপর বোঝা চাপিয়েছে। স্ট্রীণ্ডবার্গ আরো দেখলেন, তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই বড় ভাই মা'র হৃদয় অধিকার করেছে। সেখানে তাঁর পক্ষে একটু স্থান পাওয়া কঠিন। এখন ভাই-বোনের সংখ্যা বেড়েছে, মোট আটজন। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা সব সময় সম্ভব হয় না। কখনো কাউকে একটু বেশি আদর করলে বা একটু ভালো খাবার দিলে স্ট্রীণ্ডবার্গের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ঈর্ষায় পুড়তে থাকে তাঁর মন। মাকে একান্তরূপে নিজের জন্য পাবার আকাঙ্ক্ষায় শিশু-মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। বাবার প্রতি আকর্ষণ ছিল না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সংসারের চিন্তায় এবং পাওনাদারদের ক্রমাগত তাগিদে বিব্রত। সুতরাং মা'র প্রতি আকর্ষণটা গভীরতর হবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু স্ট্রীণ্ডবার্গের সর্বদাই মনে হত, মা তাঁকে যথেষ্ট ভালোবাসেন না, সংসারে তিনি অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত।

সাত বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। এখানেও স্ট্রীণ্ডবার্গকে কেউ সাদরে গ্রহণ করল না ; অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের ছেলেরা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাঁর দারিদ্র্যটাই ছিল ওদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। নতুন নতুন জিনিস শেখার আগ্রহে স্ট্রীণ্ডবার্গ এই আঘাত অগ্রাহ্য করে চলতেন। গাছ-পালা, পশু-পাখি, যা-কিছু তিনি দেখতেন তাদের বিশ্লেষণ করে দেখবার কৌতূহল ছিল তাঁর। বাইরে যা দেখা যায় সে রূপটা যে প্রকৃত নয়, এ সন্দেহ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর হয়েছিল। বাবার ছোট লাইব্রেরিটা তাঁকে বইয়ের জগতে

প্রবেশ করতে সাহায্য করল। নানা রকমের বই। মানুষের জগত তাঁকে আহ্বান জানায় নি, কিন্তু বইয়ের জগতে পেলেন সাদর আমন্ত্রণ। ডুবে গেলেন।

মা প্রায়ই রোগে ভুগতেন। শীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা; বড় দুর্বল আর অসহায় বোধ হত মাকে। মা'র জন্য তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। কিন্তু অভিমানও ছিল বুক-জোড়া। মা তো তেমন করে ভালোবাসেন না!

তখন বছর তেরো বয়স। এক রাত্রিতে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে কে এক জন বলে গেল, মা আর নেই।

মা'র মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বাবা নতুন স্ত্রী ঘরে আনলেন। সৎ মা'র সংসারে অবহেলিত হবার অনুভূতি আরো বৃদ্ধি পেল। আর বাড়ল মা'র উপরে অভিমান। যার ভালোবাসা পাওয়া যায়, তাকে ভোলা সহজ। কিন্তু ভালোবাসার পরিবর্তে যার কাছ থেকে অবহেলা ও উপেক্ষা পাওয়া যায়, তাকে ভুলতে পারা যায় না। মা'র কাছ থেকে আশানুরূপ ভালোবাসা পাননি। তাই মাকে ভোলা সহজ নয়। মা'র এক শুভ্র, সুন্দর কল্পমূর্তি তাঁর সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলল। সুন্দর, কিন্তু করুণ মূর্তি। যে কোনো মেয়ের কথা ভাবতে গেলেই এই মূর্তিটি তাকে আগলে দাঁড়ায়।

এখন কৈশোর। ধীরে ধীরে যৌনচেতনা জাগছে। যৌন-জীবনের নানা সমস্যা তাঁর মনে এসে দেখা দিল। ধর্মগ্রন্থে পড়লেন, অস্বাভাবিক যৌনাচরণের ফলে দেহ ভেঙে পড়ে, মানুষ পাগল হয়ে যায়, আর মৃত্যুর পরে নরকবাস সুনিশ্চিত। স্ট্রীণ্ডবার্গের কিশোর মন অপরাধের ভয়ে মুশড়ে পড়ল। তিনিও অপরাধী। ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা আতঙ্কে কালো হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত জীবনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও আবর্ত সত্ত্বেও স্ট্রীণ্ডবার্গের স্কুলের পড়া শেষ হল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়। আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার স্বপ্ন তাঁর অনেক দিনের। প্রধান বাধা অর্থাভাব। বাবার কাছ থেকে সামান্য কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। বাকী টাকা সংগ্রহ করতে হবে ছাত্র পড়িয়ে। আপসালার সব চেয়ে খারাপ ঘরে কোনো রকমে একটু আস্তানা করে নিলেন। কিন্তু নিজের দীন অবস্থা সব সময় তাঁকে পীড়া দিত। ক্লাশে যাবার মতো জামা-কাপড় পর্যন্ত ছিল না। স্কুলের ছেলেরা তাঁকে দরিদ্র বলে যেমন অবজ্ঞা করত এখানেও তেমনি করবে,—এই ভয়ে কারো সঙ্গে মিশতেন না। একা

একা থাকতেন ; শুধু বই আর নিজের মনের জটিল ও বিচিত্র জগৎ নিয়ে। রুশোর দর্শন তাঁর খুব ভালো লাগে। প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে পারলেই শান্তি পাওয়া যাবে।

নন্দনতত্ত্ব এবং আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য তাঁর বিষয়। কত বই পড়লেন। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে মিল আছে, এমন একটি চরিত্র কোথাও পেলেন না। যখন হতাশ হয়ে উঠেছেন তখন হঠাৎ এক দিন হাতে পড়ল বায়রণের 'ম্যানফ্রেড'। এত দিনে দেখতে পেলেন নিজের প্রতিচ্ছবি। এমন মুগ্ধ হলেন স্ট্রীণ্ডবার্গ যে অবিলম্বে তিনি 'ম্যানফ্রেড' নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে বসলেন। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করলেন নিজের অক্ষমতা। ঠিক ঐ সময়ই একটি মেয়ে জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে দিতে অনুরোধ করল। স্ট্রীণ্ডবার্গ এবারও ব্যর্থ হলেন। কিন্তু অক্ষমতা স্বীকার করা অপমানজনক বলে এক বন্ধুকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে দিতে হল। কে জানত বন্ধু প্রতারণা করবে ? ঠিক ঐ কবিতাটি কিছু দিন পুর্বে অন্য একটি মেয়েকে বন্ধু উপহার দিয়েছিল। এই প্রতারণা ধরা পড়ে যাওয়ায় স্ট্রীণ্ডবার্গের অনুশোচনার শেষ রইল না।

অর্থাভাব এবং মনের অস্থিরতার জন্য সাহিত্যের পাঠ বেশি দূর অগ্রসর হতে পারল না। স্ট্রীণ্ডবার্গ সাহিত্য ছেড়ে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় এ পথ থেকেও ফিরে আসতে হল। এর পরে চেষ্টা করলেন থিয়েটারে প্রবেশ করতে। স্ট্রীণ্ডবার্গের মনে হল সমাজে তাঁর স্থান নেই। তাই মনের নিরুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করবার একমাত্র স্থান রঙ্গমঞ্চ। ভালো অভিনয় করতে পারবেন, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দক্ষতার পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে বাতিল করে দিলেন। উপদেশ দিলেন নাটক আকাদামিতে অভিনয় শিখতে।

সকল পথ বন্ধ হবার পর স্ট্রীণ্ডবার্গ বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ির পথও খোলা ছিল বলা যায় না। আগেই ঝগড়া হয়েছে। শুধু একদিনের জন্য। চুপি চুপি চিলে কোঠায় উঠে পকেট থেকে একটি কালো বড়ি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। পরিবারের নিকট এই একটি রাত্রির ঋণ।

হয়ত আফিং-এর কোনো ত্রুটি ছিল। তাই প্রাণ গেল না। পরদিন সকালে স্ট্রীণ্ডবার্গ নতুন জীবন নিয়ে জেগে উঠলেন। লেখকের জীবন। তাঁর মনে সৃষ্টির প্রেরণা হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে ! একটা নাটকের

দৃশ্য পর পর তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। অনেকটা আত্মজীবনী-মূলক। কদিন আগেও একটা ছোট কবিতা লেখা যাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, আজ তিনিই যেন কোন দৈব শক্তির বলে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ছন্দোবদ্ধ কাহিনী পাতার পর পাতা লিখে চললেন!

নাটক শেষ হবার পর থিয়েটারে পাঠিয়ে দিলেন অভিনয়ের জন্য। কিন্তু ফেরত এল। তাঁর পরবর্তী নাটক 'হারমিয়ন'ও কেউ নিতে চাইল না। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই দু'টি নাটকেই লেখকের প্রতিভার পরিচয় পেলেন। প্রতিভা বিকাশের জন্য সাধনা চাই। সকলেই উপদেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে।

স্ট্রীণ্ডবার্গ এবার নতুন উৎসাহ নিয়ে আপসালায় ফিরে এলেন। লেখক হিসাবে ছাত্রমহলে নাম হয়েছে। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়ে উঠল। এখানে এসে 'রোম' নামে নতুন একটি নাটক লিখলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ নাটকটি রয়েল থিয়েটার অভিনয় করতে সম্মত হল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম অভিনয়। উত্তেজনায় প্রায় অর্ধচেতন অবস্থায় স্ট্রীণ্ডবার্গ অভিনয় দেখতে এলেন। অভিনয় দেখে তাঁর নিজেরই খুব খারাপ লাগল। বড় কাঁচা হাত। কিছুই হয়নি। উৎসাহ দমে গেল।

তাঁর পরবর্তী নাটক 'দি আউট ল' সফল নাটক নয়; কিন্তু সম্রাট এই নাটকের অভিনয় দেখে লেখককে ডেকে পাঠালেন। তাঁর ভালো লেগেছে নাটকের কাহিনী। স্ট্রীণ্ডবার্গের আর্থিক অবস্থার কথা জেনে সম্রাট একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু দু'বার মাত্র ত্রৈমাসিক বৃত্তি পাওয়া গেল; তারপর অজ্ঞাত কারণে রাজকোষ থেকে বৃত্তি পাঠানো বন্ধ হল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় খুব খারাপ নম্বর পেলেন। মৌখিক পরীক্ষায় স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য ভালো করে জানা বিষয়ও উত্তর দিতে পারলেন না।

সুতরাং গ্র্যাজুয়েট হবার আশা ত্যাগ করে ফিরে আসতে হল সৎমা'র আশ্রয়ে। সাময়িক ভাবে এই অপমানজনক পরিস্থিতি স্বীকার না করে উপায় ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে স্টক্‌হোল্‌মে ফিরে একটা বামপন্থী সংবাদপত্রে স্ট্রীণ্ডবার্গ চাকরি পেয়ে গেলেন। কিন্তু কাগজটি কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আবার বেকার হতে হল। কয়েক দিন পরেই জীবনবীমা সম্পর্কিত একটা কাগজের

সম্পাদকের পদ পেলেন। এ কাগজও জীবনবীমা কোম্পানীগুলির প্রতারণা প্রকাশ করে দেবার ফলে এগারো মাস পরে বন্ধ হয়ে গেল। এর পরে নিলেন টেলিগ্রাফ-কেরাণীর চাকরি। কিন্তু আবার ফিরে এলেন এক বিখ্যাত কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে। সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে একমত হতে না পারায় স্ট্রীণ্ডবার্গ কাজ ছেড়ে দিলেন। সংবাদপত্রে চাকরি করবার ফলে সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তিনি অনুভব করতেন আত্মীয়তার যোগসূত্র। তাঁর মা ছিলেন এদেরই একজন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে স্ট্রীণ্ডবার্গ বুঝতে পারলেন, সংবাদপত্র সত্য চায় না। জনমতের ঝোঁক যে দিকে, সে দিকে ঝোঁকাই সম্পাদকীয় নীতি।

নানা ধরণের জীবিকার মধ্যেও স্ট্রীণ্ডবার্গ একটি বড় নাটক শেষ করেছেন। 'মাস্টার ওলাফ',—সুইডেনের রিফর্মেশানের নেতার জীবন নিয়ে লেখা নাটক। স্ট্রীণ্ডবার্গ এই নাটকে নতুন টেকনিক প্রয়োগ করেছেন। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা এত দিন পদ্যে কথা বলত। স্ট্রীণ্ডবার্গ গদ্য ব্যবহার করলেন। তা ছাড়া নাটকের চরিত্র ও পরিবেশ গদ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একান্তরূপে বাস্তব। স্ট্রীণ্ডবার্গের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই নাটক সুইডিশ সাহিত্যের এক মহৎ কীর্তি বলে স্বীকৃত হবে। কিন্তু থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ নতুন ধরণের নাটক মঞ্চস্থ করে ঝুঁকি নিতে সম্মত হলেন না। তাঁরা নাটকটিকে পুরনো ধাঁচে লিখে পরিমার্জিত করে দিতে বললেন। স্ট্রীণ্ডবার্গের নিকট এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হল না।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্রীণ্ডবার্গ অপ্রত্যাশিতরূপে রয়েল লাইব্রেরিতে সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদ লাভ করলেন। গ্র্যাজুয়েট না হলে সাধারণত এ চাকরি পাবার কথা নয়। বেতন কম; তবু এই স্থায়ী সরকারী চাকরি তাঁকে জীবিকার অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিল। কাজ করবার কী আশ্চর্য পরিবেশ এই লাইব্রেরি। দু'পাশে বই সাজানো রয়েছে র‍্যাকের উপর, মধ্য দিয়ে সরু গলি। সেই গলি দিয়ে যেতে যেতে মনে হত সকল দেশের লেখকদের আত্মার স্পর্শ যেন তিনি পাচ্ছেন। কত সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি স্তব্ধ হয়ে আছে! সহানুভূতিশীল পাঠক পেলে তারা এই মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠবে।

লাইব্রেরিতে তাঁকে কঠিন কাজ দেওয়া হল। চীনা ভাষায় লেখা পুঁথিগুলি অনেক দিন যাবৎ পড়ে আছে। কেউ হাত দেয়নি এত দিন। এই পুঁথিগুলি ক্যাটালগ করবার ভার পড়ল স্ট্রীণ্ডবার্গের উপর। স্ট্রীণ্ডবার্গ দমলেন না, চীনা ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন।

মাইনে যাই হোক, সরকারী চাকরি করায় স্ত্রীণ্ডবার্গের সামাজিক মর্যাদা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই ফলে তাঁর পরিচয় হল ব্যারণ ওয়ারেঙ্গেল ও তাঁর স্ত্রী সিরি ফন এসেনের সঙ্গে। গত কয়েক বছরের মধ্যে স্ত্রীণ্ডবার্গের অনেক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু কেউ তাঁর মনে দাগ কাটতে পারেনি। তাঁর মায়ের মূর্তি মন অধিকার করে আছে। মায়ের মূর্তির সঙ্গে অলক্ষ্যে যুক্ত হয়েছে ভার্জিন মেরীর ছবি। যে মেয়ের মধ্যে মাতৃমূর্তির প্রশান্তি আছে একমাত্র সে মেয়েই তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করতে পারবে। লীলাচপল মেয়েরা কয়েক মুহূর্তের বন্ধু হতে পারে। শ্রীমতী এসেনকে দেখেই মনে হল এই তাঁর আদর্শ রমণী। সে মা, তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। তবু কৌমার্যের আশ্চর্য সরলতা তার চোখে-মুখে। স্ত্রীণ্ডবার্গ পূজার মনোভাব নিয়ে এসেনের কাছে যান। এসেনের মধ্যে তাঁর মা'র মূর্তি যেন এক হয়ে মিশে গেছে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সাদর অভ্যর্থনা জানান। স্ত্রীণ্ডবার্গেরও ভালো লাগে এঁদের সঙ্গ। এসেনের সখ ছিল অভিনেত্রী হবার। তার বিশ্বাস এ পথে সে নাম করতে পারত। স্ত্রীণ্ডবার্গের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সেই আকাঙ্ক্ষা আবার জেগেছে। স্ত্রীণ্ডবার্গকে অবলম্বন করলে হয়ত তার আকাঙ্ক্ষা সফল হবে। ব্যারণ পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে স্ত্রীকে অভিনয় করতে দিতে নারাজ। স্ত্রীণ্ডবার্গ ক্রমশঃ আবিষ্কার করলেন ব্যারণের স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। অন্য এক রমণীর প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত। এসেন এই অপমানকর জীবন এত দিন নীরবে সয়েছে। স্ত্রীণ্ডবার্গের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে উদ্ধার পাবার একটা পথ দেখতে পেল। শুধু মুক্তির উপায় নয়, জীবনের অবলম্বনও হতে পারেন স্ত্রীণ্ডবার্গ। উজ্জ্বল নীল চোখ, প্রশস্ত কপাল, মাথাভরা লম্বা চুল, দীর্ঘ দেহ;—মেয়েদের মন আকৃষ্ট করবার মতো চেহারা। এসেন স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি! স্ত্রীণ্ডবার্গকে ভালোবাসল। জীবনের এই প্রথম ভালোবাসা। অপবাদের ভয় নেই। রাত্রিতে স্ত্রীণ্ডবার্গের ঘরে চলে আসে।

ব্যারণের শুধু সম্মানের ভয়। স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দুঃখ নেই! স্ত্রী পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিতে বদ্ধ পরিকর, এই অজুহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শুরু হল। কিন্তু স্ত্রীণ্ডবার্গের নাম যোগ করে নানা গুজব সৃষ্টি তাতে বন্ধ হল না। স্ত্রীণ্ডবার্গ ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাকে প্রকাশ্যে বিকৃত রূপ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন; কিন্তু বাধা দেবার কোনো উপায় ছিল না।

আদালতের রায় বেরুবার পরই এসেন রঙ্গমঞ্চে যোগ দিল। তার নাম যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছে। তাকে অভিনেত্রী হিসাবে গড়ে তুলতে অনেক লোক এগিয়ে এল। শুধু স্ট্রীণ্ডবার্গের উপর নির্ভর করবার দিন আর নেই। পর পর দু'টো নাটকে অভিনয় করল এসেন। অভিনয় প্রথম শ্রেণীর নয়। শুধু সুন্দর চেহারার গুণে দর্শকরা বাহবা দিল। এরই মধ্যে অনেক স্তাবক জুটেছে। স্ট্রীণ্ডবার্গের মনে হল, পুরনো স্টাইলের পোশাকের মতো অনায়াসেই এসেন এখন তাঁকে ত্যাগ করেছে!

দেহ ও মনের অবসাদ দূর করবার উদ্দেশ্যে এক বন্ধুর আহ্বানে স্ট্রীণ্ডবার্গ প্যারিস বেড়াতে এলেন। হঠাৎ একদিন জরুরী চিঠি এল। এসেন লিখেছে: তোমার সন্তান আমার গর্ভে; শীগগির এসে আমাকে বাঁচাও।

সকল অভিমান ভুলে স্ট্রীণ্ডবার্গ অবিলম্বে ফিরে এলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে হল। নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া করে সংসার পাতলেন তাঁরা! কয়েক মাস পরে একটি মেয়ে হল এসেনের। কিন্তু তার আয়ু ছিল অল্প কয়েক দিন। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তিনটে মৃত্যু ঘটল। এসেনের মা, তার তিন বছরের মেয়ে এবং এই সদ্যোজাত সন্তান মারা গেল। স্ট্রীণ্ডবার্গের নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল, এই মৃত্যুর জন্য যেন তিনি দায়ী। মৃত্যু দিয়ে যার শুরু সেই বিয়ে কি সুখের হতে পারে?

মানসিক অশান্তির কথা বাদ দিলে স্ট্রীণ্ডবার্গের সময় তখন ভালো ছিল বলা যায়। চাকরিতে বেতন বেড়েছে; 'মাস্টার ওলাফ' নাটক ও একটি ছোট গল্পের বই বেরিয়েছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'বেড রুম' বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেল। বাস্তবতার নামে অশ্লীলতা প্রচার করা হয়েছে বলে সমালোচকদের তীব্র মন্তব্যই হয়ত এর কারণ।

ঘরকন্নার দিকে এসেনের দৃষ্টি নেই। স্ট্রীণ্ডবার্গকেই তুচ্ছ বিষয়ও দেখা শোনা করতে হয়। এসেন দু'হাতে টাকা খরচা করে। থিয়েটারে তার যে প্রতিষ্ঠা হবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবু নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সে যেন সর্বদা নাটকের জগতেই বিচরণ করে। তার পুরুষ বন্ধুর এখন অন্ত নেই, স্বামীর সম্মুখেই তাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। কিছু বলা যায় না; বললে বলে, অভিনয় শিখছি। কোনো কোনো মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে তার এত অন্তরঙ্গতা যে, স্ট্রীণ্ডবার্গ অস্বাভাবিক সম্পর্ক সন্দেহ করেন।

সংসারে ব্যয়বাহুল্যের জন্য স্ট্রীণ্ডবার্গকে অতিরিক্ত আয় করতে হয়। আপিসের কাজ ছাড়া সকালে ও রাত্রিতে নিয়মিত ভাবে লিখতে হয় টাকার জন্য। তা ছাড়া সংসারের ভারও তাঁর উপর। এত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন বাইরে থেকে ঘুরে আসতে। এসেনের শরীরও ভালো যাচ্ছে না। স্ট্রীণ্ডবার্গ ভাবলেন, থিয়েটারের পরিবেশ থেকে দূরে গেলে হয়ত তাঁদের সম্পর্ক নিবিড় হবার সুযোগ পাবে। তাই ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে করে স্ট্রীণ্ডবার্গ বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন। ফ্রান্স থেকে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে থাকতে স্টক্‌হোল্‌মে তাঁর নতুন বই 'বিবাহিত' প্রকাশিত হল। পুস্তকের বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক, সুতরাং বিক্রি হল খুব। কিন্তু বিপদও এল। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন লেখক ও প্রকাশক। এই মামলা স্টক্‌হোল্‌মে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রগতিবাদীরা লেখককে সমর্থন জানালেন। শেষ পর্যন্ত স্ট্রীণ্ডবার্গ নিরপরাধ বলে রায় বেরুল।

স্ট্রীণ্ডবার্গ সপরিবারে আবার ফ্রান্সে ফিরে এলেন। বিশ বৎসরের ইহুদী তরুণী মেরী ডেভিডের সঙ্গে এখানে এসেনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছে। মিস্ ডেভিড এসেনকে আবার রঙ্গমঞ্চে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করে। স্ট্রীণ্ডবার্গের মনে সন্দেহ জাগে। স্ত্রীকে কতটুকু জানেন তিনি? যাকে ভার্জিন মেরীর প্রতিচ্ছবি মনে হয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ কি? কে জানে এসেনের পুরুষ ও নারী-প্রেমিক কত জন ছিল? যে সন্তানদের তিনি পালন করছেন তারা কি তাঁরই? কে বলবে? কি প্রমাণ আছে? সংশয়ের বিষে জর্জর তাঁর মন। তাঁদের প্রথম সন্তানটি কি সত্যি মারা গেছে? না তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে? এসেন দু'হাতে টাকা খরচ করত; সে টাকা সম্ভবত তার খোরপোষের জন্যই দিয়েছে।

স্ট্রীণ্ডবার্গ স্ত্রীর অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। নানা জায়গায় চিঠি-পত্র লিখে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজে বেরিয়ে যান; কিছু দিন খোঁজ-খবর করেও যখন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না তখন ফিরে এসে স্ত্রীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

এসেন গভীর মমতার সঙ্গে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, তোমার শরীর ভালো নেই, ডাক্তার দেখাও।

ডাক্তার! আবার সন্দেহ ফিরে আসে। চরিত্রহীনা মেয়েদের কার্যক্রম

এ পথেই চলে। ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিতে পারলেই নিষ্কণ্টক।

আবার অনুসন্ধান শুরু হয়। কিন্তু বাইরে অনুসন্ধান করে কি হবে? কারণ রয়েছে তাঁর অন্তরে। স্ত্রীর মধ্যে মা'কে পেতে চান; ছেলেবেলায় অনেক ভাই-বোনের মধ্যে মা'কে ভালো করে পাবার আশা তাঁর মেটেনি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সংকল্প করেছিলেন তাঁর জীবনে যে মেয়ে আসবে তাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে হবে! স্ত্রী কারো সঙ্গে হেসে কথা বললে, কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে, তা সইবে না। স্ত্রীর প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অনুভূতি, প্রতিটি লাবণ্যহিল্লোল শুধু তিনি উপভোগ করবেন। আর কেউ অংশ গ্রহণ করলে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে তাঁর মন।

এই সন্দেহের কোনো ওষুধ নেই। স্ত্রী কখনো সম্পূর্ণরূপে মা হতে পারে না। তাঁর সন্তানের মা হতে পারে। তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদটা একেবারে নিশ্চিত হয়ে উঠল।

স্ট্রীণ্ডবার্গ স্থির করলেন, তাঁর আত্মজীবনী রেখে যাবেন তাঁর রচনায়। পরস্পর-বিরোধী মানসিক অনুভূতির আবর্তে পড়ে তাঁর জীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছে। কেউ কেউ সন্দেহ করে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে তাঁর। তিনি নিজের মন বিশ্লেষণ করে দেখাবেন পাগল হননি তিনি। দেখাবেন, কোথায় তাঁর বেদনা। ফ্রয়েডের পূর্বে এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর কেউ করতে পারেনি। প্রত্যেকটি ঘটনার আশ্চর্য বিশ্লেষণ।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ফাদার' প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনার সকল বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যাবে এই নাটকটির মধ্যে। স্ট্রীণ্ডবার্গ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন; তিনি নিজেকে কখনো দ্বৈতবাদী, কখনো শান্তিবাদী, কখনো বা সোস্যালিস্ট বলে প্রচার করতেন। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁর মনে হল, শুধু সুইডেনের নাগরিক হয়ে থাকাটা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। তিনি বললেন, আমি বিশ্বের নাগরিক, কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আমি আবদ্ধ থাকব না। জীবনের শেষভাগে সোয়েডেনবর্গের প্রভাবের ফলে স্ট্রীণ্ডবার্গ আবার খ্রীষ্টধর্মে আস্থাবান হয়েছিলেন। কিন্তু এ-সব মত, বিশ্বাস ও পথ পরিবর্তন তাঁর সাহিত্যকে বড় একটা স্পর্শ করেনি। শুধু শেষ জীবনের রচনায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব দেখা যায়।

তাঁর রচনার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল নারীবিদ্বেষ। ইবসেন যখন

'নোরা'-বাদ প্রচার করছেন, তখন স্ট্রীণ্ডবার্গ দেখাচ্ছেন মেয়েরা নির্মম শোষণকারী ; পুরুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বকে ধূলায় মিশিয়ে দিতে চায়। তাঁর গল্পের বই 'বিবাহিত'-তে (১ম ও ২য় ভাগ)-এ এই মতবাদ প্রথম সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। তার পরে নীটশের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের ফলে এই মত আরো দৃঢ় হয়। নীটশে বলতেন, নারী হচ্ছে প্রকৃতির প্রতীক ; মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবী পুরুষকে সে বেঁধে রেখে খর্ব করতে চায়। মানুষের অতি-মানুষ (সুপারম্যান) হবার পথে বাধা এই নারী। তাই নারী ও পুরুষের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলে আসছে। আর এই দ্বন্দ্ব ঘরে ঘরে নানা রূপে দেখা দেয় ! স্ট্রীণ্ডবার্গও তাই বিশ্বাস করতেন। সুতরাং তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকের প্রধান উপজীব্য পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের নজির খোঁজবার জন্য তাঁকে বাইরে যেতে হয়নি ; নিজের জীবনের কাহিনীই ছিল যথেষ্ট। স্ট্রীণ্ডবার্গের রচনায় অতি সহজেই তাঁর জীবনকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জীবনের সাধারণ ভদ্রবেশটা দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি ; গোপনতম অনুভূতিকেও সকলের চোখের সামনে এনে নির্মম ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

'দি ফাদার' নাটকে স্ট্রীণ্ডবার্গের মানসিক দ্বন্দ্বের ছবি পাওয়া যাবে। নাটকের গতি থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, স্ট্রীণ্ডবার্গ আত্মকরুণাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। কাহিনীর নায়ক (ক্যাপ্টেন) কন্যা বার্থাকে শহরের স্কুলে পড়বার জন্য পাঠাতে চায়। কিন্তু স্ত্রী লরা তা দেবে না। মেয়েকে সে গ্রামের বাড়িতে রাখতে চায় ; তাহলে মেয়ের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবে। নিজের জেদ বজায় রাখবার জন্য এই নিষ্ঠুর মহিলা স্বামীর নিকট ইঙ্গিত করতে লাগল, বার্থা হয়ত তার মেয়ে নয়। ক্যাপ্টেন এমনিতেই স্নায়বিক দৌর্বল্যের রোগী, তার উপর বার বার স্ত্রীর মুখ থেকে এরূপ ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতের কথা শুনে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। লরা এতেই সন্তুষ্ট নয়। সংসারের পূর্ণ কর্তৃত্ব সে হাতে পেতে চায়। এরপরে তার চেষ্টা হল স্বামীকে পাগল বলে প্রমাণিত করা। ক্যাপ্টেন স্ত্রীর ষড়যন্ত্রের পরিচয় পেয়ে সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে স্ত্রীকে আক্রমণ করে যখন পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল তখন নিজের বাড়িতেই অন্য লোকের হাতে বন্দী হল। সে যে সত্যি পাগল তাতে আর ভুল কি ? প্রবল মানসিক আঘাতের ফলে ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হল। লরার সর্বময় কর্তৃত্বের পথে আর কোনো বাধা রইল না।

লরার মতো এসেনকে নিষ্ঠুর করে দেখাবার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নিজের করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য স্ত্রীর নির্মমতাকে বড় করে দেখানো দরকার ছিল। লরার প্রত্যেকটি কথা ও কাজের যে নগ্ন ও বাস্তব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ফ্রয়েডের পূর্বে তার তুলনা পাওয়া ভার। লরার পশ্চাতে কে দাঁড়িয়ে আছে, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের তা বুঝতে কষ্ট হল না। এসেন তো তাঁর স্ত্রী নয়; সে যেন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের অসহায় ইঁদুর। ছুরি দিয়ে নির্মম ভাবে কেটে কেটে সব দেখতে চেয়েছে, কিছুই গোপন রাখেনি।

এই নাটক প্রকাশিত হবার পর তাঁদের দাম্পত্যজীবন সংবাদপত্রে এবং সাহিত্যের আসরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। বিবাহ-বিচ্ছেদের যে দেরি নেই, সে খবরও রটে গেল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েই গেছে; তবু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনত সম্পন্ন হতে আরো বছর চারেক দেরি হল। 'দি ফাদার' নাটক ছাড়া আর একটি রচনার জন্যও বিচ্ছেদটা সুনিশ্চিত হয়েছিল। এই বইটির নাম 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি।' স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁর বিবাহিত জীবনের স্মৃতিকথা অকপটে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গ্রন্থে। নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কোনো শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি যে এমন বই লিখতে পারে, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্যে বোধ হয় আর নেই! স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে না পেরে এই বইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছেন। পুস্তকের শেষ কথা এই: প্রিয়তমে, এই বই আমার প্রতিশোধ।

এই বইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল লেখকের এগজিবিশনিজম এবং আত্ম-বিশ্লেষণের দক্ষতা। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ বাতিক দেখা দিলে স্বামীর মন কোন্ পথে চলে, তার এমন নিপুণ বিশ্লেষণ বিরল।

স্ট্রীণ্ডবার্গের মন যখন একটি মাত্র ভাবনায় আচ্ছন্ন তখনো যে তিনি 'মিস্ জুলির' (১৮৮৮) মতো সুন্দর নাটক লিখতে পারলেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। স্ট্রীণ্ডবার্গের একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি এই নাটকটি। তাঁর নারীবিদ্বেষ এখানে প্রাধান্য লাভ করেনি। নায়িকা জুলি তার মা'র পুরুষ-বিদ্বেষের আবহাওয়ায় জন্মেছে। কিন্তু বাবা তাকে পুরুষের মতো গড়ে তুলতে লাগল। এর ফল হল এই যে, তার প্রথম প্রেমিক তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। এর পরে উৎসব উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে এসে জুলি নিজে উপযাচিকা হয়ে তাদের তরুণ পরিচারক জীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করল। জীন সমাজের নিচু স্তরের ছেলে,

তার মধ্যে আবেগ বা রোমাঞ্চ নেই ; তার মাথা বেশ ঠাণ্ডা এবং সে কার্যবুদ্ধি-সম্পন্ন। জুলিকে সে প্রথম এড়াতে চেয়েছে। কিন্তু শেষে যৌবন তাকে ভোলালো। তাদের ঘনিষ্ঠতা যখন অনেক দূর এগিয়েছে, তখন জুলির বাবার আসবার কথা শোনা গেল। জুলি কলঙ্ক এড়াবার জন্য প্রস্তাব করল দু'জনেই কোথাও পালিয়ে যাবে। জীন প্রেমিক হলেও সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে জানে ক্ষুধার হাত থেকে পালানো যাবে না। সে প্রস্তাব করল, দু'জনে মিলে একটা হোটেল খোলা যেতে পারে। জুলির টাকা নেই ; টাকা সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেল। জীনের ক্ষুর হাতে করে সে বেরিয়ে গেল ; আত্মহত্যা করবে। মুক্তির আর কোনো পথ নেই। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলবার সাহস নেই যে, আমি জীনকে ভালোবাসি ; অথবা, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার ভরসাও নেই। অভিজাত সমাজের চারিত্রিক দুর্বলতা জীবনে যে ট্র্যাজেডি আনে, এই নাটকে স্ট্রীণ্ডবার্গ তাই দেখিয়েছেন।

স্টক্‌হোল্‌মে ফিরে স্ট্রীণ্ডবার্গ বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করলেন। এসেনের যা স্বভাব-চরিত্র, তাতে সন্তানদের মানুষ করবার ভার তার উপর থাকা সঙ্গত নয়। বিচ্ছেদ চাইবার এই ছিল কারণ। স্ট্রীণ্ডবার্গ এখন সুখ্যাতি এবং কুখ্যাতি দুই-ই অর্জন করেছেন। সুতরাং স্টক্‌হোল্‌মে এই মামলা নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেল। পারিবারিক জীবনের কিছুই আর গোপন রইল না। আদালতের জেরা এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কৌতূহল দাম্পত্য জীবনের গোপনতম কথা প্রকাশ্যে টেনে আনল। এত দিন স্ট্রীণ্ডবার্গের কল্পনাপ্রসূত নাটকের অভিনয় হয়েছে রঙ্গমঞ্চে ; এবার তাঁর জীবনের নাটক সকলে পরম আগ্রহে দেখছে।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসেনের সঙ্গে আইনত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সন্তানদের ভার থাকল স্ত্রীর উপর। স্ট্রীণ্ডবার্গকে তাদের ভরণপোষণের জন্য টাকা দিতে হবে। আবার জীবন রিক্ত হয়ে গেল। ছেলেরা তাঁকে খুব ভালোবাসত না ; কিন্তু ওদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আসক্তি। সন্তান গর্ভে এলে মা'র দেহ-মনে যেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি জেগে ওঠে, স্ট্রীণ্ডবার্গও তেমনি স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনায় নিজের অস্থি-মজ্জায় একটা অদ্ভুত পরিবর্তন উপলব্ধি করতেন। সন্তানের জন্য একই সঙ্গে তাঁর হৃদয় মা ও বাবার বাৎসল্য রসে ভরে উঠত। নারী ও পুরুষের মিশ্রণে গড়া তাঁর হৃদয়।

রয়েল লাইব্রেরির চাকরি অনেক দিন গেছে। লেখক হিসেবে নাম হয়েছে, বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নয়, কিন্তু রয়েলটির পরিমাণ বড় কম। যিনি মঙ্গলের দেবতা, তাঁর দান বড় কৃপণ। এবার থেকে বিজ্ঞান ও শয়তানের সাধনা করবেন। দেখা যাক, সেখানে কি পাওয়া যায়।

ফাউস্টের দেশ জার্মানী! শয়তান-সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। তাঁর 'ফাদার' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলছে বার্লিনে। সুতরাং স্ট্রীণ্ডবার্গ বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এক সঙ্গে শুরু হল বিজ্ঞান ও শয়তানের সাধনা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনা তৈরি করবার গবেষণা শুরু করলেন। ছোট ঘরের মধ্যে বসে গন্ধক ইত্যাদি নানা জিনিস নিয়ে কেবল পরীক্ষা চলে। সর্বদা আশা করে আছেন, শয়তান তাঁর সামনে এসে আত্মার বিনিময়ে বর দিতে চাইবে। আত্মার বিনিময়ে তিনি জীবনের সকল অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেবেন।

শয়তানের পরিবর্তে একদিন তাঁর ঘরে এসে উপস্থিত হল মহিলা সাংবাদিক ফ্রিডা উল। অল্পবয়স্কা তরুণী। এই সুইডিশ নাট্যকার সম্বন্ধে তার কৌতূহলের শেষ নেই। কৌতূহলটা শুধু সাংবাদিক হিসাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবেও ফ্রিডা স্ট্রীণ্ডবার্গকে জানতে চায়। স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁর নিঃসঙ্গ প্রবাসী-জীবনে ফ্রিডার সঙ্গ পেয়ে স্বস্তি অনুভব করলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। এবং ফ্রিডারই আগ্রহে কিছু দিন পরে তাঁদের বিয়ে হল।

বিয়ের পরে স্ট্রীণ্ডবার্গ ফ্রিডাকে অনুরোধ করেছিলেন সে যেন 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' বইটি না পড়ে। কিন্তু ফ্রিডা সে অনুরোধ রক্ষা করেনি। ঐ বই থেকে স্বামীর মানসিক গঠনের পরিচয় পেয়ে ফ্রিডা শিউরে উঠল। স্ট্রীণ্ডবার্গের স্ত্রীকে একান্ত করে পাবার সঙ্কীর্ণচিত্ততা অল্পদিনের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করল নগ্নমূর্তিতে। সুতরাং আর এক বার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের এক সপ্তাহ পূর্বে প্যারিসে নতুন উদ্যমে 'ফাদার'-এর অভিনয় শুরু হল। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে জোলা, প্রাভো, রোদাঁ, গগাঁ, প্রভৃতি প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরদিন কাগজে কাগজে নাটকের প্রশংসা বেরুল। প্যারিসের নাগরিকরা নারী-বিদ্বেষের সুরটি বড় পছন্দ করেছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার এসে স্ট্রীণ্ডবার্গের সঙ্গে দেখা করে যায়। ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য তিনি সকলের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলেন।

স্ট্রীণ্ডবার্গ কোনো উৎসাহ বোধ করেন না। জীবনে ও রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটক তিনি দেখেছেন। বিজ্ঞান-সাধনা এখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সাহিত্য রচনা বন্ধ হয়েছে। তিনি লিখছেন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোনার মতো উজ্জ্বল একটা পদার্থ আবিষ্কার করতে পেরেছেন; সেটা গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। কেউ এলেই সেটা দেখান, আর বলেন: প্রচুর পরিমাণে সোনা তৈরির আর দেরী নেই।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ নেই। দু'বেলা খাবার পয়সা নেই। 'ফাদার' খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলেও সকলের দাবি মিটিয়ে লেখকের ভাগ্যে যে রয়েলটি জুটেছে তা যৎসামান্য। দু'মাস আগেও স্ট্রীণ্ডবার্গের নামে প্যারিস মুখরিত ছিল। এখন ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতা পরে খালি পেটে টলতে টলতে যখন পথ চলেন, কেউ এগিয়ে এসে কুশল প্রশ্নও করে না।

শয়তানের আগমনেব অপেক্ষায় আছেন তিনি। রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করছেন থিয়সফি ও ভৌতিক বিদ্যার চর্চা। এসেনের ছেলেমেয়েরা কড়া চিঠি লেখে আদালত-নির্ধারিত খরচের টাকা পাঠাতে। সেই চিঠি হাতে করে কিছুক্ষণের জন্য উন্মনা হয়ে যান। তার পরে আবার অন্যমনা হয়ে আরম্ভ করেন তাঁর সাধনা। দু'বেলা ভালো করে খাবার জোটে না, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনার সামর্থ্য নেই। তবু ঘরের মধ্যে বসে বসে কেবল একই চিন্তা। একই ভাবনা। এর ফলে মাঝে মাঝে অতিপ্রাকৃত দৃশ্য দেখতে পান; নানা রকম অদ্ভুত শব্দও শোনা যায়। সব ভৌতিক কাণ্ড। হয়ত কখনো পাশের ঘরে ক্রমাগত তিন দিন ধরে কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে: কখনো বা ছাদের উপর দুপ-দাপ শব্দ হয়; আবার কখনো দেখতে পান গলা টিপে ধরবার জন্য একটা কালো হাত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে তিনি এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় খোঁজেন। কিন্তু মনের সামনে থেকে কালো কালো ছায়াগুলিকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না।

ক্নুট হামসুন তখন প্যারিসে থাকেন। স্ট্রীণ্ডবার্গের নিঃস্ব অবস্থা দেখে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় সুইডেন ও নরওয়ের পত্রিকায় আবেদন জানালেন। খুব সাড়া পাওয়া গেল। টাকা আসতে লাগল। বার্লিনের এক থিয়েটার কর্তৃপক্ষ স্ট্রীণ্ডবার্গের জন্য সাহায্য-রজনী করবেন বলে ঘোষণা করলেন। স্ট্রীণ্ডবার্গ তো উঠলেন ক্ষিপ্ত হয়ে। বেঁচে থাকতেই সম্মান গেল! ভিক্ষার

টাকায় খেতে হবে! এত যদি তোমাদের দয়া, তবে আমার ছেলে-মেয়েদের দেখ; তাহলেই আমার তৃপ্তি হবে।

ক্রমশঃ স্ট্রীণ্ডবার্গের জীবনে একটা নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দিল। খ্রীষ্টধর্মে আস্থা হারিয়ে তিনি দূরে চলে গিয়েছিলেন। আবার তাঁর বিশ্বাস ফিরে আসছে। সোয়েডনবর্গের রচনা তাঁকে সাহায্য করেছে এই পরিবর্তনে। মনের অশান্তি এত দিনে কমল। দীর্ঘকাল পরে তিনি সাহিত্য-সাধনায় নতুন করে মনোনিবেশ করলেন। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্ত্রীণ্ডবার্গের পাঠকরা আনন্দ লাভ করল। তাই তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মদিনে দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য অভিনন্দন আসতে লাগল; সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।

এবার থেকে স্ত্রীণ্ডবার্গের সুদিন এল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুইডেনে ফিরে এলেন। ঐ বছরই তাঁর সাহিত্য-সাধনার দ্বিতীয় পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক 'দেয়ার আর ক্রাইমস্ অ্যাণ্ড ক্রাইমস্' প্রকাশিত হয়। তরুণ নাট্যকার মরিস উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে গিয়ে যে-সব অপরাধ করেছে এখানে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মরিস যে-সব অপরাধ করেছে তাদের তালিকা অবশ্য কোনো দেশের 'ক্রিমিনাল কোডে'ই পাওয়া যাবে না। অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে, তাই শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে মরিসের আত্মাকেই। ধর্মের নিকট আত্মসমর্পণ করে মরিস মুক্তি লাভ করল। স্ত্রীণ্ডবার্গের জীবনকে এই নাটকের মধ্যে সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

স্ট্রীণ্ডবার্গের নতুন বই বের হচ্ছে। তাঁর নাটক অভিনীত হয় স্টক্‌হোল্‌ম এবং অন্যান্য শহরে। অর্থকষ্ট দূর হয়েছে, সাহিত্য জগতে এবং সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু হৃদয় শূন্য। তাঁকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড়; মনের নিকটে আসবার মতো একটি লোক নেই। এই নিঃসঙ্গ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

হ্যারিয়েট বস্ নামে এক নবাগতা তরুণী স্ট্রীণ্ডবার্গের নাটকে নায়িকার অভিনয় করে। সেই সূত্রে আলাপ হল। হ্যারিয়েটের সরলতাপূর্ণ আন্তরিক ব্যবহার বড় ভালো লাগল স্ট্রীণ্ডবার্গের। একদিন নিজের ফ্ল্যাটে আমন্ত্রণ করে হ্যারিয়েটকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সন্তানের মা হবে?

স্ত্রীণ্ডবার্গের মতো প্রসিদ্ধ লোক যদি প্রস্তাব করেন, তাহলে সামান্য এক

জন অভিনেত্রীর পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। ভালোবেসে নয়, আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে হ্যারিয়েট সম্মত হল।

বিয়ের পরে স্ত্রীণ্ডবার্গ হ্যারিয়েটকেও সাবধান করে দিলেন যে, সে যেন 'নির্বোধের স্বীকারোক্তি' বইটি না পড়ে। বই দূরে রাখা সম্ভব হতে পারে; কিন্তু স্ত্রীণ্ডবার্গের মন? সেই পুরনো ঈর্ষা আর সন্দেহ ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল। হ্যারিয়েট থিয়েটার করে, কত লোকের সঙ্গে পরিচয়; কারো সঙ্গে একটু হেসে কথা কইলে স্ত্রীণ্ডবার্গের হৃদয়ে জ্বালা ধরে যায়। রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে বাড়ি চলে আসবে, বাইরে কোনো লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে না;—এই তিনি চান। স্ত্রীণ্ডবার্গের প্রবল কিন্তু সঙ্কীর্ণ প্রেম হ্যারিয়েটের জীবনে ফাঁসের মতো ধীরে ধীরে এঁটে বসতে লাগল। হ্যারিয়েট ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

এই সময় স্ত্রীণ্ডবার্গ সমাপ্ত করলেন তাঁর রূপক নাটক 'দি ড্রিম প্লে (১৯০২)'। এই নাটকের বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই স্বপ্নের মতো অযৌক্তিক; কিন্তু রূপকের ইঙ্গিতার্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। স্ত্রীণ্ডবার্গ মনে করতেন এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।

দেবরাজ ইন্দ্রের দুহিতা পিতাকে প্রশ্ন করলেন, পৃথিবীতে দুঃখের কারণ কি? বাইরে থেকে সেখানকার জীবন তো বেশ সুন্দর দেখায়? কিন্তু সেই সৌন্দর্যের আবরণ ভেদ করে সব সময়ই শোনা যায় একটা চাপা আর্তনাদ। কিসের এই দুঃখ?

ইন্দ্র বললেন, তুমি নিজেই পৃথিবীতে গিয়ে এর কারণ জেনে এস।

ইন্দ্র-তনয়া পৃথিবীতে মানবী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি হলেন আইনজীবির স্ত্রী। জীবনের বিচিত্র রূপ এবার নাটকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচ্চপদস্থ কর্মচারী, আইনজীবী, মনীষী, কবি প্রভৃতিকে একে একে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করা হল। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি স্ত্রীণ্ডবার্গেরই বিভিন্ন সত্তার প্রতীক। ইন্দ্র-তনয়াও তাঁর মধ্যকার নারীসত্তার রূপায়ণ। স্বর্গের দেবী পৃথিবীর জীবনে বন্দী হয়ে যে বেদনা ভোগ করেছেন, তার মধ্যে স্ত্রীণ্ডবার্গের সাংসারিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট মূর্ত হয়ে উঠেছে। আত্মা ঈশ্বরের অংশ-বিশেষ; ঐশ্বরিক অংশের সঙ্গে পার্থিব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয় বলেই মানুষের এত কষ্ট। পৃথিবীতে বধূজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রের কন্যা বুঝতে পারলেন, প্রত্যেক মানুষই করুণার পাত্র—বিশেষ করে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা। কবি

যখন ইন্দ্র-দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পৃথিবীর জীবনে কি তাঁকে সব চেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে তখন তিনি বললেন, বেঁচে থাকাটাই বেদনাদায়ক। এর মতো আর দুঃখ নেই। চোখ আছে দেখতে পাইনে, কান আছে শুনতে পাইনে, মাথা আছে তবু চিন্তার স্বচ্ছতা গেছে হারিয়ে। ভগবান মানুষকে ইন্দ্রিয় দিয়ে তার হৃদয়-বৃত্তি স্তিমিত করে রেখেছেন। চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা করে কর্তব্য শেষ করি। হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার কথা ভুলে গেছি।

হ্যারিয়েট বস্‌ও চলে গেল। কাউকে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। এসেন, ফ্রিডা, হ্যারিয়েট বস্ এদের সবাইকে তিনি নিবিড় করে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পেলেন না। শৈশবে মাকে যেমন একান্তরূপে চেয়েছিলেন, তেমন করে পাননি। সেই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় জারিত হয়ে মা'র মূর্তি তাঁকে আগলে রেখেছে। অন্য কোনো নারী তাঁর জীবনে তাই স্থান পেল না।

বাইরে তাঁর খ্যাতি যতই বাড়ছে, ভক্তের দল যতই শ্রদ্ধার অর্ঘ নিয়ে আসছে, তাঁর অন্তর ততই শূন্য হয়ে উঠেছে। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। জনতার শ্রদ্ধার্ঘ হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না; যাদের ভালোবেসেছিলেন তাদের এক জনের সঙ্গ কামনায় ভিতরে ভিতরে তাঁর মন ব্যাকুল। বাইরে তিনি শান্ত।

পাকস্থলীর ক্যান্সার রোগে কিছুকাল ভুগে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে স্ট্রীণ্ডবার্গ পরলোক গমন করেন। জনতার শোভাযাত্রা যেন তাঁর শবানুগমন না করে, এই ছিল তাঁর শেষ অভিপ্রায়। কিন্তু সে কথা কেউ শোনেনি। ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, শ্রমিক, প্রভৃতি দলে দলে তাঁর শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিল। তাঁর জীবনে যারা গভীর আনন্দ-বেদনার কারণ হয়েছিল সেই তিন জন এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়নি। এসেনের কয়েক দিন আগে মৃত্যু হয়েছে। ফ্রিডা জার্মানীতে। হ্যারিয়েট বসের কোনো সন্ধান মেলেনি।

পার লাগেরকভিস্ট

১৮৯১—

১৯১২ সালে সুইডিশ কবি এরিক কার্লফেলটকে নোবেল পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কবি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করবার সমর্থনে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, স্বদেশের বাইরে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে পুরস্কারের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি তা সুইডেনের মুষ্টিমেয় পাঠকের মতামতের উপর নির্ভর করে দেওয়া উচিত হবে না। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ সালের নোবেল পুরস্কার লাগেরকভিস্টও প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কারণ তখন পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি প্রধানত সুইডেনের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

স্বদেশবাসীরা জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে লাগেরকভিস্টকে গভীর শ্রদ্ধা করে। কিন্তু দেশের লোকও তাঁর জীবন সম্বন্ধে অল্পই জানে। স্টক্‌হোল্‌মের বাইরে ছোট একটি দ্বীপে লোকচক্ষুর অন্তরালে লাগেরকভিস্ট বাস করেন। নিজেকে নিয়ে একা থাকতেই তাঁর ভালো লাগে। এমন কি, স্বরচিত নাটকগুলির অভিনয়ের সময়ও কদাচিৎ তাঁকে থিয়েটারে দেখা যায়। মনন-প্রধান লেখক হিসাবে তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক।

১৮৯১ সালের ২৩শে মে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলে ভ্যাক্সিও নামক একটি ছোট শহরে পার ফেবিয়ান লাগেরকভিস্ট (Par Fabian Lagerkvist) জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপ্রাণ চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম। লাগেরকভিস্টের পিতা চাষাবাদ করে স্থানীয় রেল-স্টেশনে লাইনস্‌ম্যানের চাকরি আরম্ভ করেন। উনিশ বছর বয়সে লাগেরকভিস্ট স্থানীয় স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রক্ষণশীল পরিবারের প্রগাঢ় ধর্মপ্রীতি ছাত্র জীবনেই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে। নতুন নতুন চিন্তাধারার আবর্তে সুইডেনের ছাত্রসমাজ তখন উদ্‌ভ্রান্ত। ধর্মের প্রতি অন্ধ আসক্তি তাঁর ছিল না। যৌবনে তিনি অনেকবার ধর্ম ও বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রভাবের ছাপ মুছে ফেলতে পারেন নি। পারিবারিক সংস্কার

এবং নতুন ভাবাদর্শ—এই দুই বিপরীতমুখী ভাবের দ্বন্দ্ব লাগেরকভিস্টের প্রথম দিকের রচনায় সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় একটি সাময়িক-পত্রে তাঁর কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'মানুষ' নামে একটি উপন্যাসও এই সময় বেরিয়েছিল। আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ১৯১৩ সালে লাগেরকভিস্ট ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই ভ্রমণের নেশা তাঁকে কখনো ত্যাগ করেনি। সুইডেনের অসংখ্য সমুদ্রখাড়ির মধ্যে নৌকাবিহার লাগেরকভিস্টের বড় প্রিয়। শুধু সুইডেন নয়, য়ুরোপের বহু স্থানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন—বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে।

আপসালা থেকে লাগেরকভিস্ট প্রথম এলেন কোপেনহেগেন, সেখান থেকে অনেক ঘুরে-ফিরে পৌছলেন প্যারিস। এখানকার নবশিল্প আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে তাঁর শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে এতদিনের ধারণা পরিবর্তিত হল। কিউবিস্ট শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি তাঁর তরুণ মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশে ফিরে কিউবিজমের উপরে একটি প্রবন্ধ এবং 'শব্দশিল্প ও চিত্রশিল্প' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কাব্যের আঙ্গিক কিউবিস্ট শিল্পীদের পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হবে এই ছিল তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কাব্য রচনার পুরনো রীতি ছেড়ে এই নতুন পথ অবলম্বন করলে শব্দরচিত ছবিগুলি শিল্পীর আঁকা ছবির মতো প্রত্যক্ষ ও রঙীন হয়ে উঠবে। লাগেরকভিস্ট নিজেই কাব্য-রচনার এই আদর্শ সামনে রেখে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'মোটিভ' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে এই পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যে কিউবিজমের আদর্শ সাফল্যের সহিত রূপায়িত হয়নি; বরং তিনি অলক্ষ্যে চিরাচরিত রীতির পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। লাগেরকভিস্টের কবিতা সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর; তাঁর কাব্য-প্রবাহ অনায়াস গতি-ভঙ্গিমা লাভ করেনি।

লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-জীবন অনেক পরীক্ষা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। জীবনের প্রথমভাগে তিনি সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন। সে সময় জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন ছিল সংশয়ে আচ্ছন্ন। প্রধানত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগেই তিনি কাব্যের ফসল সঞ্চয় করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আনন্দ উচ্ছল হয়ে ওঠেনি। পথ ও লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা কবিকে যে বেদনা দিয়েছে তারই প্রকাশ দেখতে পাই Angest বা

যন্ত্রণা (১৯১৬) নামক কাব্য-গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের পরে তিনি সুইডিশ সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেন। ভাবের মৌলিকতা, সুষ্ঠু শব্দ চয়ন এবং প্রতীকের সুন্দর প্রয়োগ অবিলম্বে বিদগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কাব্য-গ্রন্থ সুইডিশ্ সাহিত্যের প্রথম এক্সপ্রেশানিস্ট রচনা হিসাবেও গৌরবের দাবি রাখে।

স্বদেশের বাইরে লাগেরকভিস্ট অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসাবে। কিউবিস্ট শিল্পীরা আধুনিক চিত্র-শিল্পে নতুন শক্তির প্রেরণা এনেছেন ; সেই তুলনায় একালের উপন্যাস আঙ্গিক ও ভাবের দিক থেকে অনেক দুর্বল। কিন্তু এখানেও তিনি কিউবিস্ট শিল্পীর আদর্শ প্রয়োগ করতে পারেন নি। নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্লাসিক্যাল আদর্শ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। সফল ভাস্করের মতো তাঁর রচনা-শিল্পে বাহুল্যের স্থান নেই। যা-কিছু লক্ষ্যের অতিরিক্ত তা তিনি নির্মমভাবে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। আজকের দিনে ক্লাসিক্যাল রীতির প্রতি এত বড় নিষ্ঠা কদাচিৎ দেখা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব লাগেরকভিস্টের রচনার ধারা পরিবর্তন করেছে। তিনি নিজেকে বলতেন 'a religious atheist' বা ধর্মাশ্রয়ী নাস্তিক। কিন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে ধর্মের উপরে আস্থাও টলে উঠল। মনের বেদনার জোরালো প্রকাশের জন্যই প্রথম তিনি নাটক রচনায় হাত দিলেন। তাঁর প্রথম নাটক 'শেষ মানুষ' (১৯১৭) ভবিষ্যতে মানুষের কী শোচনীয় পরিণতি হবে তারই নির্মম চিত্র। লাগেরকভিস্ট দেখিয়েছেন মানুষ একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, যুদ্ধ তারই সূচনা। নাটক রচনায় তিনি ইবসেনের বাস্তবতার পথ অনুসরণ করেন নি। নাটকে (এবং উপন্যাসেও) তিনি প্রতীক ব্যবহারের পক্ষপাতী। এদিক থেকে স্ট্রীণ্ডবার্গের সঙ্গে তাঁর নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯২০ সালের পর থেকে কয়েক বছর লাগেরকভিস্ট ফ্রান্স ও ইতালীতে কাটিয়েছেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যে নতুন নতুন রচনার প্রেরণা পেয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর কাব্য উপন্যাস ও নাটকে। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত 'যাকে নতুন করে জীবন শুরু করতে দেওয়া হয়েছিল' নাটকে লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রতীকের অস্পষ্ট জগৎ থেকে তিনি জীবনের কাছাকাছি নেমে এসেছেন, দৈনন্দিন

জীবনে ব্যবহৃত ভাষাতেই তাঁর পাত্র-পাত্রীরা কথা বলতে আরম্ভ করেছে। পুর্বে নাটকের জগতের সঙ্গে দর্শকদের যে বিরোধ ছিল তা অনেকটা দূর হল।

লাগেরকভিস্ট তাঁর নাটক সমাজের নীচতা ও হীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় নিরাশাবাদই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'আমাদের বাঁচতে দাও' (১৯৪৯) নাটিকায় একটা নতুন আশাবাদের সূচনা দেখতে পাই। বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান' নাটকের অনুরূপ এখানে মিলিত হয়েছেন যীশু, সক্রেটিস, জোয়ান অব আর্ক, লাঞ্ছিত নিগ্রো প্রভৃতি। পরলোকে এঁরা সবাই মিলিত হয়ে পৃথিবীতে যে অকারণ দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য বিচার দাবি করছেন। শুধু যীশুর কোনো নালিশ নেই। পাত্র-পাত্রীদের বক্তৃতা থেকে জানা গেল লাগেরকভিস্টের ঈশ্বর কিংবা মানুষ কারো উপরেই আস্থা নেই; আস্থা আছে আত্মার অবিনশ্বরত্বে; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, শেষ পর্যন্ত আত্মা অশুভকে জয় করতে সমর্থ হবে।

স্বদেশে লাগেরকভিস্ট নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও সে খ্যাতি বিদগ্ধ পাঠক সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ। তাঁর নাটক মঞ্চাভিনয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তাঁর নায়ক-নায়িকা কাজের চেয়ে কথা বলে বেশি; তাদের গতিবিধি রূপক এবং কল্পনার রাজ্যে। বিজ্ঞানপুষ্ট য়ুরোপীয় মঞ্চকলাও সে জগতকে যথাযথরূপে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ লাগেরকভিস্ট সাহিত্য-সাধনা করছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তার লোভে কখনো নিজের আদর্শ থেকে চ্যুত হননি। দর্শকের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক রচনা করবার কথা তাঁর মনে হয়নি। তাই তাঁর অধিকাংশ নাটকই প্রচলিত অর্থে নাটক নয়। 'আমাদের বাঁচতে দাও' নাটকটি কয়েকটি চরিত্রের নিজ নিজ জীবন সম্বন্ধে বিবৃতির সমষ্টি মাত্র। ঘটনা নেই, সংঘাত নেই, উত্থান-পতন নেই। শুধু লেখকের একটি বলিষ্ঠ বক্তব্য আছে। সেই বক্তব্যকে জোরালো করবার জন্যই লেখক নাট্যরূপের আশ্রয় নিয়েছেন।

নাটকের মতো লাগেরকভিস্টের উপন্যাসেও একটি বক্তব্য আছে। ১৯৩৩ সালে হিটলারের দমননীতি যখন চরমে উঠেছে এবং য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও যখন হিংসা উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে তখন Bodeln বা জল্লাদ প্রকাশিত হয়। আকারের দিক থেকে বিচার করলে একে উপন্যাস না বলে বড় গল্প বলা সঙ্গত। এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র জল্লাদ হিংসার প্রতিমূর্তি। সংসারের

কলহাস্যমুখর জনস্রোতের মধ্যে সে উদ্যত তরবারি হাতে রক্তবর্ণ পোশাক পরে বসে আছে, কখন কার মাথায় তরবারি নেমে আসবে ঠিক নেই। জল্লাদ বলে, মানুষই আমাকে বার বার ডেকে আনে। হিংসার উত্তাপে পৃথিবী যখন তপ্ত হয়ে ওঠে তখনই হয় আমার আবির্ভাব। এই কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চে সাফল্য অর্জন করেছিল।

১৯৪৪ সালে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস Dvärgen অথবা বামন প্রকাশিত হয়। এর প্রধান নায়ক রেনেসাঁস যুগের ইতালীর রাজসভার আশ্রিত এক বামন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে 'অব-মানুষ' বাস করে বামন তারই প্রতীক। সভ্যতার মুখোসের অন্তরালে যে-সব পশু-প্রবৃত্তি সত্য ও মহৎকে ব্যর্থ করবার চক্রান্ত করছে, লাগেরকভিস্টের নির্মম, তীক্ষ্ণ লেখনী তাদের বিরুদ্ধে এবং আধুনিক মানুষের সীমাহীন লোভ ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে।

লাগেরকভিস্টের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বারাব্বাস' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ সালে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপের রসিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। তাদের পুরোধা হয়ে আঁদ্রে জিদ্ উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখকের প্রশংসা করলেন। আখ্যানবস্তুর নবত্বে এবং রচনাশৈলীর প্রাঞ্জলতায় লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-প্রতিভা 'বারাব্বাস'-এ পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে তাঁর বিদ্রূপের স্বর কোমল হয়ে এসেছে, গভীরতর নীতিবোধ গল্পের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এবং একটা বেদনার ছায়া পাঠকের মন অভিভূত করে তোলে। জটিল, নীতিমূলক আখ্যানবস্তুকে উপন্যাসের উপযোগী করে তোলবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন লাগেরকভিস্ট তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রাঞ্জল কবিত্বময় ভাষাপ্রবাহে পাঠকের মন পালতোলা নৌকার মতো ভেসে চলে।

'বারাব্বাস'-এর কাহিনীর কাঠামোটি বাইবেল থেকে নেওয়া। ইহুদীদের জাতীয় উৎসবের দিনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের মধ্য থেকে এক জনকে মুক্তি দেবার প্রথা ছিল। ধর্মান্ধ পুরুতদের চক্রান্তে সে যুগের কুখ্যাত দস্যু বারাব্বাস মুক্তি পেল, যীশুর প্রাণদণ্ড বহাল থাকল। তরুণ তাপস যীশুর ভাস্বর মূর্তি বারাব্বাসের উপর এমন এক মোহ বিস্তার করল যে মুক্তি পেয়েও সে চলে যেতে পারল না। বারাব্বাস বধ্যভূমিতে এসে যীশুর আত্মদান দেখল এবং এই ঘটনা তার মনের ভিত্তিভূমিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলল। এরপর থেকে তার সহকর্মীদের হৈ-চৈ আর ভালো লাগে না, বিতৃষ্ণা এল নারী ও সুরায়। জেরুজালেমের রাস্তায় বেরিয়ে অভিজ্ঞতা হল আর এক

বিপদের। সবাই তাকে দেখিয়ে বলে, এই লোকটা মুক্তি পেয়েছে বলেই যীশুর প্রাণদণ্ড হয়েছে। জেরুজালেমের আবহাওয়া তার প্রতি নীরব ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠল, অথচ তার কোনো দোষ বা হাত ছিল না এ ব্যাপারে।

দস্যুদলের নেতৃত্ব নিয়ে বারাব্বাস জেরুজালেমের বাইরে চলে গেল। কিন্তু দস্যুবৃত্তিতে তার মন নেই। তার নিষ্ক্রিয়তায় অনুচরদের মধ্যে অসন্তোষ জেগে উঠল। এর কিছুকাল পরে বারাব্বাঁসকে দেখা গেল রোম সম্রাটের এক তামার খনির মজুর হিসাবে। তার সহকর্মী শাহক যীশুর অনুরাগী,—সে গলায় একটি চাক্‌তি ঝুলিয়ে রেখেছে যীশুর নাম খোদাই করে। যীশুকে দেখবার সুযোগ হয়নি তার ; সে বারাব্বাসের কাছ থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে যীশুর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। ক্রমে বারাব্বাসও যীশুর নামাঙ্কিত চাকতি গলায় ধারণ করল এবং চুপি চুপি দু'জনে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল।

খবর বেশিদিন গোপন থাকল না। রোম্যান গভর্নর ডেকে পাঠালেন ওদের। বললেন, তোমরা সম্রাটের ক্রীতদাস ; তবে অন্যের দাসত্বের চিহ্ন গলায় পরেছ কেন ?

শাহক বলল, ভগবানই আমার একমাত্র প্রভু ; অন্য কারো দাস নই আমি।

বারাব্বাস বলল, ঈশ্বরে আমার আস্থা নেই। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই আস্থা আসে না।

এই সন্দেহ প্রকাশ করবার ফলে বারাব্বাস মুক্তি পেল, শাহকের হল প্রাণদণ্ড। বারাব্বাস ঝোপের আড়াল থেকে ক্রুশবিদ্ধ শাহককে দেখল। স্পষ্ট অনুভব করল তার প্রতি গভীর ঘৃণা ফুটে উঠেছে শাহকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে।

বারাব্বাসের উপর তুষ্ট হয়ে গভর্নর তাকে নিয়ে এলেন রোমে। খ্রীষ্টানদের উপকার হবে এই ভুল বিশ্বাসে বারাব্বাস রোম নগরীর বাড়ির পর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। গ্রেপ্তার হবার পর বারাব্বাস নিজের পরিচয় দিল খ্রীষ্টান হিসাবে। এই স্বীকৃতির ফলে রোমের সকল খ্রীষ্টানদের কারারুদ্ধ করা হল। জেলে আসল খ্রীষ্টানরা তাকে অস্বীকার করল, জানল তার সত্য পরিচয়। এতগুলি লোকের ঘৃণার শরশয্যার উপর বসে বারাব্বাস দুই হাতে মুখ ঢেকে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সারি সারি ক্রুশের উপর খ্রীষ্টানদের বিদ্ধ করা হয়েছে ; মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের সান্ত্বনা তাদের যন্ত্রণা

লাঘব করতে সাহায্য করল। তা ছাড়া আত্মীয়-স্বজন এবং জনসাধারণের সহানুভূতিও তারা পেল। বারাব্বাস একটু দূরে, অপাঙ্‌ক্তেয় সে, কেউ কথা বলে না তার সঙ্গে। শরীরের যন্ত্রণা অপেক্ষা তীব্রতর হয়ে তাকে বিদ্ধ করছিল সকলের ঘৃণা।

গ্রীক নাটকের অন্ধ নিয়তির মতো ভাগ্য বারাব্বাসকে প্রথম থেকেই তাড়া করেছে। সে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে চায়, কিন্তু মনের সংশয় কিছুতেই দূর হয় না। খ্রীষ্টানদের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেও সে তাদের অমঙ্গল ডেকে আনে। লাগেরকভিস্টের বারাব্বাসকে আমরা ঘৃণা করতে পারি না। বরং অনুভব করি সে আমাদেরই সগোত্র। বারাব্বাসের মতো বর্তমান কালে আমরাও সংশয়ক্লিষ্ট মনে যা-কিছু মহৎ ও সত্য তা প্রশ্ন করে বিচার করতে চাই। সত্যের প্রতি এই সন্দেহই আমাদের জীবন অশান্তিময় করে তুলেছে। মানব মনের দ্বিধা আর সংশয়ের একটি সুনিপুণ আলেখ্য এই অবিস্মরণীয় উপন্যাস।

লাগেরকভিস্টের ছোট গল্পগুলির মধ্য থেকে উনিশটি নির্বাচন করে ইংরেজী অনুবাদ বেরিয়েছে The Marriage Feast and other Stories নামে। তাঁর এই গল্পগুলি রসজ্ঞ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। উপন্যাসের ও নাটকের মতোই তাঁর গল্পের পশ্চাতেও একটি বক্তব্য আছে। কিন্তু বক্তব্যের চাপে পড়ে গল্পরস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। গল্পের মাধ্যমে তিনি বর্তমান সমাজের পাপ ও দুর্নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিয়ের ভোজ, বীরের মৃত্যু, যে লিফ্‌ট নরকে নেমেছে, প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী পাঠকের নিকট লাগেরকভিস্টের উপন্যাস ও নাটক অপেক্ষা ছোট গল্পগুলি অধিকতর উপভোগ্য মনে হবে।

লাগেরকভিস্টের গল্প উপন্যাস নাটক সবই এক ভাবনা ও আদর্শের সূত্রে গ্রথিত। সর্বত্রই তিনি আলোচনা করেছেন 'the profound ethical and metaphysical problems of human existence.' তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় নিরাশাবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু পরে, সংসারের বিরুদ্ধে সহস্র অভিযোগ সত্ত্বেও, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদৃঢ় আশাবাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ প্রকাশের জন্য লাগেরকভিস্ট অনেক ক্ষেত্রে নির্মম ব্যঙ্গের অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। এই ব্যঙ্গের উৎস মানুষের প্রতি গভীর দরদ; তাই তাঁর রচনা সহজেই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

হেইদেনস্তামের মৃত্যুর পর ১৯৪০ সালে লাগেরকভিস্ট সুইডিশ আকাদেমির (সাহিত্য) সভ্য নির্বাচিত হন। এই আকাদেমিতে আঠারো জন মাত্র সভ্য; এঁরাই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই আঠারো জন সভ্যকে বলা হয় Immortals. বিশেষ সম্মানের পদ সন্দেহ নেই। কিন্তু লাগেরকভিস্ট সমস্যায় পড়লেন যখন ১৯৫০ সালে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে প্রস্তাব এল তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেবার জন্য। উইলিয়াম ফকনারের সঙ্গে তাঁর মাত্র এক ভোটের পার্থক্য। লাগেরকভিস্ট নিজে ফকনারের পক্ষে ভোট দেওয়ায় সে বছরের পুরস্কারটা আমেরিকান ঔপন্যাসিকই পেলেন। পরের বছর লাগেরকভিস্ট নোবেল পুরস্কার পেলেন 'for the artistic power and deep-rooted independence he demonstrates in his writings in seeking an answer to the eternal question of humanity.'

আরও তিনজন সুইডিশ লেখক এর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে সেলমা লাগেরলফের নাম তবু শোনা যায়; কিন্তু হেইদেনস্তাম ও কার্লফেলট (মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে পুরস্কার দেওয়া হয়)-এর পরিচয় খুব কম লোকেই জানে। অন্যান্য দেশের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখকরা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, সে তুলনায় এঁরা অপরিচিত। তার কারণ আছে। এঁদের রচনা সুইডেনের সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল ছাড়িয়ে ঊর্ধে উঠতে পারেনি। তাই ভিন্নদেশবাসীর পক্ষে সুইডিশ সাহিত্য পুরোপুরিভাবে আস্বাদন করতে পারা কঠিন। লাগেরকভিস্ট সুইডেনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী লেখক যিনি আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মন নিয়ে কারবার করেছেন, পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যাঁর রচনা হারিয়ে যায়নি। তাই তাঁর গ্রন্থাবলী পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হবার দাবি রাখে। অবশ্য লেখক হিসাবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা স্বদেশে অথবা বিদেশে লাভ করবেন এমন আশা নেই। কারণ বুদ্ধিজীবী লেখকের আবেদন বুদ্ধিজীবী পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

হালডোর ল্যাক্সনেস

১৯০২—

স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যে প্রকাণ্ড বড় দ্বীপ আইসল্যাণ্ড। আয়তন প্রায় ৪০ হাজার বর্গমাইল। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ বত্রিশ হাজার। এর মধ্যে রাজধানী রাকিয়াভিকেই প্রায় পঞ্চান্ন হাজার লোকের বাস। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা আয়তনে দশ হাজার বর্গ মাইল বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চলই বাসের অনুপযোগী। তাই বসতি এত বিরল। তুষারে ঢাকা দেশ, চাষাবাদ বড় একটা হয় না। টাট্টু ঘোড়া, ভেড়া, সমুদ্রের মাছ, এবং গন্ধক রপ্তানী করা আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীদের আয়ের প্রধান উপায়। আইসল্যাণ্ডে বেঁচে থাকবার সংগ্রাম বড় কঠোর, বিশেষ করে চাষী ও মজুরদের। প্রকৃতির সঙ্গে দাঁতে-নখে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ নেই; তবু আইসল্যাণ্ডের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক পার্লামেণ্টারি শাসনপদ্ধতির সূত্রপাত সর্বপ্রথম হয়েছে আইসল্যাণ্ডে। এদেশের বীরত্ব-গাথা সাগা ও এড্ডা বিশ্ব-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আইসল্যাণ্ডের সাহিত্য মধ্যযুগের গাথাতেই থেমে যায়নি। আধুনিক আইসল্যাণ্ডীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধিও বিস্ময়কর।

কিছুকাল আগে বিখ্যাত প্রকাশক স্যার স্ট্যানলি আন্‌উইন কলকাতা এসেছিলেন। তাঁর কাছে আইসল্যাণ্ডবাসীদের পুস্তক-প্রীতির কথা শুনেছি। এত অল্পসংখ্যক লোকের দেশে বইয়ের এমন চাহিদা পৃথিবীর আর কোথাও নেই বলে তাঁর বিশ্বাস। আইসল্যাণ্ডের পাঠকদের পাঠ-স্পৃহা শুধু গল্প-উপন্যাসের মধ্যে নিবদ্ধ নয়। যে কোনো বিষয়ের বই পড়তে তাদের আগ্রহ। অনুবাদ-সাহিত্যের সমাদরও কম নয়। এই প্রবল পাঠ-স্পৃহার প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত, আইসল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক; দ্বিতীয়ত, প্রচণ্ড শীতের দেশে অধিকাংশ সময় ঘরে বসে কাটাতে হয়, তাই বই পড়া চিত্ত-বিনোদনের প্রধান উপায়।

আইসল্যাণ্ডের আধুনিক লেখকদের মধ্যে অন্তত দশ-বারো জনকে প্রথম

শ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে গুনার গুনারসন, গুয়মান্দুর কাম্বান, জি, হ্যাগলিন, ক্রিস্টমান গুয়োমান্দসন ও হালডোর ল্যাক্সনেস—এই পাঁচজন ঔপন্যাসিকের নাম স্বদেশের গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় এঁদের লেখার অনুবাদ হয়েছে। এই পাঁচজন লেখকই সমসাময়িক ; বয়সের দিক থেকে ল্যাক্সনেস সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ল্যাক্সনেস নিজেই আইসল্যাণ্ডের সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সৃষ্টি করেছেন। সমসাময়িক লেখক এবং পরবর্তী নবীন লেখকদের উপর ল্যাক্সনেসের রচনা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

১৯০২ সালের ২৩শে এপ্রিল রাকিয়াভিকে এক সাধারণ মজুর পরিবারে হালডোর কিলিয়ান ল্যাক্সনেস (Halldor Kiljan Laxness) জন্মগ্রহণ করেন। ল্যাক্সনেসের বাবার কাজ ছিল রাজধানীর রাস্তা মেরামত করা। অল্পদিন পরেই তিনি এ কাজ ছেড়ে স্বাধীনভাবে চাষাবাদ আরম্ভ করেন। তাঁর বয়স যখন তিন তখন রাকিয়াভিকের নিকটবর্তী ল্যাক্সনেস গ্রামের কৃষি-ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গ্রামের নাম তিনি প্রথম ছদ্মনাম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরে এটাই হয়েছে তাঁর পদবী। বারো বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার সঙ্গে ঐ গ্রামেই তাঁর দিন কেটেছে। এরপর তাঁকে পাঠানো হল রাকিয়াভিকে পিয়ানো বাজানো শিখতে। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীর ছিল না। তাঁর ভালো লাগত গল্প ও কবিতা লিখতে। তিন বছর পরে সঙ্গীত-চর্চা বন্ধ করে ল্যাক্সনেস রাজধানীর ল্যাটিন স্কুলে ভর্তি হলেন।

ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হলে তখন আইসল্যাণ্ডের ছাত্রদের ডেনমার্ক যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের তাঁবেদারই ছিল। সুতরাং অনেক বিষয়ে আইসল্যাণ্ডকে ডেনমার্কের উপর নির্ভর করতে হত। সতেরো বছর বয়সে ল্যাক্সনেস ডেনমার্ক গেলেন পড়াশুনা করতে। এর আগেই তাঁর প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে।

ছাত্রজীবন থেকেই ল্যাক্সনেসের দেশভ্রমণের প্রবল নেশা। তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে এবং কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করেছেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁর ভ্রমণের নেশা যায়নি। কিছুদিন পর পরই তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। আজকাল অবশ্য উত্তর য়ুরোপের দেশগুলিতেই তাঁর

ভ্রমণ নিবন্ধ থাকে। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েও ল্যাক্সনেস নিয়মিত ভাবে লেখেন। তাঁর অনেক বই বিদেশে লেখা।

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ল্যাক্সনেসের জীবন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। লুক্সেমবুর্গের মঠে বেড়াতে গিয়ে ১৯২৩ সালে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। জার্মানীর কাছ থেকে পেলেন এক্সপ্রেশানিজমের তত্ত্ব। ফ্রান্সে দু' বছর (১৯২৪—২৬) কাটিয়ে পরিচিত হলেন সুররিয়ালিজমের সঙ্গে। আর আশ্চর্য, কানাডা ও ক্যালিফোর্নিয়ার মতো ধনতান্ত্রিক দেশে ভ্রমণ করতে করতে (১৯২৭—৩০) সাম্যবাদের আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করল। নতুন জীবন-দর্শন নিয়ে ল্যাক্সনেস দেশে ফিরে এলেন ১৯৩০ সালে। ঐ বৎসরই তাঁর দু'টি বই প্রকাশিত হয়। 'The Book of the People' প্রবন্ধ পুস্তক। এই প্রবন্ধ সংগ্রহে তিনি শাণিত ভাষায় সাম্যবাদের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি তাঁর আধুনিক গীতি কবিতার সঙ্কলন। এতদিন আইসল্যাণ্ডের কাব্য মধ্যযুগীয় সাগার ছায়ায় ছিল। ল্যাক্সনেস তাকে এই প্রথম নতুন জগতের আলোয় টেনে আনলেন। আইসল্যাণ্ডের পাঠকরা সাম্যবাদের অভিনবত্বে ও কাব্যরীতির নতুনত্বে চমকিত হল।

ল্যাক্সনেসের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'The Great Weaver from Cashmere' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক কাহিনী। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেও জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ল্যাক্সনেসের সংশয় দূর হয়নি। পথ নির্বাচনের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনারীতির বৈশিষ্ট্যে এবং ভাবের গভীরতায় 'The Great Weaver from Cashmere' আইসল্যাণ্ডের উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছে। কিন্তু এটি তাঁর পরিণত শিল্পকর্ম নয়।

ল্যাক্সনেসের প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত তিনটি উপন্যাসের মধ্যে: 'সাল্কা ভল্কা' (১৯৩১-৩২); 'ইনডিপেন্ডেণ্ট পিপল' (১৯৩৪-৩৫); 'দি লাইট অফ দি ওআর্লড' (১৯৩৭-৪০)। শেষোক্ত উপন্যাসের নায়ক জনগণের কবি। কবির অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল না; তাই তাঁকে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সংসারের নির্মম আঘাত সত্ত্বেও কবির আত্মা পরাজয় বরণ করেনি, তাঁর চরিত্রবল ক্ষুণ্ন হয়নি। মানুষের অপরাজিত আত্মার প্রতীক এই কবি।

'দি বেল অব আইসল্যাণ্ড' (১৯৪৩) এবং 'দি ফেয়ার মেইডেন' (১৯৪৪) ল্যাক্সনেসের আর দু'টি উপন্যাস। আইসল্যাণ্ডের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে এদের কাহিনী রচিত। ল্যাক্সনেসের সাম্প্রতিক রচনায় ইতিহাসের উপর ঝোঁক দেখা যায়। আরো কয়েকখানি গল্প, উপন্যাস ও কবিতার বইও তিনি লিখেছেন।

নানা দেশে ভ্রমণ করার ফলে ল্যাক্সনেস আয়ত্ত করেছেন য়ুরোপের অনেক ভাষা। ইংরেজী, ফরাসী, ডাচ ইত্যাদি তিনি ভালো করেই শিখেছেন। এর ফলে বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ল্যাক্সনেস ভলতেয়ারের 'ক্যানডিড' এবং হেমিংওয়ের 'ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস' আইসল্যাণ্ডের ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

ল্যাক্সনেসের নিজের লেখা বই উত্তর য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি ঐ অঞ্চলের জনপ্রিয় লেখক হয়ে উঠেছেন। জার্মানীতে তাঁর বইয়ের প্রচার লক্ষ্য করে নাৎসী সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজীতে ল্যাক্সনেসের সব বই এখনো অনুবাদ হয়নি। তবে সৌভাগ্যের কথা যে 'সাল্‌কা ভল্‌কা' ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল' ল্যাক্সনেসের অন্যতম কীর্তি ; এবং এ দু'টির ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে।

প্রচণ্ড শীতের দেশ আইসল্যাণ্ড। উত্তরাঞ্চলে শীতের প্রকোপ তীব্রতর। এদিকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকের বাস। তাদের জীবন বড় কঠোর। আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলকে তারা বসন্তের দেশ বলে মনে করে এবং উত্তরাঞ্চলে বাস করবার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়। 'সাল্‌কা ভল্‌কা' ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল'-এর পটভূমিকা আইসল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল।

সমুদ্রের তীরে ছোট গ্রাম ওসিরি। শীত ও দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট দুঃখের জীবন এখানে। চাষাবাদের উপযোগী জমি নেই। এখানকার প্রধান কাজ সমুদ্রে মাছ ধরা এবং মাছে লবণ মেখে শুকিয়ে বিদেশে চালান দেওয়া। মাছের ব্যবসায়ের একচেটিয়া মালিক জোহান বোগেসেন। সকলেই কাজের জন্য তার কাছে আসে। বোগেসেন কাউকে নগদ মজুরী দেয় না। কার কত টাকা পাওনা হল তা খাতায় লেখা থাকে। ও অঞ্চলের একটিমাত্র বিভাগীয় বিপণির মালিকও বোগেসেন। ওই দোকান থেকে কর্মীরা উপার্জনের পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সংগ্রহ করে।

ডিসেম্বর মাসের এক শীতার্ত রাত্রি। জাহাজ থেকে ওসিরির তীরে পা দিল

সিগুরলিনা, সঙ্গে তার এগারো বছরের মেয়ে সাল্‌কা ভল্‌কা। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা; অন্ধকার রাত্রি, তুষার পড়ছে। আশ্রয় কোথা পাবে? সব বাড়ির দরজা বন্ধ, অজানা লোককে কেউ স্থান দিতে চাইবে না। ঘুরে ঘুরে রাত্রির মতো আশ্রয় পেল সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের একটা আস্তানায়। ঘরের আলোয় সাল্‌কাকে দেখা গেল। লম্বাটে গড়ন, হাড়-সর্বস্ব দেহ; বয়সের চেয়ে বড় দেখায়। সমুদ্রের জলের মতো নীল রঙের দু'টি চঞ্চল ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ। হাসলে চোখ হারিয়ে যায়, নাকের দু'পাশে দু'টি গর্তের চিহ্ন ফুটে ওঠে। কথা বলবার সময় তার দৃঢ়সংবদ্ধ দাঁতের সারি ও চওড়া মাড়ির কিয়দংশ বেরিয়ে পড়ে। সাল্‌কার আধফোটা মুখের চেহারায় যে সজীবতা ও আত্মপ্রত্যয়ের চাপ লেগে আছে তা কারো চোখ এড়াবার নয়।

ওসিরির ডাক্তার, রেক্টর ও বোগেসেনের বাড়িতে ঝি রাখা সম্ভব। মেয়েকে সঙ্গে করে সিগুরলিনা এই তিন বাড়িই গেল। কারো লোকের প্রয়োজন নেই। স্টেইনটর স্টেইনসন নামে একজন নাবিক দয়াপরবশ হয়ে এগিয়ে এল সাহায্য করতে। তার মাসীর বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। মা ও মেয়েকে গরু-ভেড়া দেখাশোনা করতে হবে, আর রোজ দুধ পৌঁছে দিতে হবে বাড়ি বাড়ি। স্টেইনটরের মুখে বসন্তের দাগ, চোখে লোভাতুর দৃষ্টি। চাইলেই আঁতকে উঠতে হয়। তার মনে এত দয়া?

স্টেইনটরের স্বরূপ প্রকাশ পেল কয়েক দিনের মধ্যেই। ওই ছোট মেয়ে সাল্‌কার উপরও তার লোভ। সাল্‌কার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হল একদিন। নিজেকে মুক্ত করে হাঁপাতে হাঁপাতে মা'র কাছে এসে বলল, 'ঐ শয়তানটাকে আমি খুন করব।'

এক রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাল্‌কার। শুনতে পেল মা বলছে, 'না, না, যীশুর নাম করে বলছি এ কাজ করো না; আমি লোক ডাকব। আমার মেয়ে রয়েছে পাশে।' তখনো সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি। সাল্‌কার মনে হল কোনো হিংস্র পশু তার মা'কে আক্রমণ করেছে। সাল্‌কা মা'কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। এই চিৎকারে হকচকিয়ে পশুটা বেরিয়ে গেল। মানুষের আকার। স্টেইনটর।

একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল। জেগে দেখল মা তার পাশে নেই। ডাকতে গিয়ে গলা আটকে গেল। এতদিন জানত মা একা তারই,—এখন পেল মা'র নতুন পরিচয়। সিগুরলিনার সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মেয়েমানুষ।

মেয়ের সামনে আসবার সময় মুখোশ পরে আসে। মেয়ে ঘুমোলেই আবার তা খুলে ফেলে। তখন মেয়েদের সহজাত কামনা-বাসনা জেগে ওঠে, তার মধ্যে মা হারিয়ে যায়। অন্ধকারে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে সাল্কার মনে হল তার মা নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই। হয়ত সত্যি করে কখনো ছিলও না। সংসারে একাই দাঁড়াতে হবে। কেউ সঙ্গে আসবে না। সঙ্কল্পে কঠোর হল ওর মুখ।

সকালে প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দেবার জন্য পথে বের হতে হয় সাল্কাকে। ছেঁড়া, তেল-চিট্‌চিটে পোশাক ; জরাজীর্ণ জুতোর ফাঁক দিয়ে আঙুল বেড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টি হোক, তুষারপাত হোক, দুধ পৌঁছে দিতেই হবে। কিন্তু রাস্তায় বের হলেই পাড়ার ছেলেরা তার পেছনে লাগে। এ অঞ্চলে সাল্কারা নতুন লোক বলে কেউ তাদের সহানুভূতির চোখে দেখে না। ছেলেরা তার গায়ে বরফের ডেলা, রাস্তার ময়লা ছুঁড়ে মারে ; অশ্লীল কথা বলে। স্টেইনটরের সঙ্গে তার মা'র গুপ্ত প্রণয়ের কথা অজানা নেই ; ছেলেরা তাকে বেশ্যার মেয়ে বলে সম্বোধন করে। সাল্কা কখনো কখনো রুখে দাঁড়ায় ; চোখ দিয়ে আগুন বের হয় ; ওদের ডেকে বলে, আয় দেখি সামনে, কত সাহস! এই মূর্তি দেখে ওরা ভয় পায়। বাড়ির আড়ালে অথবা পথের মোড়ে আত্মগোপন করে। কিন্তু চলতে আরম্ভ করলেই আবার পেছন থেকে জ্বালাতন শুরু হয়।

সেই বয়সেই সাল্কার মনে জাগল জীবন-জিজ্ঞাসা। এই অকারণ নিষ্ঠুরতার কারণ কি? শুধু বেদনা দেওয়া ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার মা'র সম্বন্ধে ইঙ্গিতটা হয়ত সত্য ; সে দেখতে কুৎসিত তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তারা দরিদ্র ও অসহায়। তাই বলে প্রতিদিন তাকে অকারণে অত্যাচার সইতে হবে কেন? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? হে ঈশ্বর, তুমি সহায় থেকো, আমি যেন একদিন এর প্রতিশোধ নিতে পারি। কিন্তু এই ঈশ্বরই তো তার প্রতি বিরূপ। কেন এত কুশ্রী করেছেন ওকে?

সালকার এখনো অক্ষর পরিচয় হয়নি। দেশের আইন অনুযায়ী লেখাপড়া শিখতে হবে। সরকারী শিক্ষক তাঁর এক ছাত্রকে পাঠিয়ে দিলেন সাল্কাকে পড়াবার জন্য। একটু অগ্রসর হলে স্কুলে যাবে।

আর্নাল্‌দুর তার চেয়ে অল্প কিছু বড়। প্রথম তাকে দেখে সাল্কার সন্দেহ হল, যে সব ছেলে তাকে জ্বালাতন করে এ-ও বুঝি তাদেরই একজন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল আর্নাল্‌দুর ভিন্ন প্রকৃতির ছেলে। তার চোখে

কৈশোর স্বপ্নের মায়া, রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে। সাল্‌কা অত্যন্ত বাস্তব রূঢ়জীবনের মধ্যে মানুষ; আর্নাল্‌দুর স্বপ্নচারী ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এর আগে কথা বলবার মতো বন্ধু পায়নি সাল্‌কা। আর্নাল্‌দুর এল নতুন জগতের বার্তা নিয়ে।

একদিন কী নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে সাল্‌কা যেন এই নতুন করে উপলব্ধি করল সে মেয়ে, আর্নাল্‌দুর পুরুষ। পুরুষের অধিকার নিয়ে সে এগিয়ে আসতে চায়। সাল্‌কা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'না, না, আমি মেয়ে হতে চাই না; মেয়ে হলে তো মা'র অবস্থা হবে! তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

সাল্‌কা পুরুষের ছেঁড়া পোশাক সংগ্রহ করে পরে। চলাফেরায়, গলার স্বরে পুরুষালি ভাব। স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আবার বোগেসেনের মাছের কারখানায় মাছ ধোয়ার কাজও করে। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও নগদ একটি পয়সাও পায় না। মাসের শেষে মজুরীর সঞ্চিত টাকা দিয়ে বোগেসেনের দোকান থেকে জামা কিনতে গিয়ে দেখল সিগুরলিনা তার নাম করে আগেই নিজের জন্য পোশাক নিয়ে গেছে।

সিগুরলিনার মধ্যে হঠাৎ ধর্মোন্মাদনা এসেছে। গির্জায় গিয়ে সকলের সামনে নিজের সকল দুষ্কৃতি স্বীকার করে ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করল। তার জীবনের কাহিনী থেকে জানা গেল সে কত দুঃখী; অসহায়তার সুযোগ নিয়ে দুষ্ট লোকেরা তাকে প্রলুব্ধ করে পথে বসিয়ে গেছে। সাল্‌কা তার অবৈধ সন্তান। ঈশ্বরের করুণা সিগুরলিনা পেল কিনা কে জানে, কিন্তু সাল্‌কার জন্মের ইতিহাস ওসিরিতে কারো কাছে অজানা রইল না।

স্বীকারোক্তি করেও সিগুরলিনার কামনা-বাসনা দূর হয়নি। স্টেইনটরের প্রতি সে আকৃষ্ট। তার সন্তান এসেছে গর্ভে। তবু স্টেইনটরের দৃষ্টি সাল্‌কার উপর। সাল্‌কার তেজোদীপ্ত ভঙ্গী, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ এবং আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম আরো বেশি করে আকর্ষণ করে। আবার একদিন রাত্রিতে স্টেইনটর এসেছে মা'কে অপমান করতে। সাল্‌কার আর সহ্য হল না। উন্মত্তের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টেইনটরের উপর। কিন্তু শক্তিশালী নাবিকের বিরুদ্ধে সে কি করতে পারে? স্টেইনটরের দেহে জ্বালা ধরে গেল। সে সিগুরলিনাকে জোর করে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করল। এতদিনে সে সাল্‌কাকে একা পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সিগুরলিনা যখন পাড়ার লোক সঙ্গে করে ফিরে এল তখন ঘর খোলা, সাল্‌কা সংজ্ঞাহীন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। স্টেইনটর কোথাও নেই।

দু'বছর যাবৎ স্টেইনটর নিরুদ্দেশ। সিগুরলিনা আর একটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। স্টেইনটরের ছেলে। সাল্‌কার দেহ দিন দিন বিকশিত হয়ে উঠছে। পুরুষের পোশাকও তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে পারে না। স্কুলে, বাড়িতে, মাছের কারখানায়—কোথাও তার বন্ধু নেই। একমাত্র সঙ্গী আর্নাল্‌দুর স্কুল ছেড়ে বোগেসেনের দোকানে কেরানীর চাকরি করছে।

বোগেসেনের মেয়ে অগাস্টার সঙ্গে আজকাল আর্নাল্‌দুরের ভাব। অগাস্টা কোপেনহেগেনে পড়াশুনা করছে; দেখতে ভালো; দামী পোশাক পরে। সুতরাং আর্নাল্‌দুর তো চাইবেই তাকে। কিন্তু আর্নাল্‌দুর যদি জানত সাল্‌কার জীবনে তার স্থান কোথায়! পৃথিবীতে সাল্‌কার আর কেউ নেই: তার জীবনের একমাত্র সূর্য আর্নাল্‌দুর। সে যদি মুখ ফেরায় তা হলে সাল্‌কার জীবন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে নিভে যাবে। ব্যাকুল হয়ে সে প্রশ্ন করে, হে ঈশ্বর, সবাইকে তো তুমি সৃষ্টি করেছ, তবে সবাই দেখতে সুন্দর নয় কেন? সবাই কেন কোপেনহেগেন যেতে পারে না? সবার জন্য ভালো খাবার কেন জোটে না? কি করেছি আমি যার জন্য তুমি আমাকে জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছ?

উত্তর খুঁজে না পেয়ে কিশোরীর হৃদয় আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আর্নাল্‌দুর একদিন ডেনমার্ক চলে গেল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। যাবার আগের দিন বিকেলে সাল্‌কা ও সে সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন পাথরের ঢিবির উপর এসে বসল। বিদায়ের পালা। আর্নাল্‌দুর পুরুষের চোখ দিয়েই দেখেছে সাল্‌কাকে। কিন্তু সাল্‌কা কিছুতেই এগিয়ে আসতে পারল না। অন্তরে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেও মা'র দুরবস্থার ছবিটা দুঃস্বপ্নের মতো সামনে এসে সতর্ক করে দেয়: ক্ষণিকের মোহে ভুল করো না। আর্নাল্‌দুর স্মারক হিসাবে একটা লকেট দিয়ে গেল। লকেটের উপর তার ছবি আঁকা।

অনেকদিন পার হয়ে গেছে। স্টেইনটর সিগুরলিনাকে বিয়ে করবে বলে গির্জা থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। সাল্‌কার উপর স্টেইনটরের লোভ এখনো যায়নি। সিগুরলিনা এজন্য মেয়েকে ঈর্ষা করে। মেয়েকে অনুরোধ করে, আমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিস না তুই।

আর্নাল্‌দুর চিঠি লিখেছে। সাল্‌কার জীবনে এই প্রথম চিঠি। তা আবার আর্নাল্‌দুরের কাছ থেকে। বেশ উৎফুল্ল মনে বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে স্টেইনটরের সঙ্গে দেখা। স্টেইনটরও তার সঙ্গে চলল। আনন্দের দিনে ঝগড়া করতে ইচ্ছা হল না, বাধা দিল না ওকে। কিন্তু ধূর্ত স্টেইনটর সাল্‌কাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল শূন্য একটা চালা ঘরে। সেদিন সাল্‌কার ভাগ্যে কি ছিল কে জানে! মা'র আকস্মিক উপস্থিতি তাকে রক্ষা করল। মা মেয়ে ও ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল বলে পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

সাল্‌কা রক্ষা পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু এর পর থেকে মা'র সন্ধান নেই। কয়েকদিন পরে সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল সিগুরলিনার মৃতদেহ। স্টেইনটরও নিরুদ্দেশ হয়েছে তারপর থেকে।

সাল্‌কার অবস্থা এখন মোটামুটি ভালো। সে অবসর সময়ে বই পড়ে। দরিদ্রের জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই। নিজের বাড়িতে কয়েকটি অনাথ ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিয়েছে। ওসিরির নিঃস্ব, অসহায় নাগরিকদের সে ভরসাস্থল। সে তাদের শেখায়, 'দরিদ্রের বিপদে ঈশ্বর কিংবা মানুষ কেউ সাহায্য করতে আসে না। নিজেদের উপরই তোমাদের নির্ভর করতে হবে।' সাল্‌কা স্থানীয় নাবিক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে।

আর্নাল্‌দুর হঠাৎ ফিরে এল। আইস্‌ল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট নেতা টোরফ্‌দালের প্রধান অনুচর সে। আর্নাল্‌দুর ওসিরিতে তার কার্যক্ষেত্র বেছে নিয়েছে। কিছুদিন পরেই মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে বোগেসেনের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা; সাল্‌কা এই ধর্মঘটে যোগ দেয়নি। সে আর্নাল্‌দুরের প্রতিপক্ষ। ধর্মঘট ব্যর্থ হল।

এতদিন পরে আবার দু'জনের মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব নতুন হয়ে এল। ওদের পরিপূর্ণ যৌবন। বন্ধুত্ব প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হতে দেরি হল না। সাল্‌কার সংশয় জাগে, ভয় করে। কিন্তু অন্ধকারের ভয়ে তো ফুল ফোটা বন্ধ থাকে না!

প্রতিদিন বিকেলে ওরা বেড়াতে যায়। সাল্‌কার মুখের রুক্ষতা দূর হয়ে কোথা থেকে হঠাৎ স্নিগ্ধ লাবণ্য নেমে এসেছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে গুজবের শেষ নেই। কিন্তু কান দেয় না। দু'জনে মিলে নতুন জগত সৃষ্টি করেছে। সেখানে অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই।

প্রথম চুম্বন। আর্নাল্‌দুরের মুখ নেমে এসে হঠাৎ একটু থেমে যায়। সাল্‌কার চোখ বন্ধ, মুখ ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, সমস্ত দেহ আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ।

সেই মুহূর্তে আর্নাল্‌দুরের মনে হল মৃত্যুর সঙ্গে এই ছবির আশ্চর্য মিল আছে। প্রেম যে মৃত্যুর এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তা কে জানত!

সাল্‌কা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। আর্নাল্‌দুর সীমা লঙ্ঘন করতে চাইলে শঙ্কিত হয়ে 'মা! মা!' বলে চিৎকার করে ওঠে।

—কোথায় তোমার মা?

—জানো না, সে প্রেতিনী হয়ে বসে আছে আমার মধ্যে। না, না, আর্নাল্‌দুর আমাকে ক্ষমা করো। তাহলে যে আমি তলিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো মা'র মতো।

সাল্‌কা একদিন লক্ষ্য করল আর্নাল্‌দুরের মুখ একটু বিষণ্ণ।—কি হয়েছে?

—এক বন্ধুর কাছ থেকে দু'শ টাকা ধার করেছিলাম। এখন সে ফেরত চায়। জরুরী প্রয়োজন।

অনেক কষ্টে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিল সাল্‌কা। হাসিমুখে তা তুলে দিল আর্নাল্‌দুরের হাতে। তার মতো কুশ্রী মেয়েকে সে ভালোবেসেছে। এর জন্য কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে পেরে ধন্য হল সে।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে দেরি হল না। আর্নাল্‌দুরের এক গুপ্ত প্রণয়ের পরিণামকে গোপন করবার জন্য ডাক্তারকে দিতে হয়েছে ঐ টাকা। সাল্‌কা বলল, তোমাকে আমি অন্য জগতের লোক ভেবেছিলাম। তুমি এমন কাজ করবে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

আর্নাল্‌দুর বলল, সাল্‌কা, তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়েছ। তুমি আমার ক্ষুধা জাগিয়ে দেহকে উপবাসী রেখেছ। তাই···

—কিন্তু তুমি কি আমাকে চিরদিন ভালোবাসবে? কখনো ছেড়ে যাবে না?

—মিথ্যা বলে তোমাকে ঠকাবো না। আজ তোমাকে ভালোবাসি। কাল কি হবে সে কথা তো আমার জানা নেই। বর্তমানকে চিরন্তন করতে পারে শুধু মৃত্যু। আমার মন জীবন্ত, মৃত্যু-সুলভ প্রতিশ্রুতি তো তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়!

সাল্‌কা আর দ্বিধা করল না। আর্নাল্‌দুরের হাতে নিঃশেষে দান করল নিজেকে। এতদিনের পর্বতপ্রমাণ দুঃখ ও গ্লানি সাল্‌কার জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অসহ্য আনন্দের জীবন। কিন্তু বেশিদিন সইল না এই সুখ। রাকিয়াভিক থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে আর্নাল্‌দুর কিছুদিনের জন্য বিদায়

নিয়ে চলে গেল। তারপর অনেক প্রতিশ্রুত তারিখ পার করে আর্নাল্‌ডুর যখন ফিরে এল তখন তার দিকে চেয়ে চমকে উঠল সাল্‌কা। তার পরনে আমেরিকান স্টাইলের পোশাক। সেটাই বড় কথা নয়। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বদল হয়েছে। এত গভীর সেই পরিবর্তন যে চোখে মুখে স্পষ্ট তা ধরা পড়ে।

একদল আমেরিকান ভ্রমণকারী এসেছিল আইসল্যাণ্ডে বেড়াতে। তাদের গাইড হয়ে ঘুরেছে এতদিন। মোটা টাকা পেয়েছে পারিশ্রমিক। সেই দলে ছিল একটি সুন্দরী বিদূষী তরুণী। তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল আর্নাল্‌ডুরের। যাবার সময় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেছে তাকে আমেরিকা যেতে। নতুন নির্বাচনের পর কাজকর্মের কিছু সুবিধা হবে ভেবেছিল আর্নাল্‌ডুর। কিন্তু তাদের দল নির্বাচনে ভাল ফল করতে পারেনি বলে সে আশাও নেই। সুতরাং আমেরিকা গিয়ে ভাগ্যান্বেষণ করবার জন্য মন ব্যগ্র হয়েছে।

সাল্‌কা বুঝতে পেরেছে তার মনের কথা। বলল, জোর করে ধরে রেখে তোমাকে আমি অসুখী করতে চাই না। তোমার যদি আমাকে ভালো না লাগে তাহলে চলে যাও।

আর্নাল্‌ডুর বলল, সাল্‌কা, আমি যে কি উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। একবার মনে হয় বলি, আমাকে জোর করে ধরে রাখো, আবার মনে হয় মুক্তি চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।

শান্ত কণ্ঠে সাল্‌কা বলল, তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।

সাল্‌কার মনে পড়ল আর্নাল্‌ডুর বলত, মানুষের চেয়ে আদর্শ বড়। ব্যক্তির পরিবর্তন হয়, কিন্তু আদর্শ স্থির। আদর্শ মানুষকে চালনা করে, মানুষ আদর্শকে পরিবর্তিত করতে পারে না। আর্নাল্‌ডুর চ্যুত হল প্রেমের আদর্শ থেকে। তবু আদর্শ যে অবিকৃত থাকবে সেটাই তার আনন্দ।

সাল্‌কা বলল, আর্নাল্‌ডুর, তুমি প্রায়ই বলতে যে জীবনযাত্রার মান উন্নত না হলে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। তুমি আমেরিকা যাও, সুখী হবে।

—কিন্তু তোমার কি হবে?

—আমার কিছুই হবে না, তার জন্য ভেব না। আমি মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য। মা জন্মনিয়ন্ত্রণের কৌশল জানত না, ডাক্তারের সাহায্য নেবার মতো টাকা ছিল না, তাই সকলের ঘৃণা সত্ত্বেও আমার জন্ম ঠেকানো যায়নি। আমি সকলের কাছেই অবাঞ্ছিত। শুধু তোমাকে যে ক'দিনের জন্য পেয়েছিলাম সেই

দিনগুলি মুক্তোর মালা হয়ে রইল। আমার আকাশে সূর্য অস্ত গেল, এবার সুন্দরী মার্কিণ-নন্দিনীর আকাশে তার উদয় হোক। দু'টি জাহাজ একসঙ্গে যাত্রা করেছিল। একটির পাল ছিঁড়ল, হাল ভাঙল, পাটাতনের তক্তা খুলে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে লাগল। তাই বলে অক্ষত জাহাজটির যাত্রা বন্ধ হবে কেন? তুমি এগিয়ে চল। আমি ভাঙা জাহাজের মতো পড়ে থাকব ওসিরির সমুদ্রতীরে।

সাল্‌কা জাহাজ ভাড়ার ঘাটতি টাকাটা নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে পুরণ করে দিল। তারপর একদিন জাহাজে তুলে দিয়ে এল আর্নালদুরকে। নির্জন সমুদ্রতীরে অন্ধকার নামছে। গ্রীষ্মের পাখিরা পালিয়েছে। প্রচণ্ড শীত পড়তে দেরি নেই। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে সাল্‌কার কানে বাজছে আর্নালদুরের শেষ কথা: মৃত্যুর সময় তোমাকে ডেকে ডেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব।

'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপল' গাথা-ধর্মী এপিক উপন্যাস। আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নায়ক বিয়ারতুর আঠারো বছর ধরে ক্রীতদাসের মতো একজন সম্পন্ন জমিদারের জমিতে মজুরের কাজ করেছে। সে স্বপ্ন দেখত একদিন জমির মালিক হবে। তা সফল হল আঠারো বছর পরে। যে জমিটা সে লেখাপড়া করে নিল তার যে কোনো মূল্য থাকতে পারে তা কেউ ভাবতে পারেনি। তাই নগদ টাকা দিতে হল না। দামটা কিস্তিতে শোধ করে দেবে।

লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের গায়ে সেই মাঠ। বরফের মরুভূমির মতো। নবপরিণীতা স্ত্রী রোজাকে নিয়ে সেই জনমানবহীন অঞ্চলে ঘর বাঁধল। ঐ অঞ্চলে অনেক ভূত-প্রেত ও অপদেবতার বাস বলে প্রবাদ আছে। রোজা স্বামীকে অনুরোধ করল পূজা দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতে। তা না হলে অমঙ্গল হবে। বিয়ারতুর হেসে উড়িয়ে দিল। রোজার কান্নাও তাকে টলাতে পারে না। আঠারো বছর পরে সে স্বাধীনতা পেয়েছে। এখন আবার কোন্ অপদেবতার বশ্যতা স্বীকার করবে? একে একে সে অনেক দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু অপদেবতার কাছে নতি স্বীকার করেনি। বিয়ারতুরের অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের মনসাদেবীকে উপেক্ষা করবার তুলনাটা সহজেই মনে আসে।

পারস্য দেশের ধর্মশাস্ত্রে বলে, স্বর্গের দেবতা ও নরকের দেবতার মধ্যে

অনন্তকাল ধরে যুদ্ধ চলে আসছে। জমি চাষ করে যুদ্ধে স্বর্গের দেবতাকে সাহায্য করা মানুষের কর্তব্য। সে কর্তব্য প্রাণপণ পালন করছে বিয়ার্‌তুর। জমির দেনা শোধ করবার জন্য কঠোর জীবন-যাপন করে পয়সা জমায়। লবণ মাখানো শুকনো মাছ তাদের একমাত্র খাদ্য। রোজা প্রতিদিন শুকনো মাছ আর খেতে পারে না। একটু মাংসের ঝোলের জন্য সে লালায়িত। বিয়ার্‌তুর বলে : 'A free man can live on fish. Independence is better than meat.' রোজা সম্পন্ন ঘরে মানুষ হয়েছে। তার দুধেরও পিপাসা। একদিন ঘুমের ঘোরে দুধের পিপাসায় অস্থির হয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। তরুণী স্ত্রীর এই সাধটুকুও সে পুর্ণ করবে না। সকলের আগে স্বাধীন চাষী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। দেনা শোধ করতে হবে।

একদিন বাড়ি ফিরে দেখল রোজা রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে, দেহে প্রাণ নেই। তার গর্ভের সন্তানকে হয়ত এখনো বাঁচানো যেতে পারে। সে ছুটে গেল তার ভূতপুর্ব মনিব নায়েবের বাড়ি। সেখান থেকে লোকজন নিয়ে এল সাহায্যের জন্য। তারা একদিন ধরে কি সব করল। তারপর কাঁথা-জড়ানো একটি মাংসপিণ্ডকে সামনে এনে বলল, এই নাও তোমার মেয়ে।

মেয়ের নাম রাখল আস্টা সোলিলিয়া, অর্থাৎ 'স্বাধীনা।' আত্মায়, দেহে ও সর্ব বিষয়ে স্বাধীন। অনেকদিন পরে বিয়ার্‌তুর জানতে পেরেছে এ মেয়ে তার নয়। নায়েবের পুত্র ইঙ্গলফুর জনসনের অবৈধ সন্তানকে ষড়যন্ত্র করে তার মেয়ে বলে দিয়ে গেছে।

বিয়ার্‌তুর আবার বিয়ে করেছে। শাশুড়ীও তার বাড়িতে থাকে। চৌদ্দ বছর পশুর মতো খেটে জমির দেনা শোধ করতে পেরেছে। এখন সে স্বাধীন। এই স্বাধীনতার জন্য কোনো মূল্য দিতেই সে কার্পণ্য করেনি। সাহায্যকারী হিসাবে মজুর ডাকেনি ; গরু পালন দরিদ্রের পক্ষে বিলাস ; শুধু দুধ খাওয়া যায়। কিন্তু কত খড় লাগে ! সেই ঘাস-খড় দিয়ে ভেড়া পালন করলে টাকা আসবে। বাজারে ভেড়ার মূল্য আছে, বিদেশে রপ্তানি হয়। তাই বিয়ার্‌তুর ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। ভেড়ার দৌলতেই তার অবস্থা ফিরেছে। কিন্তু নায়েব যখন তাকে একটা গরু পাঠিয়ে দিল তখন বিয়ার্‌তুর তাকে যত্ন করেই রাখল।

সেবার ঘাসের বড় অভাব। ভেড়ার পালে রোগ ঢুকেছে। রোজ দু'একটা করে মারা যায়। ওদের দৌলতেই বিয়ার্‌তুর নিজের পায়ে দাঁড়াতে

পেরেছে। ঘাসের সঞ্চয় বেশি নেই। গরুর অনেক ঘাস লাগে। গরুকে খেতে দিলে ভেড়াগুলোকে বাঁচানো যাবে না। স্ত্রী ফিনা ও ছেলেরা গরু ভালোবাসে। কিন্তু বিয়ারৃতুর স্থির করল গরু সরাতে হবে। স্ত্রী কেঁদে বাধা দিল ; কিন্তু সে শুনল না। প্রতি বৎসর সন্তান জন্ম দিয়ে ফিনার শরীর দুর্বল। গরুটা হত্যা করবার কয়েকদিন পরে ফিনারও মৃত্যু হল।

কি এক নতুন রোগ এসেছে,—ভেড়াগুলি একে একে মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে পঁচিশটার মৃত্যু হয়েছে। চারদিকে গুজব রটল, অপদেবতার রোষদৃষ্টি পড়েছে। দলে দলে লোক দেখতে আসে। রোষ প্রশমিত করবার উপদেশ দেয়। কিন্তু বিয়ারৃতুর পূজা দেবে না। যে যা দেখতে চায় তাই সে দেখে,—ভূত যাদের মনে তারাই দেখে ভূত। বিয়ারৃতুর ভূত বিশ্বাস করে না।

বিয়ারৃতুর শহরে গেল চাকরি করে নগদ টাকা উপার্জন করতে। যে ক্ষতি হল তা পুরণ করা চাই। আরো ভেড়া কিনতে হবে। তার অনুপস্থিতিতে এক বাউণ্ডুলে যক্ষ্মারোগী অতিথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল আস্টার। বিয়ারৃতুর বাড়ি ফিরে দেখল আস্টা গর্ভবতী। আস্টাকে সে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। য়ুরোপ আইসল্যাণ্ডের পণ্য কিনতে ব্যগ্র। আইস্‌ল্যাণ্ডের সব জিনিস-পত্র চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। প্রচুর টাকা আসছে দেশে। আর সেই সঙ্গে আসছে নতুন ফ্যাশান, নতুন ভাবধারা। বিয়ারৃতুরের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে ; মোটর গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। বিয়ারৃতুর আসবার আগে যে জমির কোনো মূল্যই ছিল না এখন সেই জমি পনেরো হাজার টাকায় কিনতে চায় নায়েব নিজেই। এমন অসম্ভব চড়া দাম পেয়েও বিয়ারৃতুর জমি বিক্রির কথা ভাবতে পারে না।

বিয়ারৃতুরের অবস্থা এখন সচ্ছল। কিন্তু এর মধ্যে অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে। দুই স্ত্রী মারা গেছে, এক ছেলে বরফ ঢাকা পাহাড়ের কোন গহ্বরে হারিয়ে গেছে ; আস্টা নেই ; ছোট ছেলে নোন্নি বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে গেছে আমেরিকা। এবার সতেরো বছরের ছেলে গোয়েন্দুর এসে বলল, সে-ও আমেরিকা যাবে। আশা ছিল, এই ছেলে জমির কাজকর্ম শিখবে। বিয়ারৃতুর স্বাধীনতার পুজারী। তাই ছেলের স্বাধীনতায় বাধা দিল না। শুধু বলল, নিজের রাজত্ব ছেড়ে তুমি যাচ্ছ অন্যের দাসত্ব করতে। যাও, আমি বাধা দেব না। যতদিন বাঁচব একাই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকব।

বার্নার্ড শ বলেছেন, ঈশ্বর একা, তাই তিনি শক্তিশালী। বিয়ারৃতুরও

বলল, যে একা দাঁড়াতে পারে তার শক্তি সবচেয়ে বেশি। মানুষ পৃথিবীতে একা আসে, পরলোকে যায় একা। তাহলে জীবনেও একা থাকাটাই তো স্বাভাবিক। একা দাঁড়াতে পারার শক্তি অর্জনই কি জীবনের পূর্ণতা ও জীবনের লক্ষ্য নয় ?

আস্টার জন্মের জন্য দায়ী সেই নায়েবপুত্র এখন আইস্‌ল্যাণ্ডের মস্ত বড় নেতা। জনসাধারণের উন্নতি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সমবায় সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্ক, ইত্যাদি স্থাপন করছে দরিদ্রের দুঃখ দূর করবার জন্য। নির্বাচন আসন্ন। বিয়ার্‌তুরের ভোট চাই। দলের লোকে তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সমবায় সমিতি থেকে বাড়ি তৈরির মাল-মশলা গছিয়ে দিয়ে গেল। ভালো দেখে একটি বাড়ি তৈরি করবার আকাঙ্ক্ষা বিয়ার্‌তুরের বহুদিন যাবৎ ছিল। তাই সে জোর করে না বলতে পারল না।

বাড়ি শেষ করতে ব্যাঙ্কের কাছে অনেক টাকা ঋণ হয়ে গেল। যুদ্ধ থেমে গেছে। ভেড়ার দাম দ্রুত নামতে লাগল। ঋণের সুদ শোধ করবার উপায় নেই। নির্দিষ্ট দিনে ব্যাঙ্কের টাকা পৌঁছে দিতে হবে। হৃদয়হীন নিয়ম। একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। পুরনো আমলের সুদখোর মহাজন হয়ত বিয়ার্‌তুরের কথা শুনত। যথা সময়ে ঋণ শোধ করতে না পারায় বিয়ার্‌তুরের সম্পত্তি নিলামে উঠল। যে খামার সে তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছে, তা টাকার জোরে আর একজন অনায়াসে দখল করে বসল।

বিয়ার্‌তুর তবু দমল না। লোকালয় থেকে আরো দূরে নির্জন পাহাড়ের গায়ে আর একটা নতুন খামার সৃষ্টি করবে সে। প্রথমেই গেল আস্টার খোঁজে। আস্টার প্রেমিক তাকে যক্ষ্মারোগ উপহার দিয়ে গেছে। ক'দিন বাঁচবে ঠিক নেই। আস্টা, বুড়ী শাশুড়ী এবং বহুদিনের প্রিয়সঙ্গী জরাগ্রস্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল। বিয়ার্‌তুরের নিজেরও বয়স কম হয়নি। যে অঞ্চলে পথের নিশানা নেই, মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি, সেখানে তারা মানুষের অদম্য বিজয়াকাঙ্ক্ষার পতাকা তুলবে।

কিন্তু পারবে কি ? বিয়ার্‌তুরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা-প্রীতি সত্ত্বেও কাহিনীর সমাপ্তি একটি বেদনার সুর রেখে যায়। সে এখন বৃদ্ধ ; তার সঙ্গীরাও বৃদ্ধ, অশক্ত। মনে হয়, নতুন ভাবধারার তাড়া খেয়ে আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য যেন আশ্রয় খুঁজছে।

ল্যাক্সনেসের উপন্যাসগুলি বৃহদায়তন। রচনার উৎকর্ষের জন্য পাঁচ শ'

পৃষ্ঠার বইও একটানা সমান আগ্রহে পড়া যায়। একালের ক্ষীণকায় উপন্যাসের তুলনায় এটা লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁর কাহিনীগুলির পটভূমিকা সুবৃহৎ। 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পীপ্‌ল'কে ল্যাক্সনেস এপিক উপন্যাস বলেছেন। নোবেল কমিটি, বিশেষ করে এই গুণটির জন্যই তাঁকে পুরস্কার দিয়েছেন। ল্যাক্সনেসকে কেন পুরস্কার দেওয়া হল তার কারণ নির্দেশ করে তাঁরা বলেছেন: 'for vivid epic writing which has renewed the great Icelandic narrative art.'

প্রথম মহাযুদ্ধে আইসল্যাণ্ডের সমাজ-জীবনে যে বিপ্লব এসেছিল তার ফলে পুরনো আদর্শ ভেঙে গেল, নতুন পথের নিশ্চিত সন্ধান না পেয়ে যুব-সম্প্রদায় দিশাহারা। ল্যাক্সনেস তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে এই পথ খোঁজার কথা বলেছেন। রাশিয়া, ডেনমার্ক, ও আমেরিকার আদর্শে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য পরীক্ষা চলছে, কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখনো সম্ভব হয়নি।

ল্যাক্সনেসের ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও কাব্যময়। অনুবাদের মধ্যেও এদের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিপুণ গল্পকার। গভীর পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং নাটকীয় ঘটনা সংস্থান কাহিনীর আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা। সাল্‌কা ভল্‌কা ও বিয়ারতুর অনন্যসাধারণ চরিত্র; এদের মতো নরনারী অন্যত্র দেখা যায় না। এরা অনন্যসাধারণ, কিন্তু অসম্ভব নয়। তবে, উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের তুলনায় অন্য চরিত্রগুলিকে ম্লান মনে হয়। অবশ্য সিগুরলিনা, স্টেইনটর, রোজা, আস্টা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। কিন্তু মূল চরিত্রের সঙ্গে এদের প্রভেদ বড় বেশি। বিয়ারতুর কঠোর পরিশ্রমী, তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ; পাহাড়ের বন্ধুর পথে চলে সে অভ্যস্ত; অন্য কোনো বিষয়ে ভালো আলাপ করতে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের চেয়ে ভেড়ার ওপর তার টান বেশি। তবু তার মধ্যেও একজন কবি লুকিয়ে ছিল। তার কাব্য রচনার উৎস আস্টা। আস্টা ও বিয়ারতুরের সম্পর্কটা বিচিত্র ও করুণ। ল্যাক্সনেস এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। ইঙ্গিতের সাহায্যেই অনেক বলা হয়েছে। ইঙ্গিত ও প্রতীকের ব্যবহার ল্যাক্সনেসের একটি বৈশিষ্ট্য। বিয়ারতুর আইস্‌ল্যাণ্ডের প্রতীক; সাল্‌কা রূঢ় বাস্তব জীবনের প্রতীক। প্রথম মিলনের মুহূর্তে আর্নাল্‌দুরের মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের সাদৃশ্য মনে এল। তা থেকেই সাল্‌কার প্রেমের বিয়োগান্ত পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

নোবেল পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করবার পর থেকে ল্যাক্সনেসের সাহিত্য-বিচার উপেক্ষা করে তাঁর রাজনৈতিক মতামত আলোচনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি কি কম্যুনিস্ট? ল্যাক্সনেস বলেন :

'I am not a politician. I am a literary man writing novels. I have been accused of three 'C's—catholicism, communism and capitalism. I am no longer a practising Catholic, not a Communist; how far Capitalist may be seen from the books.'

যে দু'টি উপন্যাসের আলোচনা আমরা করেছি, তাদের মধ্যে কম্যুনিজম প্রাধান্য লাভ করেনি। কাহিনীর পরিণতি যে কম্যুনিজম প্রভাবান্বিত করেনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বরং রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে লেখকের কম্যুনিজমের প্রতি সহানুভূতির অভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়িকা সাল্‌কা ধর্মঘটীদের সঙ্গে যোগ দেয়নি; ওসিরিতে কম্যুনিস্টদের আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; আন্দোলনের স্থানীয় নেতা আর্নাল্‌দুর দুর্বলচরিত্র। শেষ পর্যন্ত সে দলের আদর্শ ত্যাগ করে আমেরিকা চলে গেল। বিয়ার্‌তুরও বন্দরের ধর্মঘটী কর্মীদের লুঠতরাজ সমর্থন করতে পারেনি। তার বাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সহজেই তাকে আকৃষ্ট করতে পারত। কিন্তু বিয়ার্‌তুর সে পথে গেল না। বিদেশ থেকে নানা ভাবধারার সংঘাত এসে কিভাবে আইস্‌ল্যাণ্ডের জীবনকে বিক্ষুব্ধ করেছে, ল্যাক্সনেস তা দেখাবার জন্যই কম্যুনিজম এনেছেন।

তবে তাঁকে কম্যুনিস্ট বলা হয় কেন? তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, তাঁর রচনায় দরিদ্র, নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণই মর্যাদা লাভ করেছে। এদের জন্য তাঁর গভীর দরদ। এই দরদ ও সাম্যবাদের মূলতত্ত্ব অনেকাংশে সগোত্র। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে তিনি সর্বত্র কঠোর ভাবে আক্রমণ করেছেন। তাই স্বদেশ ও বিদেশের রক্ষণশীল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধবাদী।

দ্বিতীয় কারণ, ল্যাক্সনেসের প্রবল আমেরিকা বিদ্বেষ। কেউ আমেরিকা বিদ্বেষী হলেই অনেকে একটা সহজ সিদ্ধান্ত করে বসেন যে, তা হলে নিশ্চয়ই সে কম্যুনিজমের সমর্থক। আমেরিকা থেকেই প্রথম প্রচার করা হয়েছে যে, তিনি কম্যুনিস্ট। ১৯২৭ সালে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে ল্যাক্সনেস আমেরিকা

যান এবং সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম তিনি আরম্ভ করলেন হলিউডে সিনেমার ব্যবসা। এ কাজে সাফল্য লাভ করতে না পেরে লেখার পেশা ধরলেন। আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাত্মক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখবার ফলে তাঁকে আমেরিকা থেকে বহিষ্কৃত করবার জন্য দাবি উঠল। ল্যাক্সনেস তখন স্বেচ্ছায় আইসল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। আমেরিকার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করতে। এই প্রবন্ধ পুস্তকই (১৯৩০) তাঁকে কম্যুনিস্ট বলে প্রথম পরিচিত করবার জন্য দায়ী। এটি তাঁর সাহিত্যকীর্তি হিসাবে বিচার্য নয়।

ল্যাক্সনেসের উপন্যাসেও আমেরিকাকে আইসল্যাণ্ডের দুঃখের কারণ বলে দেখানো হয়েছে। আর্নাল্‌দুর আমেরিকার ঐশ্বর্যের আকর্ষণে সাল্‌কাকে ত্যাগ করে গেল ; বিয়ার্‌তুরের ছেলেও গেছে। গোয়েন্দুর যখন বাবার কাছে আমেরিকা যাবার কথা বলতে এল, তখন বিয়ার্‌তুর বলল, 'সাবধান ; আমেরিকানরা হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে গত যুদ্ধে মেরেছে। এখন একটা কাগজে সই করে যুদ্ধ বন্ধ করেছে বলেই তো তারা ভালো মানুষ হয়ে যায়নি ! ওরা পাগলের জাত।'

আমেরিকার যুদ্ধোন্মাদনাকেও ল্যাক্সনেস বরাবর আক্রমণ করে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরেই তিনি য়ুরোপ গিয়েছিলেন। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা তাঁর তরুণ হৃদয় বেদনায় বিক্ষুব্ধ করেছিল। শান্তি খুঁজেছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে। তখন থেকেই ল্যাক্সনেস শান্তিবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি আইসল্যাণ্ডে ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল। ল্যাক্সনেস তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আইসল্যাণ্ডে আমেরিকার বিমান ঘাঁটি নির্মাণের তীব্র প্রতিবাদ ল্যাক্সনেস জানিয়েছেন তাঁর 'অ্যাটমিক বেস্‌' (১৯৪৬) নামক উপন্যাসে। দীর্ঘকাল যাবৎ শান্তির বাণী প্রচারের জন্য ওয়ার্লড্‌ পীস কাউন্সিল ১৯৫৩ সালে ল্যাক্সনেসকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই সংস্থা কম্যুনিস্ট সমর্থনে পুষ্ট বলে আর একবার তাঁর রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ হয়েছে।

১৯৩২, ১৯৩৮ ও ১৯৫৩ সালে ল্যাক্সনেস রাশিয়া ভ্রমণ করেছেন। রাশিয়ার উপর তাঁর দু'খানা বই আছে। রাশিয়ায় যা তাঁর ভালো লেগেছে, তা প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু তাই বলে ল্যাক্সনেসকে কম্যুনিস্ট বলা যায় না।

ল্যাক্সনেস প্রথম শ্রেণীর লেখক, সার্থক শিল্পী —এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। পাঠকরা তাঁর এই পরিচয়ই পাবেন। সাল্কা আর্নাল্ডুরকে বলেছিল, তুমি বিদেশী বই পড়ে দরিদ্রের বন্ধু সেজেছ। আমি এদেরই একজন, যারা দরিদ্র তারা আমার আত্মীয়, তাদের আমি ভালোবাসি। এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বের সম্পর্ক নেই। এটা ল্যাক্সনেসেরই নিজের কথা।

আইভান তুর্গেনিভ

১৮১৮—১৮৮৩

মা'র আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলে সরকারী দপ্তরের বড় কর্তা হবে। কিন্তু পুত্র লেখাকেই জীবনের প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করায় মা হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'লেখক আর কেরাণীর মধ্যে প্রভেদ কি? দু'জনেই তো কলম পেষে? শুধু কলম অবলম্বন করে জীবনে কতদূর এগুতে পারবে?'

যদি ফরাসী ভাষায় লিখত তাহলেও বরং খ্যাতি অর্জনের সুযোগ ছিল। রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় তখন ফরাসী ভাষা ব্যবহার করত, ফরাসী সাহিত্য পড়ত। রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য সমাজের উপরতলায় তখনো ছিল প্রায় অপাঙক্তেয়। একমাত্র পুশকিন ছাড়া কোনো রাশিয়ান লেখককে মর্যাদা দিতে শ্রীমতী পেত্রোভনা কুণ্ঠিত ছিলেন। রাশিয়ান লেখকদের রচনা তিনি পড়তেন না। রাশিয়ান ভাষার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা এত গভীর ছিল যে তিনি নিজের ছেলের একটি লেখাও পড়েন নি। মা'র মৃত্যুর সাত বছর আগে থেকে তাঁর অনেক লেখা বেরিয়েছে নানা সাময়িক-পত্রে। এমন কি যে 'ডায়েরি অব এ স্পোর্টস্‌ম্যান' রাশিয়ান সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল নিজের ছেলের রচনা সত্ত্বেও তা তিনি পড়ে দেখেন নি।

তুর্গেনিভ যদি সরকারী চাকরি গ্রহণ করতেন তাহলে কে তাঁকে আজ মনে রাখত? কে তাঁর মা শ্রীমতী পেত্রোভনার নাম জানত? তুর্গেনিভ সাহিত্য-সাধনা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে মা'র নামও অমরত্ব লাভ করেছে।

১৮১৮ সালের ২৮শে অক্টোবর ওরিয়লে আইভান সেরগেয়েভিচ তুর্গেনিভ এক ধনী জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মা ভার্‌ভারা পেত্রোভনা ছিলেন ক্ষমতালোভী জঁাদরেল মহিলা। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগের পর তাঁর মা আবার বিয়ে করেছিলেন। বি-পিতার সংসারে নির্যাতন সইতে না পেরে পেত্রোভনাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল বাড়ি থেকে। সৌভাগ্যক্রমে উত্তরাধিকারীসূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি পাওয়ায় তাঁর জীবনের দুঃসহ ভার লাঘব হল। এর ফলে তাঁর

চরিত্রের একটা নতুন দিকও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে লাগল। ছেলেবেলায় নিরুপায়ভাবে অত্যাচার সইতে হয়েছিল বলে প্রভুত্বের সুযোগ পেয়ে তিনি তাঁর প্রজা ও কর্মচারীদের উপর নির্মম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

পেত্রোভনার বয়স যখন উনত্রিশ তখন সেনা বিভাগের তেইশ বছর বয়স্ক অফিসার সেরগে তুর্গেনিভের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জীবনে আর একবার পেত্রোভনা সৌভাগ্যের দেখা পেলেন। তখনকার দিনে মেয়েদের উনত্রিশ বছর বয়সে বিয়ের আশা থাকত না। পেত্রোভনা সুদর্শন এবং চাকরি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বামী তো পেলেনই, তার উপরে পেলেন শ্বশুর বাড়ির বৃহৎ সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব। স্বামীকেও নিজের মুঠির মধ্যে আনতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। ক্ষমতাদর্পী পেত্রোভনার কর্মচারী এবং আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতি নির্মম ব্যবহার তুর্গেনিভের অনুভূতিপ্রবণ মনে বাল্যকাল থেকেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর প্রতিক্রিয়া তুর্গেনিভের রচনা ও ভাবাদর্শে প্রতিফলিত হয়েছে।

তুর্গেনিভের ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামাঞ্চলে। তাঁদের প্রাসাদোপম বাড়ির চারদিকে ছিল বিস্তৃত উদ্যান। সেই উদ্যানে একা একা ঘুরে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। ছেলেবেলায় তিনি আনন্দের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন রাশিয়ান বইয়ের মধ্যে। রাশিয়ান ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখেছিলেন বাবার সহকারী লোবানভের কাছে। মা-বাবা রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্য অবজ্ঞা করলেও তুর্গেনিভ ঝি-চাকর এবং প্রজাদের সাহচর্যে রাশিয়ান ভাষা দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সেই তিনি রাশিয়ান ভাষায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন।

১৮২৭ সালে তুর্গেনিভ পরিবার ছেলেদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য চলে এলেন মস্কো শহরে। এখানকার স্কুলে সাহিত্যানুরাগী অনেক বন্ধু পেলেন তুর্গেনিভ। স্কুলে তাঁর জার্মান চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। এবং স্কুলের ছাত্র হিসাবে তিনি ইংরেজী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে য়ুরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে স্কুলের এ দু'টি প্রাথমিক শিক্ষা সহায়তা করেছে।

তেরো বছর বয়সেই তুর্গেনিভ নানা বিষয়ের বহু বই পড়েছেন। শুধু পড়েন নি, লিখেছেন অনেক। কিন্তু সে সব রচনা পরিচিত লেখকের ছায়ানুসরণ

মাত্র। তেরো বছর বয়সে অকস্মাৎ বইয়ের আড়াল একদিন চলে গেল, জীবনের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি পরিচয় ঘটল। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক তরুণীর প্রেমে পড়লেন কিশোর তুর্গেনিভ। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি কৈশোর থেকে হঠাৎ পরিণত বয়সে পৌছে গেলেন। তার উপর যখন জানতে পারলেন এই তরুণী তাঁর বাবার প্রণয়িনী তখন হৃদয়াবেগের আবর্তে পড়ে জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তিনি। এই ঘটনা অবলম্বন করে পরবর্তীকালে তুর্গেনিভ লিখেছেন তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প 'প্রথম প্রেম' (১৮৬০)। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তুর্গেনিভ পিতার চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। কারণ তুর্গেনিভ জানতেন বিবাহিত জীবনে বাবা সুখী ছিলেন না। স্ত্রীর কাছে যা পাননি অন্য নারীর নিকট তা তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে তুর্গেনিভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমেরিকার গণতন্ত্রের প্রতি তুর্গেনিভের তরুণ মন এ সময় শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল; সহপাঠীদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তিনি ভালোবাসতেন। এই আগ্রহ লক্ষ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'দি আমেরিকান।'

১৮৩৪ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ছেলেবেলা থেকে মা'র প্রভাবই উপলব্ধি করেছেন; বাবা থাকতেন পশ্চাতে। তাই তাঁর মৃত্যু গভীর শোকের কারণ হয়নি। বরং এই সময় থেকেই তুর্গেনিভ নিয়মিতভাবে সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন। পুস্তক সমালোচনা এবং সেক্সপীয়র ও বায়রণ থেকে অনুবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। বায়রণের 'ম্যানফ্রেড'-এর অনুকরণে রচিত তিন অঙ্কের কাব্য-নাটক 'স্টেনো' তিনি দিলেন রাশিয়ান সাহিত্যের অধ্যাপক পিটার প্লেতনিয়ভকে। তিনি সম্পাদনা করতেন 'রাশিয়ান রিভিউ'। সম্পাদক সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনা অনুমোদন করতে পারেন নি; কিন্তু তুর্গেনিভের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার মতো প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর পত্রিকায় তুর্গেনিভের দু'টি কবিতা ছাপা হল। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই তাঁর লেখক-জীবনের সূত্রপাত।

তুর্গেনিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৩৭ সালে। স্নাতকোত্তর পাঠ প্রস্তুত করবার জন্য তাঁকে বার্লিন যেতে হয়েছিল। তুর্গেনিভের উদ্দেশ্য ছিল এম-এ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবার।

কিন্তু বেলিনস্কির সঙ্গে পরিচিত হবার পর সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করলেন। দূর হল অধ্যাপক হবার আকাঙ্ক্ষা; সাহিত্য-সাধনা হল তাঁর জীবনের ব্রত।

তুর্গেনিভ বার্লিন গিয়েছিলেন সমুদ্রপথে। জাহাজে একদিন হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আতঙ্কে তুর্গেনিভ নাকি উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শিশু ও নারীদের জীবন রক্ষার অগ্রাধিকার উপেক্ষা করে নিজে বাঁচবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। গল্প রটেছিল যে, তিনি যাত্রীদের কাছে সাশ্রুনয়নে অনুনয় করেছিলেন: 'আমি মা'র একমাত্র ছেলে, আমাকে বাঁচান।' রাশিয়ার অভিজাত মহলে তুর্গেনিভের এই অশোভন মৃত্যুভীতি কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। দস্তয়েভস্কি তাঁর 'দি ডেভিলস্' কাহিনীতে এই ঘটনাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এর ফলে তুর্গেনিভের সঙ্গে তাঁর যে মনোমালিন্য ঘটেছিল তা সম্পূর্ণরূপে কখনো দূর হয়নি। তুর্গেনিভ সম্বন্ধে যা রটেছিল তার মধ্যে অতিরঞ্জন অবশ্যই ছিল। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তিনি প্রাণভয়ে একান্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে তুর্গেনিভ হাইপোকণ্ড্রিয়া বা ব্যাধি-কল্পনা রোগে ভুগতেন। এই ইতিহাস যাদের জানা ছিল না তাদের নিকট তাঁর ব্যবহার খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

১৮৩৭ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত তুর্গেনিভ ছিলেন বার্লিনে। মা'র তাগিদে কিছুদিনের জন্য রাশিয়ায় ফিরে আবার তিনি গিয়েছিলেন ইতালী। বছর তিনেক বাইরে কাটানোর ফলে তুর্গেনিভ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। বৃহত্তর য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে জীবন সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ উদার হয়েছিল।

বার্লিনে নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর। নিজে নৈরাজ্যবাদী না হলেও বাকুনিনের প্রখর ব্যক্তিত্ব তুর্গেনিভকে মুগ্ধ করেছিল। রাশিয়ায় ফিরে বাকুনিনের পরিবারের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল। বাকুনিনের বোন তাতিয়ানার প্রতি তিনি কিছুদিনের মধ্যেই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু তাতিয়ানা 'স্বর্গীয় প্রেমের' উন্মাদনায় অন্ধ। যীশু খ্রীষ্টকে হৃদয় নিবেদন করে তুর্গেনিভের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা মেটাবার সম্বল বা প্রবৃত্তি তার ছিল না। তাই তুর্গেনিভকে সরে আসতে হয়েছিল। মানবিক প্রেমের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে বাড়ির দর্জি মেয়েটির সন্তানের পিতা হতে হল তাঁকে। নতুন দায়িত্ব নিতে হল; প্রেমহীন বন্ধন এড়ানো গেল না। এই ঘটনায় তুর্গেনিভের মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হয়ে পড়ল। এম-এ পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হল না।

মা বারবার তাগিদ দিচ্ছেন, অভিজাত পরিবারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে, সরকারী চাকরি নিয়ে, সংসারী হতে। বিয়ে করা হল না। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি পেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করলেন। অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ক্ষেত্রদাস প্রথা (serfdom) দেশের উন্নতির পরিপন্থী। ক্ষেত্রদাসদের দুঃখ লাঘব করবার কথা তিনি ছেলেবেলা থেকে ভেবে এসেছেন। প্রথম সুযোগেই এই কু-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সুস্পষ্টরূপে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কোনো কাজেই অগ্রসর হয়নি।

এই সময় তুর্গেনিভ 'Parasha' নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণ লোকের বস্তুনিষ্ঠ জীবনচিত্র। সমালোচক বেলিনস্কি কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

তুর্গেনিভের পূর্ববর্তী রচনায় ছিল রোমান্টিক ভাবালুতার আধিক্য। এবার থেকে তাঁর রচনায় প্রাধান্য লাভ করল বাস্তবতা। পাঠক ও সমালোচকদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে তুর্গেনিভ এই সময় থেকে নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা শুরু করলেন।

সরকারী চাকরি তুর্গেনিভের ধাতে বেশিদিন সইল না। তিনি পদত্যাগ করলেন। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিল। মা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে এক কাপ চা পর্যন্ত সময় সময় জোটে না। মা'র সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এই দুরবস্থা ভোগ করতে হয়েছে।

১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তুর্গেনিভের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। একদিন অপেরা দেখতে গিয়ে নায়িকা পলিন ভিয়ারদতের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। পলিন রূপসী নয়; কিন্তু তার কথায়, আচরণে এবং সঙ্গীতে এমন যাদু ছিল যা য়ুরোপের খ্যাতনামা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মুগ্ধ করেছে। তুর্গেনিভ একবার দেখেই পলিনকে আত্মদান করলেন। পলিনের স্বামী অপেরা দলেরই ম্যানেজার। পলিনের চেয়ে বিশ বছরের বড়। এই বিবাহিতা নারীর বন্ধুত্ব তুর্গেনিভের জীবনের সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল। অবশ্য তাঁদের সম্পর্ক সর্বদা মধুর ছিল না। কলহ, মতান্তর, অবিশ্বাস মাঝে মাঝে এসে বন্ধুত্বের ভিতকে টলিয়েছে। তথাপি তুর্গেনিভের অবিবাহিত জীবনে পলিনই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার

করেছিল। পলিনের বাড়িতে তাঁর অনেক বছর কেটেছে। পলিনের পরিচর্যা পেয়েছেন মৃত্যুশয্যায়; মৃত্যু হয়েছে পলিনেরই বাড়িতে। ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তুর্গেনিভ রাশিয়া ত্যাগ করে প্যারিস যাত্রা করেন পলিনের সঙ্গে। এই সময় মা'র সঙ্গে তাঁর কলহ চলছিল। সুতরাং রাশিয়া ত্যাগের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্স পৌঁছে বিপদে পড়লেন টাকার অভাবে। পলিনের সহানুভূতি না পেলে তাঁর বিপদ দুঃসহ হত। পলিনের পল্লীগ্রামের বাড়িতে তুর্গেনিভ এসে উঠলেন। তাঁর রচনার প্রথম পর্বের এক বৃহৎ অংশ এখানে লেখা হয়েছে। তুর্গেনিভের মৃত্যুর পর পলিন প্রায়ই গর্ব করে বলত, তার উৎসাহ ও সহায়তা না পেলে তুর্গেনিভের পক্ষে সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হত কি না সন্দেহ। রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের পুর্বে তুর্গেনিভ অনেকগুলি ছোট গল্প এবং নাটক রচনা করে-ছিলেন। এই গল্পগুলি পরে 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পলিনের সহানুভূতি থাকলেও তুর্গেনিভের প্রতি সত্যিকারের প্রেম ছিল না। খ্যাতনামা গায়িকা ও অভিনেত্রীর কাছ থেকে গভীর একনিষ্ঠ ভালোবাসা আশা করাও অন্যায়। বহু ভক্তের দাবি তাদের একটু একটু করে মেটাতে হয়। তুর্গেনিভের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এতে মেটে না। ১৮৫০ সালের জুন মাসে ফ্রান্স থেকে রাশিয়া ফিরে যাবার সময় তাঁর মনে হল যে সম্পর্ক শুধু জ্বালা দেয়, তৃপ্ত করে না, তা ছিন্ন করাই ভালো। বলা বাহুল্য, তা কখনো সম্ভব হয়নি।

পলিনের সঙ্গে তাঁর সে সময়কার সম্পর্ক নিয়ে তুর্গেনিভ কয়েকটি গল্প ও নাটক রচনা করেছিলেন। কুর্তাভেনেলে তাঁদের জীবন-যাত্রার সব চেয়ে সুন্দর ছবি পাওয়া যায় 'পল্লীগ্রামে এক মাস' নাটকে।

এই সময় তুর্গেনিভ কয়েকটি নাটক—বিশেষ করে কমেডি—লিখেছিলেন। পরে তিনি নাট্য-প্রতিভা নেই উপলব্ধি করে আর নাটক লেখেন নি। তিনি বলতেন, মঞ্চে তাঁর নাটক সাফল্যলাভ করেছে পরিচালকের বা অভিনেতার গুণে। নাটকের নিজস্ব গুণ মঞ্চ-সাফল্যের কারণ নয়। সে যাই হোক, নাটক রচনার অভিজ্ঞতা পরে তাঁকে উপন্যাসের সংলাপ লিখতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তুর্গেনিভের উপন্যাসে সংলাপের অংশ বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। সংলাপের গুণে কাহিনী পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখে।

ফ্রান্সে এত দেনা হয়েছিল যে মা টাকা না পাঠালে দেশে ফিরে আসা সম্ভব হত না। রাশিয়া এসে পৌঁছবার কিছুকাল পরে মা'র মৃত্যু হল। তুর্গেনিভ উত্তরাধিকারী সূত্রে যে সম্পত্তি পেলেন তার বার্ষিক আয় পঁচিশ হাজার রুবল। নিজের হাতে কর্তৃত্ব পেয়ে বাড়িতে যে-সব ক্রীতদাস কাজ করত তাদের প্রথমেই মুক্তি দিলেন। ক্ষেত্রদাসদের সপ্তাহে তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারের ক্ষেতে কাজ করতে হত। তুর্গেনিভ বললেন, তোমাদের বেগার খাটতে হবে না ; জমি তোমরাই চাষাবাদ করো, আমাকে শুধু খাজনা দেবে। এত দিনে তুর্গেনিভের স্বপ্ন সফল হল।

কিন্তু তুর্গেনিভের সংস্কার সে যুগের পক্ষে এত বৈপ্লবিক ছিল যে এ জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে। তুর্গেনিভ তাঁর লেখায় ক্ষেত্রদাসদের দুঃখমোচনের কথা ক্রমাগত বলে এসেছেন ; নিজের জমিদারীতে ক্ষেত্রদাস প্রথার সংস্কার করে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় এবং গভর্ণমেণ্ট তাঁর এই মতবাদ সন্দেহের চোখে দেখেছে। এমন কি তলস্তয়, যিনি পরবর্তীকালে চাষীদের জন্য এত করেছেন, তিনিও প্রথমে তুর্গেনিভের গণতান্ত্রিক আদর্শকে অবজ্ঞা করেছেন।

সরকার পক্ষ একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। গগোলের মৃত্যু এনে দিল সেই সুযোগ। তুর্গেনিভের শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাপা হল একটি কাগজে। 'ডেড সোল্‌স্‌' ও 'গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর'-এর লেখককে তিনি মহৎ বলেছেন। এই অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। মাসখানেক থাকলেন জেলে ; তারপর অন্তরীণ করা হল নিজের বাড়িতে। আঠারো মাস অন্তরীণ থাকবার পর নিজের অপরাধ স্বীকার করে তুর্গেনিভ মুক্তি পেয়েছিলেন।

১৮৫২ সালে 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যান' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। গভর্ণমেণ্ট পক্ষের অভিমত ছিল এই যে, 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যানের' গল্পগুলি রাশিয়ান জমিদারী প্রথা ধ্বংস করবার জন্য এক শক্তিশালী আহ্বান। এই বইয়ের গল্পগুলিতে ক্ষেত্রদাসদের প্রতি তুর্গেনিভের গভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র-চিত্রণে তাঁর অসামান্য দক্ষতার প্রমাণও পাওয়া যায় এই স্কেচগুলি থেকে।

ক্ষেত্রদাসদের প্রতি এই সক্রিয় সহানুভূতি তুর্গেনিভের কারাবাসের কারণ হয়েছিল। কিন্তু 'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যান' ভবিষ্যৎ সংস্কারের পূর্বাভাষ প্রকাশ করেছে। যে গভর্ণমেণ্ট তুর্গেনিভকে নির্যাতন করেছে সেই গভর্ণমেণ্টই

ক্ষেত্রদাস প্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

'দি ডায়েরি অব এ স্পোর্টসম্যান'-এর যত মূল্যই থাক এটি কতকগুলি রেখাচিত্রের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। ১৮৫৮ সালে তুর্গেনিভের প্রথম ছোট উপন্যাস 'রুদিন' প্রকাশিত হল। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর পরিচয় আমরা এই বইয়ের মধ্যে প্রথম পাই। কাহিনীর নায়ক রুদিন শিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণ। বক্তৃতা করতে পারে চমৎকার। বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ নেই। কথায় সে দৈত্য, কাজে বামন। রুদিনের আদর্শবাদী বক্তৃতা শুনে নাতালিয়া মুগ্ধ হল। শীঘ্রই তাদের মধ্যে গড়ে উঠল প্রেমের সম্পর্ক। রুদিনের জন্য নাতালিয়া সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাদের প্রেম সার্থক হবার সুযোগ পেল না। ১৮৪৮ সালে প্যারিসের জুলাই বিদ্রোহে রুদিন প্রাণ হারালো। গল্প শেষ হয়েছে নাতালিয়ার অন্যত্র বিয়ের কথা দিয়ে।

তুর্গেনিভের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় তা রুদিন থেকেই শুরু হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কের জন্ম অভিজাত পরিবারে ; তারা আদর্শ বক্তা ; কিন্তু সেই আদর্শকে কার্যে পরিণত করবার মতো শক্তি নেই। তুর্গেনিভের নায়িকারা ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। নায়কের জন্য যে কোনো ত্যাগ করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত।

১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে তুর্গেনিভ তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন। সার্থক সৃষ্টির জন্য যেমন অভিনন্দন লাভ করেছেন তেমনি নানা আঘাতে এই সময় তাঁর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে তলস্তয়ের সঙ্গে এমন প্রবল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল যে কলহ-মীমাংসার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের আয়োজন পর্যন্ত হয়েছিল। শুধু শেষ মুহূর্তে তলস্তয় পিছিয়ে যাওয়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হতে পারেনি।

এই পর্বের প্রথম উপন্যাস 'দি হাউস অব জেণ্টল ফোক' অথবা 'এ নোবল্‌ম্যান্‌স্‌ নেস্ট' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে থাকে। এই উপন্যাসে প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী রাশিয়ান ভদ্রসমাজের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী বলা হয়েছে। লাভ্রেৎস্কি বেশি বয়সে পড়তে এসেছে মস্কো শহরে। এখানে তার পরিচয় হল প্যাভ্‌লোভনার সঙ্গে। প্যাভ্‌লোভনাকে ভালো করে জানবার পূর্বেই সে তাকে বিয়ে করল। অল্পদিন পর থেকেই শুরু হল ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

লাভ্রেৎস্কি নিজের মনে বই নিয়ে পড়ে থাকে ; আর স্ত্রী ঘুরে ঘুরে স্ফূর্তিতে দিন কাটায়। একদিন লাভ্রেৎস্কি আবিষ্কার করল স্ত্রী ভ্রষ্ট-চরিত্র। শান্তি লাভের আশায় সে মস্কো ত্যাগ করে গ্রামে এল। এখানে বন্ধুত্ব হল ধর্মভীরু আদর্শনিষ্ঠ তরুণী লিজার সঙ্গে। লিজার মা মেয়ের বিয়ে এমন একজন লোকের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছেন যার কোনো আদর্শের বালাই নেই,—একেবারে লিজার বিপরীত চরিত্রের মানুষ। বিয়ে এতদিনে হয়ে যেত। লাভ্রেৎস্কি লিজাকে বুঝিয়েছে, মা'র কথা শুনে বিয়ে করো না। নিজের হৃদয়ের সমর্থন পেলে বিয়েতে সম্মতি দেবে। লিজার মন যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন খবর পাওয়া গেল প্যাভ্‌লোভনার মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে লিজা ও লাভ্রেৎস্কি স্বস্তিবোধ করল। এখন দু'জনের মিলনের পথে আর বাধা নেই। কিন্তু তখনই প্যাভ্‌লোভনা সশরীরে এসে উপস্থিত হল ; মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে দু'টি সহৃদয় নরনারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশ্য তাদের প্রেম সার্থক হল না বলেই তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। লিজা সেবাব্রত নিয়ে কনভেণ্টে প্রবেশ করল। আর লাভ্রেৎস্কি নিজের প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে সান্ত্বনা পেল।

১৮৬০ সালে বের হল 'অন দি ইভ্'। ক্ষেত্রদাস প্রথা সংস্কারের পূর্ব বৎসর বেরিয়েছে বলে কাহিনীর এই নামকরণ করা হয়েছে। তদানীন্তন কালের এক আধুনিকার চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়াই ছিল তুর্গেনিভের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলা যায় না।

বেরসেনেভ ছুটির সময় তার বন্ধু ইন্‌সারভকে বাড়ি নিয়ে এল। ইনসারভ বুলগেরিয়ান বিপ্লবী। সে চমকপ্রদ কথাবার্তা বলে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। বেরসেনেভ তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ইনসারভের পরিচয় করিয়ে দিল। এলেনা নিকোলায়েভনাকে বেরসেনেভ ভালোবাসত। ইনসারভের সঙ্গে আলাপ হবার পর এলেনার মন তার প্রতি আকৃষ্ট হল। ইনসারভের কথাবার্তার ঔজ্জ্বল্য তাকে মুগ্ধ করেছে। ভালো করে জানবার পূর্বেই এলেনা গোপনে ইনসারভকে বিয়ে করল। বিয়ের কথা প্রকাশ পাবার পর এলেনার আত্মীয়-স্বজনের ক্রোধের সীমা রইল না। এদিকে বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল। ইনসারভ স্থির করল দেশের এই বিপদের দিনে বিদেশে থাকা উচিত নয়। এলেনা স্বামীর সঙ্গে যাত্রা করল। ইনসারভ দেশে পৌছতে পারল না। ভেনিসে তাঁর মৃত্যু হল। এলেনা

বুলগেরিয়ায় ইনসারভের মৃতদেহ কবর দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ তার সন্ধান পেল না।

'অন দি ইভ' বের হবার পরে গঞ্চারভ প্রকাশ্যে অভিযোগ তুললেন যে তাঁর প্লট চুরি করে তুর্গেনিভ এই উপন্যাস লিখেছেন। এ নিয়ে বিরক্তিকর বাদানুবাদ চলেছিল অনেকদিন।

তুর্গেনিভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। শুধু সাহিত্যের বিচারে নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারেও এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তুর্গেনিভের জীবনেও রাশিয়ান পাঠকদের এ বইয়ের নিন্দা-প্রশংসার প্রভাব যেরূপ পড়েছে অন্য কোনো উপন্যাসের প্রভাব তেমন পড়েনি।

'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' যে সময়কার সমাজ নিয়ে লেখা সে সময় রাশিয়ার নবীন ও প্রবীণের মধ্যে আদর্শগত প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। একদল রাশিয়ান তরুণ যা-কিছু প্রাচীন তাকে ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর ; প্রবীণেরা চাইত প্রাণপণে নতুন ভাবধারা ঠেকিয়ে রাখতে। উপন্যাসের নাম থেকেই বোঝা যায় এই দ্বন্দ্ব কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নায়ক বাজারোভ চিরাচরিত ভাবধারা ও জীবন-যাত্রায় শ্রদ্ধাহীন রাশিয়ান তরুণদের প্রতীক। এই উদ্ধত অস্বীকৃতির মনোভাবকে তুর্গেনিভ nihilism বলেছেন। বাজারোভের বন্ধু আরকাদি নিহিলিস্টের সংজ্ঞা দিয়েছে এই : 'A Nihilist is a man who does not bow down before any authority, who does not take any principle on faith, whatever reverence that principle may be enshrined in.' তুর্গেনিভ সর্বপ্রথম নিহিলিস্ট কথা ব্যবহার করেন আর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি প্রচার লাভ করে। তুর্গেনিভ নিন্দাসূচক অর্থে নিহিলিস্ট কথা ব্যবহার করেন নি ; কিন্তু রাশিয়ান সরকার প্রথম থেকেই সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত তরুণদের এই নামে অভিহিত করেছে।

বাজারোভ ও তার সহপাঠী আর্কাদির পরিবারকে আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই। দু'টি পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটল যখন একবার আর্কাদির বাড়ি বাজারোভ বেড়াতে এল। আর্কাদির বাবা কিরসানোভের সঙ্গে বাজারোভের আদর্শের সংঘাত বাধতে দেরী হল না। সুন্দরী বিধবা মাদাম ওদিন্তসভকে ভালোবাসল বাজারোভ। কিন্তু প্রতিদান পেল না। তখন সে চলে

এল নিজের বাড়ি। তার বাবা ভ্যাসিলি গ্রামের ডাক্তার; ডাক্তার পুত্রকে সঙ্গী পেয়ে তার আনন্দ হল। গ্রামের চাষীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করে সান্ত্বনা লাভ করল বাজারোভ। কিন্তু কিছুদিন পরে রোগীর দেহ থেকে টাইফাস রোগের বীজাণু সংক্রামিত হওয়ায় বাজারোভের মৃত্যু হল।

এই উপন্যাসে বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য হলেও হৃদয়াবেগের অভাব নেই। এখানে প্রেম, সমাজ সংস্কার, ক্ষেত্রদাসের প্রতি সহানুভূতি সব কিছুই আছে। বাজারোভ নিহিলিস্ট হলেও তার চরিত্র খণ্ডিত নয়, পুরোপুরি মানুষ হিসাবেই তাকে পাই।

'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স'-এর সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা 'স্মোক' (১৮৬৭) উপন্যাসেও পাওয়া যাবে। ক্ষেত্রদাসেরা মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে নিহিলিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নিহিলিস্টরা বিজ্ঞান, যুক্তি ও শিক্ষার সাহায্যে জাতির অগ্রগতিতে আস্থাশীল। গির্জার কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক একনায়কত্ব তারা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তন।

রাজনৈতিক পটভূমিকা সত্ত্বেও আসলে 'স্মোক' প্রেমের কাহিনী। সুন্দরী আইরিনের পেছনে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে লিতভিনভ যখন তানিয়াকে বিয়ে করবে স্থির করেছে তখন আইরিনের খেয়াল হল সে এই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেবে। আইরিনের প্রেমের অভিনয়ে লিতভিনভ ভুলে গেল; তানিয়ার কথা আর মনে রইল না। লিতভিনভ এবার প্রস্তাব করল, যদি সত্যি ভালোবাসে তাহলে আইরিনকে তার সঙ্গে অন্যত্র যেতে হবে। আইরিন সম্মত হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে স্টেশনে এল না, লিতভিনভ যাত্রা করল একা। গাড়ী চলেছে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে। গাড়ীর জানালা দিয়ে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হল সব, সব কিছুই ধোঁয়া; তার জীবন, রাশিয়ার জীবন···।

কয়েক বছর পরে তানিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হল। তানিয়া তাকে ক্ষমা করে বিয়ে করতে সম্মত হল। লিতভিনভের আর দুঃখ রইল না।

লিতভিনভ যেমন অনেক দুঃখ অতিক্রম করে সুখ ও শান্তি লাভ করেছিল, তেমনি রাশিয়াও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে যদি জনসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তে উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। 'স্মোক'-এর যদি কোনো ইঙ্গিতার্থ থাকে, তাহলে এই।

প্রায় দশ বছর পরে 'ভার্জিন সয়েল' বের হয়। শিল্পকলার দিক থেকে বিচার করলে এটি হয়ত তুর্গেনিভের প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে পড়বে না। কিন্তু রাশিয়া সম্বন্ধে এখানে লেখক যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন তা আশ্চর্যরূপে সত্য হয়েছে। এ কথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, তুর্গেনিভ বোধ হয় কয়েক বৎসর পরের ঘটনাবলী অলৌকিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে কাহিনী রচনা করেছেন। নিহিলিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার দুর্বলতা, গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রসার এবং নতুন রাশিয়ার অভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ তুর্গেনিভ নিপুণভাবে করেছেন।

কাহিনীর নায়ক নেজদানভ নিহিলিস্ট। গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সে যুক্ত। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা তার নেই। সে পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান। যে বাড়িতে সে গৃহশিক্ষকের কাজ করত সে বাড়ির আশ্রিতা মারিনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। রাত্রিতে দু'জনে গোপনে দেখা করে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করত। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে নেজদানভের কাজ রইল না। মারিনাকে সঙ্গে করে সে চলে গেল।

তারা দু'জনে চাষীদের মধ্যে কাজ শুরু করল। চাষীরা নেজদানভকে বুঝতে পারে না; তার বিপ্লবের আদর্শ সাধারণ লোকের উপলব্ধির অতীত। নেজদানভের আদর্শ বহুলাংশে পুঁথিগত; আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যে কঠোর সঙ্কল্প ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন তা নেজদানভের ছিল না। এই জন্যই নেজদানভ চাষীদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি।

মারিনাও নেজদানভের দুর্বলতা লক্ষ্য করেছে। তাদের সহকর্মী সলোমিনের প্রতি মারিনা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে লাগল। সলোমিনের চরিত্রে আদর্শ ও কর্মদক্ষতার সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। তার কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে মারিনার মনে আস্থা আছে। পুলিশ তাদের ধরবার জন্য পিছু নেবার পর নেজদানভ আত্মহত্যা করল। মারিনা বিয়ে করল সলোমিনকে; পুলিশের হাত এড়িয়ে পালিয়ে গেল তারা। ওরা পরস্পরকে পেয়ে সুখী হয়েছিল এই বিশ্বাসের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

সলোমিন রাশিয়ান সাহিত্যে একটি নতুন ধরনের চরিত্র। সে ভাবপ্রবণ এবং বই-পড়া আদর্শবাদ নয়। আদর্শবাদী ও কর্মক্ষমতার সামঞ্জস্য ঘটেছে তার ব্যক্তিত্বে। বরং সে কর্মবীর হিসাবেই আমাদের দৃষ্টি অধিকতর আকর্ষণ করে। নতুন রাশিয়া যারা গড়েছে সলোমিন তাদের পুরোবর্তী হয়ে এসেছে।

'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' রাশিয়ার পাঠকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তরুণের দল ভেবেছিল লেখক তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছেন; আর প্রবীণদের মনে হয়েছে তাদের সংস্কারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আসলে তুর্গেনিভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে সমসাময়িক সমাজের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু সময়ের অনেক আগে এসেছিলেন বলে তাঁকে অনেকেই ভুল বুঝেছে।

'ভার্জিন সয়েল' বের হবার পরেও রাশিয়ায় প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল এ বই কেন্দ্র করে। বিদেশে 'ভার্জিন সয়েল' অধিকতর সমাদর লাভ করেছিল। একজন সমালোচক তা লক্ষ্য করে বলেছেন: 'Let the foreigners write articles about him, we don't want even to spit on him.'

'ভার্জিন সয়েল'-এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এর অবাস্তব রাজনৈতিক পরিবেশ। সমালোচকদের মতে রাশিয়ায় তখনো গুপ্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল না এবং মারিনার মতো কোনো যুবতী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এটা ছিল তাদের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু আশ্চর্য, বই বের হবার মাসখানেক পরেই গভর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রবিরোধী গুপ্ত আন্দোলনে লিপ্ত থাকবার অভিযোগে বাহান্ন জনকে গ্রেপ্তার করল, তার মধ্যে আঠারো জন নারী। এই ঘটনার পরে অনেকের সন্দেহ হল যে তুর্গেনিভ নিশ্চয়ই গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপন্যাস লিখেছেন। এই জন্য গভর্ণমেণ্ট বরাবরই তাঁর প্রতি বিরূপ ছিল। তুর্গেনিভের মৃত্যুর পরে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গভর্ণমেণ্ট অংশ গ্রহণ করেনি; তলস্তয় প্রভৃতির শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্যন্ত প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি।

তুর্গেনিভের মতো সমাজ-সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তুর্গেনিভের রাজনৈতিক দাবি ছিল সাধারণ। নাগরিকদের মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করা, তাদের আর্থিক ও সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা দূর করা এবং রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর আদর্শ। তুর্গেনিভ যদি রাজনীতি সম্পর্কহীন কাহিনী রচনা করতেন তাহলে তাঁকে বিরূপ সমালোচনা এবং বিরূপ ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হত না। অন্যায় সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দীর্ঘকাল রাশিয়ার বাইরে—বিশেষ করে প্যারিসে কাটিয়েছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল রচনাই তুর্গেনিভের সাহিত্য-কর্মের প্রধান

বৈশিষ্ট্য নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শিল্পী হিসাবে তাঁর সমকক্ষ বেশি নেই। কোনো কোনো সমালোচকের মতে তিনিই বিগত শতকের শিল্পকলা-সচেতন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। দীর্ঘ একত্রিশ বছরের সাহিত্য সাধনায় তিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক ও গদ্য কবিতা রচনা করেছেন। রাশিয়ান গদ্য তাঁর হাতে আশ্চর্য রূপ লাভ করেছে। তাঁর গদ্য কবিতার সঙ্কলন 'সনিলিয়ারের' (১৮৭৯—১৮৮৩) ভূমিকায় রাশিয়ান ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: 'In days of doubt, in days of sad brooding on my country's fate, thou alone art my rod and my staff—mighty true, free Russian speech!'

তুর্গেনিভ দক্ষ গল্পকার; নিপুণ ভাষা-শিল্পী; তিনি সমাজ-সচেতন এবং আদর্শবাদী; কিন্তু তাঁর রচনার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মানবিকতাবোধ। মানব-প্রীতির জন্যই তাঁর অধিকাংশ রচনা মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তুর্গেনিভ এই সম্পর্কে বলেছেন: 'I am, above all, a realist; and chiefly interested in the living truth of the human race···I don't believe in absolutes and systems; I love freedom better than anything.···Everything human is dear to me.'

তুর্গেনিভ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। ফ্লোবেয়ার, মোপাসাঁ, জোলা গঁকর ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি বহু লেখকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। বৃহত্তর য়ুরোপের সংস্কৃতি তিনি রাশিয়ান পাঠকদের পরিবেশন করেছেন; এবং রাশিয়ান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবধারা রাশিয়ার বাইরে প্রচার করেছেন।

শুভ্রকেশ, বিশালকায় তুর্গেনিভের হৃদয় ছিল একান্ত কোমল। বহু দুঃস্থ সাহিত্যিককে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। মোপাসাঁ ও জোলার বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করে তাঁদের দুঃসময়ে আয়ের পথও করে দিয়েছিলেন তিনি। মোপাসাঁ তুর্গেনিভ সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন: 'No more cultivated, penetrating spirit, no more loyal, generous heart than his ever existed.'

১৮৮৩ সালে তুর্গেনিভ অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মোপাসাঁ যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন

তখন অনুনয় করেছিলেন: একটা রিভলবার এনে দাও, যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না।

. পলিন ভিয়ারদতের প্যারিসের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। যন্ত্রণা সত্ত্বেও তুর্গেনিভের কেবল রাশিয়ার কথা মনে পড়ত। রাশিয়ান চাষীদের ভাষায় কথা বলেছেন শেষের ক'দিন; রোগশয্যার পাশে কোনো রাশিয়ান মুখ দেখতে পেলে তাঁর আনন্দের সীমা থাকত না। তলস্তয়কে তিনি অন্তিম অনুরোধ করে লিখেছিলেন আবার নতুনভাবে সাহিত্য-সাধনা শুরু করতে। তুর্গেনিভের এই অনুরোধ-পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তুর্গেনিভ মুখে মুখে একটি গল্প বলে গিয়েছেন এবং পলিন লিখেছে। গল্পটির নাম 'দি এণ্ড' বা সমাপ্তি। এক অভিজাত রাশিয়ান পরিবারের বংশধর দ্রুত অধোগতির পথে যেতে যেতে একেবারে ঘোড়া-চোরে পরিণত হল। ক্রুদ্ধ চাষীরা চোরকে ধরে শোচনীয়ভাবে হত্যা করল। ধনীর দুলালের এই শোচনীয় পরিণতির মধ্যে রাশিয়ান বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মৃত্যুপথযাত্রী তুর্গেনিভের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়নি।

দস্তয়েভস্কি

১৮২১-৮১

সশস্ত্র সৈন্যের ব্যূহ। তার বাইরে কৌতূহলী জনতার ভিড়। পেত্রাশেভস্কি ও তাঁর সহকর্মীদের আনা হয়েছে বধ্যভূমিতে। জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অভিযোগে এঁদের প্রাণদণ্ড হয়েছে। একে একে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনানো হল। কেরানী একজন আসামীর সামনে এসে পড়ল: 'ফয়দোর মিখাইলোভিচ দস্তয়েভস্কি··· সম্রাট ও চার্চের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা এবং প্রচার করবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল···'

জনতার মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল। দস্তয়েভস্কির নাম অনেকের নিকট পরিচিত।

পবিত্র ক্রশ নিয়ে পাদ্রি প্রত্যেক কয়েদিকে স্পর্শ করে গেলেন। মোটা কাপড়ে মুখ ঢেকে কয়েদিদের বাঁধা হল কাঠের খুঁটির সঙ্গে। জল্লাদ বন্দুকের নিশানা ঠিক করে অপেক্ষা করছে। উপরওয়ালার আদেশ কানে আসতেই চাবি টানবে।

অকস্মাৎ দেখা গেল শাদা রুমাল উড়িয়ে জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে একজন অফিসার আসছে। সম্রাটের দয়া হয়েছে, প্রাণদণ্ড মকুব করে তিনি আসামীদের আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেছেন। প্রথম চার বছর ক্রীতদাসের মতো কঠোর জীবন যাপন করতে হবে। পরবর্তী চার বছর করতে হবে সেনাবিভাগের দাসত্ব।

প্রাণদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করবার তীব্র যন্ত্রণায় কোনো কোনো আসামীর মাথার চুল গেছে শাদা হয়ে। কারো মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। এমন নিদারুণ সেই অপেক্ষা! দস্তয়েভস্কির তেমন কিছু হয়নি। তবে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর লেখক-জীবনের মৃত্যু। প্রথম বই প্রকাশিত হবার পরই স্বীকৃতি লাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এখন লেখা বন্ধ হয়ে যাবে। সংস্কৃতি ও সভ্যতার জগৎ থেকে এক অন্ধকার জগতে

তিনি হারিয়ে যাবেন। তাই প্রাণ বাঁচলেও দস্তয়েভস্কি আনন্দ অনুভব করলেন না।

১৮২১ সালে দস্তয়েভস্কির (Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky) জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন নিঃস্ব রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট এক হাসপাতালের ডাক্তার। হাসপাতালের সংলগ্ন ছোট কোয়ার্টারে তাঁরা থাকতেন। দস্তয়েভস্কির চার ভাই দুই বোন। এই বড় পরিবারের খরচ চালাতে ডাক্তার দস্তয়েভস্কির বেশ কষ্ট হত। এ ছাড়া তাঁর কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। তিনি ভাবতেন, সংসারে কেউ তাঁকে প্রকৃত মূল্য দেয়নি। জীবনের কাছে কেবলই তিনি ঠকে চলেছেন। রুক্ষ মেজাজ; কখনো অকারণে কলহ বাধিয়ে তোলেন, কখনো বা বিমর্ষ হয়ে নীরবে বসে থাকেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু স্ত্রীকে প্রায়ই নির্যাতন ভোগ করতে হত। স্বামীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তথাপি ডাক্তার দস্তয়েভস্কি স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করতেন। সন্দেহের জ্বালায় স্ত্রীকে নির্যাতন করতেন নানা উপায়ে। বালক দস্তয়েভস্কির হৃদয়ে মা'র প্রতি এই অত্যাচারের ছবি গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। মা'কে গভীর ভাবে ভালোবাসতেন বলে তাঁর অপমানে দস্তয়েভস্কি বেদনা পেতেন।

যখন বছর পনেরো বয়স হল তখন ধরা পড়ল মা'র ক্ষয়রোগ। শীর্ণ, রক্ত-শূন্য শয্যালগ্ন মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে দস্তয়েভস্কির মন মমতায় পূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু তাঁর করবার কিছুই ছিল না। প্রায় এক বছর ভুগে মা'র মৃত্যু হল।

বয়স হয়েছে। বসে শোক করবার সময় নেই। বড় ভাই মাইকেল, তাকে ভর্তি করে দেওয়া হল সেণ্ট পীটার্সবার্গের মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে। দস্তয়েভস্কির স্কুলের জীবন ভালো লাগেনি। উপরের ক্লাশের ছেলেরা ছোট-খাটো অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এখানে পড়বার সময় বাড়ি থেকে খবর আসতে লাগল বাবা নারী ও সুরা নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছেন। তুচ্ছ কারণে বাড়ির চাকর এবং ভূমিদাসদের চাবুক মারতেন ডাক্তার দস্তয়েভস্কি। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য এরা ষড়যন্ত্র করল। একদিন ডাক্তার বাড়ি ফিরে এলেন না। তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল। পুলিশের অনুসন্ধানে অপরাধীরা ধরা পড়ল না। মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে—এই রিপোর্ট দিয়ে কেস গুটিয়ে ফেলা হল।

পিতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু দস্তয়েভস্কির জীবনের ভিত্তিভূমি কাঁপিয়ে তুলল। কিছুদিন পর থেকে মৃগীরোগের আক্রমণ শুরু হল। দস্তয়েভস্কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

দস্তয়েভস্কির জীবন ও রচনা থেকে ফ্রয়েড অনেক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন মনোবিশ্লেষণের তত্ত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে। দস্তয়েভস্কির মৃগীরোগে আক্রান্ত হবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, মা'কে কষ্ট দেবার জন্য শিশুকাল থেকেই বাবার প্রতি দস্তয়েভস্কি বিদ্বেষ পোষন করতেন। হয়ত অবচেতন মনে তাঁর গোপন কামনা ছিল, এমন অত্যাচারী পিতার মৃত্যু হোক। কিন্তু শোচনীয়ভাবে পিতার যখন মৃত্যু হল তখন তিনি ভাবলেন, আমি পিতৃহন্তা; আমার গোপন কামনাই তাঁর হত্যার কারণ হয়েছে। স্থতরাং আমি অপরাধী। এই অপরাধবোধ মনের উপর যে চাপ দিয়েছে তার ফলে তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' উপন্যাসের কাহিনী পিতৃহত্যা কেন্দ্র করে রচিত। পিতার মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে দস্তয়েভস্কি নিজের জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন।

দস্তয়েভস্কি পরীক্ষায় পাশ করলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল না। মাপজোখ নক্শা মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভালো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময় থেকেই সাহিত্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। পাঠ্য বই না পড়ে কেবল পড়তেন সাহিত্য-গ্রন্থ,—কাব্য উপন্যাস নাটক যা-কিছু পাওয়া যেত। শুধু পড়ে তৃপ্তি নেই, নিজেও লিখতে আরম্ভ করলেন। ক্লাশে থেকেও শিক্ষকের কথা তাঁর কানে যেত না। তিনি থাকতেন কল্পনার জগতে, তাঁর পাত্র-পাত্রীদের স্থখ-দুঃখ হাসি-কান্না নিয়ে। পাশ করবার পর সরকারী চাকরি পেলেন। তথাপি তাঁর সাহিত্য-তন্ময়তা দূর হল না। প্রায়ই কাজে ভুল হত, উপরওয়ালাকে অভিবাদন করতে খেয়াল থাকত না। একবার জার নাকি তাঁর একটি নক্শা দেখে মন্তব্য করেছিলেন, কোন নির্বোধ এটা করেছে?

কিছুদিন পরে দস্তয়েভস্কি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। যে কাজের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নেই তা নিয়ে যৌবনটা কাটিয়ে দিলে জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুর্বিষহ হবে ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়ানো। দু'বেলার দু'মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করতে পারবেন যে করে হোক।

চাকরি ছেড়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। নির্দিষ্ট আয় নেই। খুব কষ্টে

দিন চলে। হিসাব করে খরচ করলে হয়ত কষ্টের লাঘব হত। তা তিনি পারেন না। হাতে টাকা এলে যতক্ষণ সে টাকা নিঃশেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ তাঁর স্বস্তি থাকে না। পৈত্রিক সম্পত্তির আয়ের অংশ মাঝে মাঝে পান। হয়ত হাজার টাকা এল। একদিনেই তা উড়ে গেল। রেস্তোরাঁয়, তাসের আড্ডায় এবং নানা রকম নেশায় দু'হাতে টাকা খরচ করেন। দরিদ্র বন্ধুবান্ধব যারা টাকার অভাবে কষ্ট পায় তাদের তিনি সাহায্য করেন অকৃপণ হস্তে।

বাবার বিমর্ষ স্বভাব পেয়েছেন দস্তয়েভস্কি। একা একা ঘরে বসে থাকলেই নানা অস্বস্তিকর চিন্তায় মন অশান্ত হয়ে ওঠে। স্বস্তির সন্ধানে 'সমাজের উচ্ছিষ্ট' নরনারীদের মধ্যে রেস্তোরাঁয় এসে বসেন। রোগাটে শীর্ণ চেহারা, প্রায়ই পেটের ব্যথায় ভুগতে হয়। তথাপি খাদ্য, পানীয় ও রাতজাগায় অনিয়ম করতে দ্বিধা নেই। একা থাকলেই মৃত্যুর ছায়া দেখতে পান। একবার মৃতদেহ দেখে তাঁর সংজ্ঞা লোপ হয়ে গিয়েছিল। একটু অসুস্থ হলেই তাঁর মৃত্যুর পরে কি করতে হবে সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখতেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত আশঙ্কা ছিল বলেই ভবিষ্যৎ জানবার জন্য তাঁর ছিল ঐকান্তিক আগ্রহ। কোনো গণৎকার দেখলেই হাত বাড়িয়ে দিতেন, তাঁর ভবিষ্যৎ কেমন? সুলক্ষণ কুলক্ষণ মিলিয়ে কাজ করতেন। বন্ধুরা আশ্চর্য হয়ে যেত তাঁর কুসংস্কার দেখে।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও দস্তয়েভস্কি নিয়মিত লিখছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। দীর্ঘকাল যাবৎ কেবল লেখা আর সংশোধন চলতে লাগল। এই বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর সংশয়ের শেষ নেই। অথচ এর উপরেই তাঁর লেখক-জীবন সফল হবে কি না নির্ভর করছে।

অবশেষে 'পুওর ফোক'-এর পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হল। ১৮৪৫ সালের মে মাস। দস্তয়েভস্কি এক বন্ধু কবি নেক্রাসভকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে এল। নেক্রাসভ নতুন প্রতিভার আবির্ভাবে বিস্মিত হলেন। শেষ রাত্রিতেই তিনি চলে এলেন অভিনন্দন জানাতে। দস্তয়েভস্কি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাঁকে ডেকে তুলে উন্মত্তের মতো নেক্রাসভ জড়িয়ে ধরলেন। বিখ্যাত সমালোচক বেলিনস্কিও প্রশংসা করলেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়। পর বৎসর 'পুওর ফোক' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হল।

'পুওর ফোক' সরকারী দপ্তরের এক দরিদ্র কেরানীর প্রেমের কাহিনী। মাকার দেভুশ্‌কিন অল্প বেতনের বয়স্ক কেরানী। অত্যন্ত সাধারণ লোক,

কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। প্রতিবেশিনী বারবারাকে সে ভালোবাসল। তার চেয়ে বারবারা বয়সে অনেক ছোট। বারবারার জীবন বড় দুঃখের। দেভুশ্‌কিনের হীনমন্যতা ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে বলবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। বারবারার দুঃখ লাঘবের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। বারবারা যখন বুঝতে পারল নীরব প্রেমের জন্য তিলে তিলে আত্ম-দানের কাহিনী—তখন অন্য একজনকে বিয়ে করে দূরে সরে গেল দেভুশ্‌কিনকে বাঁচাবার জন্য। তাতে দেভুশ্‌কিন বাঁচল না। তার নিরানন্দ জীবন আরো কালো হয়ে উঠল।

'পুওর ফোক' পাঠকদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করল। এরপরে 'শাদা রাত' নামে আত্মজীবনীমূলক একটি ছোট উপন্যাস বের হল। এই দু'টি বইয়ের সহায়তায় সাহিত্য-জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন দস্তয়েভস্কি। আর পেলেন লেখক হিসাবে অভিজাত সমাজে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। পরিচয় হল অনেক লেখক, শিল্পী ও গুণী ব্যক্তির সঙ্গে। বাইশ বছরের বিবাহিতা তরুণী আভদোতিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণ হল গভীর। আর কোনো মেয়ের প্রতি তিনি এমন আকর্ষণ অনুভব করেন নি। এই আকর্ষণ তাঁর জীবন যন্ত্রণাময় করে তুলল। 'পুওর ফোকের' নায়ক দেভুশ্‌কিনের মতোই তাঁর অবস্থা। নিজের শক্তির উপরে তাঁর আস্থা নেই। কুণ্ঠিত প্রেম মনের গোপন কক্ষে মাথা খুঁড়ে মরে, প্রকাশ করতে পারেন না। এর ফলে তাঁর স্নায়ু ক্ষুব্ধ হয়, কথাবার্তা ও ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিক্ষোভ বৃদ্ধি পায় যখন দেখেন আভদোতিয়াকে অন্য অনেকেই প্রেম নিবেদন করছে; তুর্গেনিভও তাদের এক জন। কিন্তু তিনি কিছু বলতে পারেন না। হয়ত এই কারণেই দস্তয়েভস্কি তুর্গেনিভের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন।

প্রথম প্রেম ব্যর্থ হল। নিজের অক্ষমতাকেই তিনি এ জন্য দায়ী করলেন। তাই ব্যর্থতার জ্বালা আরো তীব্র হয়ে উঠল। শীর্ণ দেহ, দুর্বল স্নায়ু, ঋণের বোঝা, লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের অনিশ্চয়তা, ইত্যাদি নানা কারণে কোনো মেয়েকে প্রেম নিবেদনের মতো আত্মপ্রত্যয় তাঁর তখন ছিল না।

জীবন-যন্ত্রণা ভুলে থাকবার জন্য দস্তয়েভস্কি জুয়া ও পণ্যা নারীর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। মদ খেতেন না তিনি। সহজলভ্যা মেয়েদের কাছে যেতেন নিছক দেহের দাবি মেটাতে। আভদোতিয়া আদর্শ প্রেমের আকাশে সুদূর

তারার মতো জ্বলতে থাকে। দস্তয়েভস্কির লেখায় সে স্থান পেয়েছে। কিন্তু জীবনে আভদোতিয়ার স্থান নেই। তার জন্য দায়ী দস্তয়েভস্কির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা এবং অনুভূতিপ্রবণতা দস্তয়েভস্কিকে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করল। তিনি রাশিয়ার সমাজবাদী দলের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাদের বৈঠকে বক্তৃতা করতেন। আদর্শ প্রচারের জন্য লিখতেন নানা রকমের পুস্তিকা। পুলিশের চোখ ছিল তাঁর উপর। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অভিযোগে।

প্রাণদণ্ড থেকে নাটকীয় মুক্তি দিয়ে পায়ে চার সের ওজনের বেড়ী পরিয়ে দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে যাওয়া হল সাইবেরিয়ার বন্দিশালায়। নরকের ধারণা করা যেতে পারে এই বন্দিশালায় বাস করে। দস্তয়েভস্কির কখনো মনে হয়নি তিনি দেশে ফিরে আসতে পারবেন। চোর, ডাকাত, খুনী প্রভৃতির মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন ভদ্রঘরের শিক্ষিত বন্দী। তাই কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি, নরকবাসের দুঃখ সকলের সঙ্গে ভাগ করে গ্রহণ করবার সুযোগ পাননি। সামান্য বিস্বাদ খাদ্য দেওয়া হত—পশুর উপযোগী। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। কারণে অকারণে চাবুক পড়ত পিঠে, অধ্যক্ষের মুখে বিশ্রী গালাগালি লেগেই আছে। হাড়-কাঁপানো শীত থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। তার উপর দস্তয়েভস্কির অসুস্থ শরীরের নানাবিধ গ্লানি জীবন আরো দুর্বিষহ করে তুলেছিল। বাত ও মৃগীরোগের আক্রমণে প্রায়ই তিনি ভুগতেন।

শরীরের কষ্টভোগের শক্তি আশ্চর্য! তাই চার বছর পরে, ১৮৫৪ সালে, দস্তয়েভস্কি 'নরক' থেকে মুক্তি পেয়ে সেমিপালতিনস্কে এলেন বাকী চার বছরের দণ্ড ভোগ করতে। এই ছোট্ট শহরে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সাইবেরিয়া শাখার শিবির। সেনাদলের সঙ্গে থাকতে হবে, চাকরের মতো তাদের কাজ করতে হবে। তবে আগের মতো কষ্ট নেই এ কাজে। একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আছে। সেনাধ্যক্ষ বেলিকভ যখন শুনতে পেলেন তাঁর দলে একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক বন্দী এসেছে, তখন প্রতিদিন দস্তয়েভস্কিকে বাড়িতে ডেকে পাঠাতে লাগলেন খবরের কাগজ পড়ে শোনাবার জন্য। এখানে তাঁর সুযোগ হল স্থানীয় ভদ্রসমাজের সঙ্গে পরিচয় হবার। বেলিকভের বাড়িতেই দেখা হল মারিয়া ও তার স্বামী ইসায়েভের সঙ্গে।

দস্তয়েভস্কি সময় পেলেই মারিয়ার বাড়ি যান। মারিয়ার দুঃখের জীবন। ইসায়েভ বদ্ধ মাতাল। মদ খেয়ে স্বাস্থ্য হারিয়েছে; চাকরি করত তাও গেছে। এখন সংসারের দায়িত্ব মারিয়ার। একটি মাত্র ছেলে, তাকে কেন্দ্র করেই মারিয়ার যত আশা। দস্তয়েভস্কির জীবনের কাহিনী সে শুনেছে। নিজে দুঃখী; তাই তাঁর প্রতি গভীর মমতা অনুভব করে। দস্তয়েভস্কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে মারিয়ার সামনে বসে থাকেন। বরাবরই তাঁর স্বভাব আত্মমুখীন। এতদিন বন্দীশালায় কাটিয়ে আত্মমুখীনতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অকস্মাৎ কোনো অনুভূতির স্ফুলিঙ্গে মন জ্বলে ওঠে, আর উদ্দীপ্ত কণ্ঠে অনর্গল কথা বলতে থাকেন। মারিয়া চুপ করে শোনে। করুণায় তার দু'টি চোখ ছলছল করতে থাকে।

দীর্ঘ চার বছর পরে দস্তয়েভস্কির একটি শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল। দেখতেও মোটামুটি সুন্দরী। মারিয়া দস্তয়েভস্কির মতোই অনুভূতিপ্রবণ। নিজের দুঃখে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত, অন্যের দুঃখেও এক-টুতেই চোখে জল এসে যায়। সহজেই দস্তয়েভস্কি মারিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মনে হল মারিয়াও তার প্রতি আকৃষ্ট। করুণা ও ভালোবাসার পার্থক্য উপলব্ধি করবার মতো মানসিক অবস্থা তখন তাঁর ছিল না।

মারিয়ার সাহচর্য লাভের সুযোগ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ইসায়েভ কয়েক মাইল দূরে একটা চাকরি পেয়েছে। এখানকার বাসা তুলে ওরা চলল নতুন জায়গায়। ভাগ্যের পরিহাস! যাবার কিছুদিন আগে দস্তয়েভস্কি মারিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন ভালোবাসার স্বীকৃতি। শুরু হতেই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। এখন ভরসা শুধু চিঠি। মারিয়ার একটি চিঠির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন দস্তয়েভস্কি।

কিছুদিন পরে ইসায়েভের মৃত্যু হল। দস্তয়েভস্কি ভাবলেন, এখন তো আর বাধা নেই। মারিয়া যদি সত্যি ভালোবাসে তাহলে তাঁদের বিয়ে হতে পারে। মারিয়া স্পষ্ট করে কিছুই বলে না। চিঠিতে সব চেয়ে স্পষ্ট অর্থের জন্য আবেদন। দস্তয়েভস্কি ধার করে যতটা সম্ভব টাকা পাঠিয়ে দেন।

মারিয়া সম্বন্ধে সংশয় তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল। শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। তথাপি সরকারী কাজের ছুতা করে একদিন মারিয়ার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। মারিয়া তাঁকে দেখে কাঁদতে লাগল। দস্তয়েভস্কিকে দেবার মতো আর কিছু নেই মারিয়ার। সে আর এক জনকে

ভালোবেসেছে। স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষক। চব্বিশ বছরের যুবক, সুপুরুষ, চমৎকার স্বাস্থ্য। ত্রিশ বছরের মারিয়াকে সে ভালোবেসেছে, হয়ত শীগগিরই তাদের বিয়ে হবে। দস্তয়েভস্কি পাথর হয়ে গেলেন। যে স্বপ্নের জীবন এতদিন যাবৎ প্রতি মুহূর্তের ভাবনা দিয়ে গড়ে উঠেছে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল!

দস্তয়েভস্কি চুপ করে শুনলেন সব। কলহ করলেন না, মারিয়াকে তিরস্কার করলেন না। ধীরে ধীরে তাকে বুঝিয়ে বললেন, চব্বিশ বছরের যুবক একদিন যদি নিজের ভুল বুঝে তোমাকে ছেড়ে চলে যায়! যৌবনের অস্থিরতায় সে তোমার কাছে এসেছে। আর এক অস্থির তরঙ্গ হয়ত তাকে দূরে নিয়ে যাবে।

দস্তয়েভস্কি নিজের আশা-ভঙ্গের বেদনার কথা কিছুই বললেন না; তাঁকে ঠকাবার জন্য অভিযোগ তুললেন না। শুধু মারিয়ার মঙ্গলই তাঁর কাম্য। মারিয়াকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্বাচনে সতর্ক হবার জন্য অনুরোধ করে ফিরে এলেন।

এই যে নিজের জন্য ওকালতি না করেই দস্তয়েভস্কি চলে গেলেন, মারিয়ার হৃদয় তা গভীরভাবে স্পর্শ করল। পাঠশালার শিক্ষকের প্রতি তার আকর্ষণটা হয়ত একান্তই সাময়িক ছিল। তাছাড়া শুনতে পেল সম্প্রতি দস্তয়েভস্কির পদোন্নতি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সদয় তাঁর উপর। রাশিয়ায় ফিরে আবার তিনি লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। মারিয়া শেষ পর্যন্ত বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিল।

বিয়ে হয়ে গেল। অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়েছে। স্বল্পালোকিত বাসর ঘরে মারিয়া ও দস্তয়েভস্কি। জীবনে এই প্রথম ভালোবাসার স্বপ্ন সফল হল। মারিয়া স্বেচ্ছায় তাঁকে গ্রহণ করেছে। আজকের সাফল্য জীবনের সকল লাঞ্ছনা ও গ্লানি ধুয়ে মুছে দিল। দস্তয়েভস্কি এগিয়ে এলেন। হয়ত স্পর্শ করলেন মারিয়াকে। আর কে জানে কি হল! হয়ত তাঁর মনে পুরনো আশঙ্কা জেগে উঠল: মেয়েদের তৃপ্তি দেবার মতো ক্ষমতা নেই আমার! হয়ত প্রত্যাশা সফল হবার প্রবল আনন্দে ভারসাম্য হারালেন; হয়ত সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ শ্রান্ত। অকস্মাৎ স্নায়ুতন্ত্রের কোথায় কি বিকল হয়ে গেল, আর দস্তয়েভস্কি মুখ থুবড়ে মেঝের উপর পড়ে গেলেন। অমৃতের পাত্র ঠোঁটের কাছে-এসে চূর্ণ হয়ে গেল।

মারিয়া ধরে ওঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। জ্ঞান নেই। মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ করে শব্দ বের হচ্ছে। ডাক্তার এসে বলল, মৃগীরোগ। সব দেখে-শুনে মারিয়া নিজেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

বিয়ের দিনের এই দুর্বিপাক স্বামি-স্ত্রীর মিলনের পথে চিরদিনের জন্য অন্তরায় হয়ে রইল। নতুন সংসারের কর্তৃত্ব পেয়েও মারিয়া অসুখী। মারিয়ার আশা ছিল নারীমহলে সে উচ্চস্থান লাভ করবে। কিন্তু স্বামীর উপার্জন অল্প। ভালো পোশাক কেনা কিংবা বাড়িতে পার্টির আয়োজন করা সে টাকায় সম্ভব নয়। তার উপর দু'জনেরই স্বাস্থ্য খারাপ। মারিয়ার রোগলক্ষণে ক্ষয়রোগের সূচনা দেখা যায়। দু'জনেরই হৃদয় অনুভূতিপ্রবণ। তাই খিটিমিটি লেগেই থাকে। শান্তি নেই। তবে দস্তয়েভস্কি এবার থেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন। আশঙ্কা হয়েছিল আর কোনোদিন বুঝি তিনি লিখতে পারবেন না। বন্দিজীবনের কঠোরতা যখন দূর হল, মারিয়ার জন্য প্রত্যাশা করে থাকা যখন শেষ হল, তখন লেখার মধ্যে পেলেন জীবনের আনন্দের সন্ধান।

১৮৫৯ সালে রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পেলেন দস্তয়েভস্কি। মস্কোর কাছাকাছি ছোট্ট একটি শহরে মারিয়াকে নিয়ে এসে উঠলেন। মারিয়ার অসন্তোষ কাঁটার মতো দস্তয়েভস্কিকে বিঁধতে থাকে। ছোট বাড়ি; খুশি মতো খরচ করবার টাকা নেই; পার্টি দেওয়া যায় না, পছন্দ মতো পোশাক পরিচ্ছদ কেনা যায় না। দস্তয়েভস্কি সব ক্ষমা করেন। মারিয়ার অসুখ বেড়েছে; শরীর আরো শীর্ণ হয়েছে। তার দিকে চেয়ে দস্তয়েভস্কির মন মমতায় পুর্ণ হয়ে যায়। অবচেতন মনে আঁকা হয়ে আছে রোগ-শীর্ণ মা'র ছবি। তাঁরও ছিল ক্ষয়রোগ। মারিয়ার উপর তিনি রাগ করতে পারেন না। যখন অসুখ বাড়ে মাসের পর মাস তিনি স্ত্রীর নিরলস সেবা করে যান। তখন আর তিনি স্বামী নন, লেখক নন, কেউ নন—শুধু নার্স।

১৮৬০ সাল থেকে দস্তয়েভস্কি নতুন উদ্যমে সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করলেন। বড় ভাই মাইকেলের সঙ্গে বের করলেন একটি সাহিত্য-পত্র; নাম: 'টাইম।' এই কাগজে শুরু হল তাঁর Notes From the House of the Dead এবং The Insulted and the Injured. প্রথমটিতে দস্তয়েভস্কি সাইবেরিয়ার বন্দীজীবনের মর্মান্তিক বিবরণ দিয়েছেন; দ্বিতীয় রচনা একটি প্রেমের কাহিনী। নায়ক আইভান একজন লেখক। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছে নাতাশাকে। কিন্তু নাতাশা বিয়ে করল এক ধনীর পুত্রকে। দুই পুরুষ ও এক

নারীর ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্বই এই কাহিনীর উপজীব্য। মারিয়া, পাঠশালার তরুণ শিক্ষক এবং দস্তয়েভস্কির দ্বন্দ্ব এই কাহিনীর মধ্যে সহজেই চেনা যায়।

ধারাবাহিক রচনা দু'টি লেখক হিসাবে তাঁকে নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দিল। বন্দীজীবনের কাহিনী তরুণ সমাজে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করল। দস্তয়েভস্কি ছাত্রদের বৈঠকে প্রায়ই আমন্ত্রণ পান সেই কাহিনী পড়ে শোনাবার জন্য। এমনি এক বৈঠকের শেষে অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে আলাপ হল। বাইশ-তেইশ বছরের ছাত্রী। দস্তয়েভস্কির প্রতিভা ও ক্রমবর্ধমান খ্যাতি তাকে আকৃষ্ট করেছে। সে নিজে স্বেচ্ছায় এসে আত্মসমর্পণ করল। এর আগে সে কখনো কাউকে ভালোবাসেনি; শ্রদ্ধাকেই ভালোবাসা বলে ভুল করল। দস্তয়েভস্কি মুগ্ধ হলেন অ্যাপোলিনারিয়ার রূপে ও সপ্রতিভায়। নারীর কোমলতা ও পুরুষের বীর্যের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটেছে তার মধ্যে। পুরুষের আকাঙ্ক্ষার শাশ্বত নারী সে।

অ্যাপোলিনারিয়া স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আত্মসমর্পণ করতে এসেছে। তার সংস্কার মুক্ত মন। হৃদয় যদি সায় দেয়, সমাজের সমর্থনের জন্য সে অপেক্ষা করে না। আনুষ্ঠানিক বিয়ের চেয়ে মনের মিলন তার কাছে বড়। দস্তয়েভস্কির ঘরে চিররুগ্না স্ত্রী। বাইরে অর্থের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম। অ্যাপোলিনারিয়ার আবির্ভাব নতুন করে তাঁর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে তুলল, জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন তিনি।

প্রথম পরিচয় হয়েছিল সাহিত্যের আকর্ষণে। শীঘ্রই তাঁদের সম্পর্ক যৌন-আকর্ষণ নির্ভর হয়ে উঠল। অন্তত দস্তয়েভস্কির পক্ষে এ কথা সত্য। অ্যাপোলিনারিয়া কয়েকটি গল্প লিখেছে, দস্তয়েভস্কি সেগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সাহিত্য-চর্চার স্থান তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেনি। দস্তয়েভস্কি অ্যাপোলিনারিয়া অপেক্ষা বিশ বছরের বড়; তিনি বিবাহিত। সুতরাং অ্যাপোলিনারিয়ার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে তাঁর প্রথমে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রভুত্ব করবেন কী, নিজেই বন্দী হয়ে পড়লেন। সারাক্ষণ কেবল অ্যাপোলিনারিয়ার কথা মনে পড়ে। তার জন্য কী এক উন্মত্ততা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। রোজ একবার করে দেখা হওয়া চাই। সাক্ষাৎ গোপনে হলে কী হবে, শহরে সবাই এ নিয়ে বলাবলি শুরু করেছে।

লোকের সমালোচনার পাত্র হয়ে একটু সময়ের মিলনে তৃপ্তি নেই। তাঁরা

স্থির করলেন, ফ্রান্স বা ইতালীতে দু'জনে বেড়িয়ে আসবেন। যাত্রার সব ঠিক হয়ে গেছে। এমন সময় তাঁর কাগজে একটা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়লেন। কৈফিয়ৎ দিয়ে ব্যাপারটা মেটাতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অ্যাপোলিনারিয়া আগেই প্যারিস চলে গেছে। ফ্রান্সে প্রবেশ করবার পূর্বে জুয়াখেলার জন্য বিখ্যাত শহর ওয়াইসব্যাডেনে কয়েকদিন থেকে গেলেন দস্তয়েভস্কি। জুয়াখেলা তাঁর নেশা। তাছাড়া যথেষ্ট টাকা নেই সঙ্গে। কিছু টাকা জিতে নিয়ে যেতে পারলে অ্যাপোলিনারিয়ার সাহচর্য মসৃণ হবে। সত্যি কিছু টাকা তাঁর জিত হল। জুয়াড়ীদের মধ্যে প্রবাদ আছে, জুয়ায় জিতলে প্রেমের খেলায় হারতে হয়। তাঁর জীবনে যে এ কথা সত্য হবে তা তিনি কল্পনাও করেন নি। খুশি মনে প্যারিস এসে পৌছলেন।

শান্ত মনে অ্যাপোলিনারিয়া এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে। উত্তেজনা নেই, আগ্রহ নেই। সহজ কণ্ঠে বলল, তোমার অনেক দেরী হয়ে গেছে, অনেক দিন অপেক্ষা করেছি একা একা ; তুমি সামনে থাকলে হয়ত শক্তি পেতাম।

—কিসের দেরী?

—আমি আর একজনকে ভালোবেসেছি।

দস্তয়েভস্কি নীরবে সব শুনলেন। স্প্যানিশ তরুণ সালভাদোর ; প্যারিসে ডাক্তারী পড়ে। যৌবনোচ্ছল, বীর্যবান তরুণ। অ্যাপোলিনারিয়া তাকে সকল অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে ; সালভাদোরের সামনে ভেসে গিয়েছে তার সকল সংযম ও বিচারবুদ্ধি। অনিবার্য ছিল তাকে ভালোবাসা।

হোটেলে ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন দস্তয়েভস্কি। সব হারিয়ে গেল। অবচেতন মনে এমনি একটা আশঙ্কা লুকিয়ে ছিল। সত্য হল সেই আশঙ্কা।

আয়নার সামনে দাঁড়ালেই তিনি আজকাল উপলব্ধি করেন তাঁকে কোনো মেয়ে ভালোবাসতে পারে না। বিশেষ করে অ্যাপোলিনারিয়ার মতো মেয়ে। শীর্ণ চেহারা ; বেদনার উত্তাপে দেহ কুঁকড়ে শুকিয়ে গেছে। প্রাণ-প্রবাহের উচ্ছলতার চিহ্ন নেই কোথাও। মারিয়া শিক্ষকের যৌবনদীপ্তি দেখে ভুলেছে ; অ্যাপোলিনারিয়াও তাই। ব্যক্তিগত জীবনের এই অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসেও প্রসারিত হয়েছে। তাঁর অনেক উপন্যাসেই দেখা যায় মধ্যবয়সী নায়ক তরুণী নায়িকার প্রেমে আত্মহারা হয়েছে ; এবং তার ফলে যে সমস্যা এসেছে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে। বিচারবুদ্ধি দিয়ে প্রেমিক হিসাবে

নিজের অযোগ্যতা বুঝতে পারেন দস্তয়েভস্কি; কিন্তু আয়না থেকে সরে এলে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যায়, হৃদয়ানুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে, নারীর প্রেমের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে মন।

অ্যাপোলিনারিয়া হৃদয় দিয়েছিল, কিন্তু সালাভাদোর দেয়নি। দায়িত্বহীন তরুণ তাকে নিয়ে কয়েক দিন শুধু আমোদ করেছে। সালভাদোরের অভিনয় ধরা পড়ায় 'অ্যাপোলিনারিয়া প্রচণ্ড আঘাত পেলেও সে আর আগের মতো দস্তয়েভস্কির কাছে ফিরে আসতে পারল না।

দস্তয়েভস্কি অ্যাপোলিনারিয়াকে নিয়ে প্রথম এলেন ব্যাডেনব্যাডেন, জুয়াখেলার বড় কেন্দ্র। যা কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে ছিল দু'দিনেই নিঃশেষ হয়ে গেল। গায়ের শার্টটি পর্যন্ত বাজী রেখে হারতে হল। দু'জনের কাছে একটি পয়সা নেই। হোটেল থেকে কখন অপমান করে তাড়িয়ে দেবে সেই আশঙ্কায় আছেন। টাকার জন্য আকুল আবেদন পাঠিয়েছেন মাইকেলের কাছে। তুর্গেনিভ তখন ওখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার পাওয়া গেল। ১৮৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অ্যাপোলিনারিয়াকে সঙ্গে করে দক্ষিণ য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেন দস্তয়েভস্কি। কত আশা ছিল, পরিচিত সমাজের বাইরে অ্যাপোলিনারিয়াকে নিবিড় করে পাওয়া যাবে। সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। এক সঙ্গে থেকেও অ্যাপোলিনারিয়াকে পাওয়া যায় না। সে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। অনেক প্রার্থনা অনেক মিনতির পর ভিক্ষার দানের মতো সামান্য একটু তাকে পাওয়া যায়; তাতে তৃপ্তি হয় না, বরং দেহ-মনে জ্বালা ধরে যায়। সালভাদোর যে অপমান করেছে পৃথিবীর সকল পুরুষের উপর অ্যাপোলিনারিয়া তার শোধ নিচ্ছে দস্তয়েভস্কিকে যন্ত্রণা দিয়ে।

অ্যাপোলিনারিয়ার আরো কারণ ছিল। লেখক হিসাবে, প্রাজ্ঞ হিসাবে এবং বয়সের দিক থেকে দস্তয়েভস্কি তার চেয়ে বড়। যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হবার পর দেখা গেল এখানে সে ছোট নয়। লেখক ও ভক্তের সম্বন্ধ যখন আর রইল না তখন তাদের মধ্যে থাকল একমাত্র নারী-পুরুষের সম্পর্ক। অ্যাপোলিনারিয়ার এখানে শক্তি বেশি। কেবল লেখকের খ্যাতি দিয়ে এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। তা ছাড়া দস্তয়েভস্কির কতকগুলি অস্বাভাবিক যৌনরীতি ছিল। Notes from the Underworld-এর নায়ক বলছে: 'Love really consists of the right—freely given by the

beloved—to tyrannize over her.' স্বাস্থ্যবতী অ্যাপোলিনারিয়ার রুচি ছিল স্বাভাবিক। সে দস্তয়েভস্কির অস্বাভাবিকতা বরদাস্ত করতে পারত না।

তা ছাড়া সে কি পেয়েছে দস্তয়েভস্কির কাছ থেকে? সে তো তার সমগ্র জীবন নির্বিচারে দস্তয়েভস্কির হাতে তুলে দিয়েছিল। দস্তয়েভস্কি তার জন্য কিছুই ত্যাগ করেন নি। রুগ্না স্ত্রীর জন্য তিনি অর্ধেকটা হৃদয় রেখে দিয়েছেন। একতরফা দিয়ে যাবার একটা সীমা আছে। অ্যাপোলিনারিয়ার আর শুধুই দিয়ে যাবার ধৈর্য নেই। তাই সে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে।

মারিয়ার অবস্থা খুব খারাপ। দস্তয়েভস্কি একাই ফিরে এলেন রাশিয়ায়। মারিয়া মৃত্যুশয্যায়। দস্তয়েভস্কি তার সেবা করেন আর ফাঁকে ফাঁকে লেখেন তাঁর 'জুয়াড়ী' গল্প। গল্পে অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে তাঁর য়ুরোপ ভ্রমণের কাহিনী আছে। প্রায়ই লেখা বন্ধ হয়ে যায়। মারিয়া মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। চীৎকার করে অহেতুক। দেওয়ালে টাঙানো দস্তয়েভস্কির ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চেঁচাতে থাকে: 'আসামী, আসামী!' কেন এমন করছে? দস্তয়েভস্কি ভাবেন। সেই যৌবনদীপ্ত শিক্ষকের কাছ থেকে নিয়ে আসবার অপরাধেই কি তিনি আসামী? হয়ত মারিয়া স্বপ্ন দেখে, তরুণ শিক্ষকের শক্তির প্রাচুর্য থেকে সে নতুন জীবন লাভ করতে পারত, এমন করে তিলে তিলে ক্ষয় হত না।

১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে মারিয়ার মৃত্যু হল। তিন মাস পরে মৃত্যু হল মাইকেলের। মাইকেল শুধু ভাই ছিল না। ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাহিত্য-সাধনায় নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন তার কাছে। স্নেহ, ভালোবাসা, বেদনার দিকটা হঠাৎ রিক্ত হয়ে গেল। অ্যাপোলিনারিয়া এখন তাঁর জীবন পূর্ণ করতে পারে; বিয়ে করে ঘরে আনতেও আর বাধা নেই। সে তখনো ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ঘুরে বেড়াচ্ছে। দস্তয়েভস্কি ছুটে গেলেন তার কাছে। না, দস্তয়েভস্কির প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। রিক্ত হাতে দস্তয়েভস্কি শূন্য ঘরে ফিরে এলেন।

জীবনে আর একবার অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে, হয়ত বা তার ছায়ার সঙ্গে, দেখা হয়েছিল। তখন দস্তয়েভস্কির যশ আরো ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন রাত্রিতে চাকর এসে জানালো, এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে চান।

আপাদমস্তক কালো আবরণে ঢেকে এক রমণী প্রবেশ করল। বিস্মিত কণ্ঠে দস্তয়েভস্কি প্রশ্ন করলেন, কে আপনি?

রমণী ধীরে ধীরে মুখের আবরণ খুলে ফেলল। তবু চিনতে পারলেন না! আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

রমণীর চোখে বেদনার ছায়া ভেসে উঠল। এক মুহূর্ত পরে মুখ ঢেকে নীরবে রমণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গেট বন্ধ হবার শব্দ যখন কানে ভেসে এল তখন হঠাৎ মনে হল: অ্যাপোলিনারিয়া। ততক্ষণে সে নীরন্ধ্র অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

জীবন থেকে হারিয়ে গেলেও দস্তয়েভস্কির সাহিত্যে তার আসন স্থায়ী হয়ে আছে। তুনিয়া (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট), নাতাসিয়া (দি ইডিয়ট), আখমাকোভা (এ র' ইয়ুথ), ক্যাতেরিনা (দি ব্রাদার্স কারামাজোভ), পলিনা (দি গ্যামলার) প্রভৃতি নারী-চরিত্রের মধ্যে অ্যাপোলিনারিয়াকে সহজেই চেনা যায়। কখনো কখনো মারিয়া ও অ্যাপোলিনারিয়া মিলিত ভাবে একটি চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ক্যাতেরিনা তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

অ্যাপোলিনারিয়া দূরে চলে গেছে, কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কের জেরটা এখনো মেটেনি। প্যারিসে অ্যাপোলিনারিয়ার কাছে যাবার সময় এক ধূর্ত প্রকাশকের কাছ থেকে তিন হাজার রুবল ধার করতে হয়েছিল। ঋণের শর্ত ছিল যে, প্রকাশক তিন খণ্ডে দস্তয়েভস্কির রচনাবলী প্রকাশ করবে এবং ১৮৬৬ সালের ১লা নভেম্বরের মধ্যে দস্তয়েভস্কিকে একটি নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাণ্ডুলিপি না দিলে তিন হাজার রুবল প্রকাশককে ফেরৎ দিতে হবে এবং নয় বছর পর্যন্ত দস্তয়েভস্কি তাঁর রচনাবলীর উপর কোনো রয়েলটি পাবেন না। প্রকাশকের আশা ছিল দস্তয়েভস্কির মতো বিশৃঙ্খল চরিত্রের লেখক কখনো যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি দিতে পারবেন না, সুতরাং সব দিক থেকেই তার লাভ হবে।

প্রকাশকের অনুমান প্রায় সত্য হতে চলেছে। ১৮৬৬ সালের অক্টোবর মাস এসে গেল; উপন্যাস মাত্র আরম্ভ হয়েছে। উপন্যাসের খসড়া মনে মনে স্থির করে রেখেছেন দস্তয়েভস্কি। এক মাস সময়ও নেই, তার মধ্যে লিখে ওঠা অসম্ভব! এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, একজন স্টেনোগ্রাফার রাখো। তুমি বলে যাবে, সে লিখবে। তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

দ্রুত-লিখনের পদ্ধতি তখন নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক খুঁজে এক তরুণী স্টেনোগ্রাফার পাওয়া গেল। বিশ বছরের তরুণী অ্যানা। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। উপার্জনের প্রয়োজনের অপেক্ষা সে

বেশি আকৃষ্ট হল দস্তয়েভস্কির সঙ্গে কাজ করবার সুযোগের লোভে। দস্তয়েভস্কির বই সে পড়েছে; দূর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে; এবার নিকটে যাবার সুযোগ হল।

১৮৬৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর অ্যানা খাতা-পেন্সিল নিয়ে উপস্থিত হল দস্তয়েভস্কির বাড়ি। ২৯শে অক্টোবর 'দি গ্যামলারের' নোট নেওয়া শেষ হল। ছাব্বিশ দিনে অ্যানা প্রায় পঞ্চাশ হাজার শব্দ টুকে নিয়েছে। বই শেষ হল। কিন্তু ধূর্ত প্রকাশক শহর থেকে কোথায় চলে গেছে; তার কর্মচারীরা পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করবে না। তারিখটা কোনো রকমে পার করে দিতে পারলেই প্রকাশকের লাভ। নিরুপায় হয়ে দস্তয়েভস্কি পুলিশের মারফৎ পাণ্ডুলিপি জমা দিয়ে দায়মুক্ত হলেন।

কয়েক সপ্তাহ আসা-যাওয়া করে অ্যানা দস্তয়েভস্কির সংসারের সব খবরই জেনে নিয়েছে। নিদারুণ অভাবের সংসার। আজ যে বাসন-কোসন দেখে গেল, কালকেই হয়ত বাড়ি থেকে তা উধাও হয়েছে। বন্ধক দিতে হয়েছে বাজার করবার জন্য। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দস্তয়েভস্কি নিজের জীবনের গল্প বলেছেন তাকে। জীবনটা কেটে গেল একটানা দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-শোকের মধ্য দিয়ে। জীবনের শেষভাগেও একটু শান্তির আশা নেই।

অ্যানা বলল, আবার বিয়ে করেন না কেন?

—বিয়ে? কে আমাকে বিয়ে করবে?

একটু ভেবে একান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

অ্যানা কি উত্তর দেবে, দস্তয়েভস্কি তা জানেন। মারিয়া তাঁকে সহজে বিয়ে করতে চায়নি; অ্যাপোলিনারিয়া তাঁর প্রস্তাব উদ্ধত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হতে চলেছে, আরো কুশ্রী হয়েছেন দেখতে। অ্যানা হয়ত অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে।

কিন্তু আশ্চর্য! অ্যানা শান্ত স্বরে বলল, আমি রাজি আছি। আমি চিরদিন ভালোবাসব তোমাকে।

পাত্র এবং পাত্রীর আত্মীয়-স্বজন বিয়েতে আপত্তি তুলেছিল। সে-সব অগ্রাহ্য করে ওঁদের বিয়ে হল ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বিয়ের পরে তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে দস্তয়েভস্কি কিছুদিন অস্বস্তি ভোগ করেছেন। পার্টিতে কোনো সুশ্রী সুবেশ যুবকের সঙ্গে অ্যানা একটু হেসে কথা বললেই তাঁর ঈর্ষা

হত। অ্যানা এরপর থেকে সহজে কারো সঙ্গে মিশত না। অ্যাপোলিনারিয়া হলে হয়ত স্বামীর ছোট মনের অভিযোগ তুলে ঝগড়া করত। কিন্তু অ্যানার কাছে স্বামীর ইচ্ছা ও রুচিই সব চেয়ে বড়। অ্যানা কখনো নিজের ব্যক্তিত্বকে বড় করে স্বামীর আকাঙ্ক্ষা, তা অযৌক্তিক হলেও, ছোট করতে চায়নি। দস্তয়েভস্কির সঙ্গে সে দারিদ্র্যের অংশ গ্রহণ করেছে ; দারিদ্র্যের জন্য স্বামীকে উত্যক্ত করেনি। স্বামীর জুয়ার নেশা তৃপ্ত করতে সে নিজের অলঙ্কার খুলে দিয়েছে। অন্যায় জেনেও সে কলহ করেনি। দস্তয়েভস্কি একদিন অ্যানার বিষন্ন মুখ স্বপ্নে দেখলেন। এরপর তিনি স্বেচ্ছায় জুয়াখেলা ত্যাগ করেছিলেন।

অ্যানা দেহ-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিল স্বামীকে। ভালোবাসা অত্যাচার করবার অধিকার দেয়—দস্তয়েভস্কি এই তত্ত্ব কার্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন অ্যানার উপর। মারিয়া বা অ্যাপোলিনারিয়া এমন ভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। এর ফলে দস্তয়েভস্কির বহু দিনের অবদমিত কামমা তৃপ্ত হয়েছিল। তার উপর অ্যানা যখন সন্তান উপহার দিল তখন দস্তয়েভস্কির মনে আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ রইল না। হীনমন্যতার যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। অ্যানা তাঁকে নতুন জীবন দিয়েছে।

কিন্তু এ জীবন সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল কি না সে সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে Notes From the Underworld, Crime and Punishment, The Gambler, The Idiot, The Eternal Husband এবং The Possessed লেখা হয়ে গেছে। এই আট বছরের মধ্যে শেষের চার বছর অ্যানা তাঁর সঙ্গিনী ছিল। কিন্তু আর্থিক অনটন এবং জীবনের অস্থিরতা তখনো দূর হয়নি। ১৮৭৭ সাল নাগাদ গৃহে এবং জীবনে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। অবদমিত অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি তৃপ্ত হওয়ায় দস্তয়েভস্কির মৃগীরোগ আর নেই। এই মসৃণ জীবন আরম্ভ হবার পরে দস্তয়েভস্কি মাত্র একটি বই লিখেছেন—'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'। দুঃখ ও অস্থিরতাই শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা, দস্তয়েভস্কির জীবন থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ।

মারিয়া ও আপোলিনারিয়া দস্তয়েভস্কির রচনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু অ্যানাকে কোথাও দেখা যায় না। যে দস্তয়েভস্কিকে অ্যানা স্বামী, প্রেমিক, বন্ধু ও সন্তানের মতো সেবা করেছে ও ভালোবেসেছে, তাকে উপেক্ষা করবার

কারণ কি ? উপেক্ষা নয় ; অ্যানা তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তাকে আনা যায়নি।

১৮৮১ সালের ২৮শে জানুয়ারি দস্তয়েভস্কি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অ্যানা ও ছেলেমেয়েরা নিকটে থাকায় মৃত্যুর মুহূর্তে শান্তি পেয়েছিলেন দস্তয়েভস্কি। অ্যানা এসে তাঁর শিল্পিসত্তার কতটুকু ক্ষতি করেছে সে তর্কের চেয়ে মানুষ হিসাবে দস্তয়েভস্কির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রশ্ন কম বড় নয়।

দস্তয়েভস্কির জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর একটা প্রশ্ন জাগে। দুঃখ ও দারিদ্র্য শিল্প-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় না সহায়ক ? দস্তয়েভস্কি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, সারা জীবন তাঁর কেটেছে চরম দারিদ্র্যে ; প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কিছুকাল ; তারপরে সাইবেরিয়ার বন্দীশালায় ভোগ করেছেন নরক-যন্ত্রণা। সাইবেরিয়া থেকে দেশে ফেরার পর বামপন্থীরা তাঁকে আক্রমণ করেছে তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্যের অভাব দেখে ; দক্ষিণপন্থীরা নির্যাতিতের প্রতি তাঁর দরদকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। দেনার দায়ে গ্রেফ্‌তার এড়াবার জন্য দস্তয়েভস্কি একাধিকবার রাশিয়া ত্যাগ করে ঘুরেছেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে। জুয়া খেলে অর্থ উপার্জনের নেশা পেয়ে বসেছিল। তার ফলে তিনি দারিদ্র্যের জালে আরও জড়িয়ে পড়েছেন। আর স্বাস্থ্যহীনতার যন্ত্রণা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কখন মৃগীরোগের আক্রমণে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন ঠিক নেই। এই অনিশ্চিত সংজ্ঞালোপের আশঙ্কা অনুক্ষণ তাঁকে তাড়া করেছে।

তবু কী আশ্চর্য স্মৃষ্টি ! শিল্পসুষমা-মণ্ডিত জীবনের কী নিপুণ চিত্র এঁকেছেন দস্তয়েভস্কি ! বালজাক, ডিকেন্স, ফ্লোবেয়ার, জোলা, তলস্তয়, তুর্গেনিভ প্রভৃতি ছিলেন দস্তয়েভস্কির সমসাময়িক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নাম অমর হয়ে আছে। কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে দস্তয়েভস্কির জগৎ এখনো জীবন্ত। রাশিয়ার সমসাময়িক জীবন অতিক্রম করে চিরকালের সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে দস্তয়েভস্কির রচনায়।

ব্যক্তিগত জীবনে গভীর আঘাত পেয়েছিলেন বলেই হয়ত দস্তয়েভস্কি শিল্পের জগতে আশ্রয় খুঁজেছিলেন ; শিল্পই ছিল তাঁর প্রধান সান্ত্বনা। এই জন্যেই তাঁর বিস্ময়কর রচনাবলী আমরা পেয়েছি।

দস্তয়েভস্কি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়বার সময় রুটিন মাফিক জীবনের বৈচিত্র্যহীনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বৈচিত্র্যের জন্য তিনি বই পড়তেন, আর আরম্ভ করলেন লিখতে। প্রথমে অনুবাদ। নানা দেশের কবিদের রচনার তর্জমা। তারপরে বালজাকের Eugénie Grandet অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি পেলেন। চাকরি ভালো লাগল না। ইস্তফা দিয়ে লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রথম উপন্যাস 'পুওর ফোক' তিনি লিখেছেন বার্লিজল খেয়ে। কদাচিৎ রুটি জুটেছে। এমন কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বই শেষ হল; তবু তাঁর মনে শান্তি নেই। তাঁর নিজের কাছেই ভালো লাগছে না। প্রকাশক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দৈবক্রমে পাণ্ডুলিপি পড়ল নেক্রাসভের হাতে। তিনি রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ সমালোচক বেলিন্স্কি বললেন, রাশিয়ান সাহিত্যে আর এক গগোলের আবির্ভাব হল। দস্তয়েভস্কির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল সে সম্বন্ধেও তিনি সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন।

'পুওর ফোকের' কাহিনীর সঙ্গে গগোলের 'দি ওভারকোট'-এর অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ দু'টি কাহিনীর প্রকৃতিগত পার্থক্যও কম নয়। দস্তয়েভস্কি তাঁর নায়ক দেভুশ্‌কিনের মন যে ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন গগোল তা করেন নি। নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বারা পাত্র-পাত্রীর মনোজগৎকে উদ্ঘাটন করাই দস্তয়েভস্কির বৈশিষ্ট্য। কাহিনী-বিন্যাসের নবত্বে তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের সগোত্র; রাশিয়ান সাহিত্যের উপন্যাসের ধারাটি 'পুওর ফোকের' মধ্যে বাঁক নিয়েছে। পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের ধারা অনুসরণ না করে তিনি নিজেই নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন।

'পুওর ফোক' পাঠকমহলে সমাদৃত হল। প্রথম উপন্যাস এমন সমাদর লাভ করা গৌরবের কথা। 'পুওর ফোক' প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সালে। ঐ বছরেরই শেষভাগে তাঁর বড় গল্প 'দি ডাবল' বের হল। এই কাহিনীর নায়কও দেভুশ্‌কিনের মতো সরকারী দপ্তরের সাধারণ কেরানী। তার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন দস্তয়েভস্কি। সে বিনয়ী, তার স্বভাব নম্র; তথাপি তার মধ্যে ক্ষমতালিপ্সু ও প্রতিপত্তিলোভী আর এক ব্যক্তিত্ব জেগে আছে। দুই ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বই কাহিনীর বিষয়বস্তু। 'দি ডাবল' বেলিন্স্কির ভালো লাগেনি। পাঠকরাও গ্রহণ করেনি এ বই। কিন্তু

দস্তয়েভস্কির নিজের বিশ্বাস ছিল এ বইয়ের বিশেষ মূল্য আছে। পরবর্তী উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিচার করলে 'দি ডাবল'-এর মূল্য স্বীকার করতে হবে। মানুষের দ্বৈত জীবনের সংঘাত বিশ্লেষণ করাতেই দস্তয়েভস্কির কৃতিত্ব। 'দি ডাবল'-এ তার সূত্রপাত দেখতে পাই।

পরবর্তী তিন বৎসরে দস্তয়েভস্কি কতকগুলি ছোট-বড় গল্প লিখেছেন। একটি উপন্যাসও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়ায় সেটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল। গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে দস্তয়েভস্কির সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্ব শেষ হল। নাটকীয়তা, অত্যাচারিত ও অপমানিতের প্রতি গভীর সহানুভূতি, মনোবিশ্লেষণ,—দস্তয়েভস্কির রচনার এই সব বৈশিষ্ট্য-গুলি প্রথম পর্বের লেখার মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বন্দী হবার প্রায় দশ বছর পরে দস্তয়েভস্কির লেখক-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল। 'দি ফ্রেণ্ড অব দি ফ্যামিলি' এবং 'আঙ্কল্স্ ড্রিম' নিয়ে তিনি এতদিন পরে আবার সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করলেন। 'আঙ্কল্স্ ড্রিম' রাশিয়ান সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প।

সাইবেরিয়া থেকে ফিরে ১৮৬১ সালে দস্তয়েভস্কি 'সময়' নাম দিয়ে একটি সাহিত্য-পত্র বের করলেন। এ কাগজের প্রধান আকর্ষণ হল দস্তয়েভস্কির রচনা। প্রথম উপন্যাস 'দি হাউস অব দি ডেড্' স্ত্রীকে খুন করবার অপরাধে দশ বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত এক ব্যক্তির স্মৃতিকথা। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দস্তয়েভস্কি সাইবেরিয়ার বন্দী-শিবিরের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। অত্যাচার ও নির্মম ব্যবহারে বন্দীরা তিক্ত হয়ে উঠলেও তাদের মানবতাবোধ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা প্রকাশ করে দস্তয়েভস্কি কাহিনী শেষ করেছেন।

'সময়' পত্রিকায় দস্তয়েভস্কির পরবর্তী উপন্যাস 'দি ইন্সাল্টেড্ অ্যাণ্ড দি ইন্জিউর্ড্' ভানিয়া, নাতাশা ও আলিওশার ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। গোয়েন্দা কাহিনীর মতো এই উপন্যাস পাঠকদের শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখে। তথাপি এই উপন্যাস পাঠকমহলে সমাদৃত হয়নি। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের' প্রস্তুতি হিসাবে এ বইটির যথেষ্ট মূল্য আছে।

দস্তয়েভস্কির পরবর্তী উপন্যাস 'নোট্স্ ফ্রম দি আণ্ডার ওয়ার্লড্' প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। গল্প অপেক্ষা লেখকের জীবন-দর্শন এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। কাহিনীর প্রথমেই নায়ক বলছে: 'I am a sick man. I am

a malicious man.' গল্পটি সরল। জীবনবিদ্বেষী নায়কের পরিচয় হল সহজলভ্যা রমণী লিজার সঙ্গে। নায়ক তাকে নির্মমভাবে যন্ত্রণা দেয়। তথাপি লিজার মনে নায়কের জন্য সহানুভূতি জেগে উঠল। সে ভাবল, ভালোবাসা দিয়ে ওর মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনবে। নায়ক ভালোবাসাকে অবলম্বন করে বেঁচে উঠতে চাইল না ; প্রেমের চেয়ে আত্মপীড়নে তার বেশি আনন্দ।

নায়ক এক জায়গায় নিজের সম্বন্ধে বলছে : 'I felt that in me raged opposing elements.' এই opposing elements-এর আশ্চর্য নিপুণ বিশ্লেষণই আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান সম্পদ। 'দি ডাবল্‌সে' যে ধরনের চরিত্র নিয়ে দস্তয়েভস্কি পরীক্ষা শুরু করেছিলেন এখানে তার পরিণতি ঘটেছে।

ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কির সকল বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ প্রথম দেখা গেল 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে (১৮৬৬)'। মনোবিশ্লেষণধর্মী এরূপ অপরাধমূলক কাহিনী বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। রাসকলনিকভ সেণ্ট পীটার্সবার্গের একজন দরিদ্র ছাত্র। সে আদর্শবাদী ও উদারমনা যুবক। কিন্তু উপবাসী থেকে থেকে তার দেহ ভেঙে পড়ল এবং আদর্শবাদ ও ঔদার্য ধীরে ধীরে দূর হয়ে গেল। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে এ সময় খবর এল বোন ডুনিয়া তার একান্ত ঘৃণার পাত্র লুজিনকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে। লুজিন ধনী। তাকে বিয়ে করলে মা ও ভাই দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ডুনিয়া লুজিনকে ভালোবেসে বিয়ে করছে না। এই সংবাদ শুনে রাসকলনিকভের মানসিক ভারসাম্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দারিদ্র্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য সঙ্কল্প করল সে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? মনে পড়ল সেই বুড়ীর কথা, যে জিনিস বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেয় ; বিশেষ করে ছাত্ররাই তার শিকার। এই বুড়ীকে হত্যা করে তার টাকা আত্মসাৎ করলে সংসারে কারো কোনো ক্ষতি হবে না ; অথচ তার লাভ হবে। রাসকলনিকভের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে ; লম্পট লুজিনের হাত থেকে বাঁচবে তার বোন ডুনিয়া।

অনেক ভেবে-চিন্তে রাসকলনিকভ তার ফন্দি আঁটল। তার মনে হল নিখুঁত সেই ফন্দি, অপরাধ ধরা পড়বার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না। বৃদ্ধাকে হত্যা করে টাকার সন্ধান যেই করতে যাবে অমনি বুড়ীর বোন এসে উপস্থিত। একটা খুন ঢাকবার জন্য আর একটা খুনও করতে হল। হাতের কাছে যা-কিছু পেল তাই নিয়ে পালিয়ে আসতে হল।

এরপর থেকে শুরু হল রাসকলনিকভের নতুন জীবন। সর্বদাই ভয় বুঝি তার গোপন অপরাধ ধরা পড়ে গেল। যেখানে সন্দেহের কারণ নেই সেখানেও তার সন্দেহ। পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর পেত্রোভিচের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার বিবরণ গোয়েন্দা কাহিনীর মতো ঔৎসুক্যপূর্ণ।

সোনিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। দেহ বিক্রয় করে সে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। তবু তার হৃদয় কলঙ্কিত নয়। সোনিয়ার অকৃত্রিম ভালোবাসা রাসকলনিকভকে দুর্বল করল। সোনিয়াকে সে জানালো তার অপরাধের কথা। এই স্বীকৃতি আর একজন শুনতে পেল। তখন রাসকলনিকভের আত্মসমর্পণ না করে আর উপায় রইল না। বিচারে তাকে আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হল। সোনিয়া সাইবেরিয়ায় চলে গেল স্বেচ্ছায়। জেলের নিকটে এক গ্রামে সে বাস করত। জেলের কয়েদীরা তাকে জানত করুণার প্রতিমূর্তি হিসাবে। সোনিয়ার গভীর প্রেম রাসকলনিকভকে সকল দুঃখ সইবার শক্তি দিল। দুঃখের আগুনে পুড়ে সে শুচিশুদ্ধ নতুন মানুষ হয়ে উঠল।

অনুতাপ ও দুঃখভোগের দ্বারা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়—এই খ্রীষ্টান আদর্শ 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' জয়যুক্ত হয়েছে। যত অধঃপতনই হোক না কেন মানুষের আত্মার মৃত্যু হয় না। লাজারাসের মতো তার পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে। দস্তয়েভস্কির কাহিনী থেকে উপলব্ধি হবে যে, ব্যক্তির জীবন এবং সামাজিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নীতির বিচার চলে না। রাসকলনিকভ অপরাধী হলেও তার পরিস্থিতি জানবার পর পাঠকের মন তার প্রতি বিরূপ হতে পারে না।

'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের' পরে ছোট উপন্যাস 'গ্যামলার' (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। এটি আত্মজীবনীমূলক কাহিনী। দস্তয়েভস্কি তাঁর প্রণয়িনী অ্যাপোলিনারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালী ঘুরে বেড়াতেন। টাকার অভাব। দস্তয়েভস্কির ছিল জুয়া খেলার দুর্নিবার নেশা। অনটনের মধ্যে পড়ে এই নেশা আরো বৃদ্ধি পেল। হঠাৎ বড়লোক হবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে শেষ কপর্দকও হারাতেন। তার উপর অ্যাপোলিনারিয়া ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে; তাকে ধরে রাখতে পারছেন না। নিজের জীবনের এই অভিজ্ঞতা দস্তয়েভস্কি 'জুয়াড়ীর' কাহিনীতে বলেছেন।

'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' সমাজের পটভূমিকায় একজন অপরাধীর

চরিত্রের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। 'দি ইডিয়ট' (১৮৬৮) উপন্যাসে দস্তয়েভস্কি দেখিয়েছেন, যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে সমাজ তাকে নির্বোধ বলে গণ্য করে। নায়ক প্রিন্স মিশকিন এমনি এক ভদ্রলোক। সকলের সঙ্গে তাঁর সরল ভদ্র ব্যবহার; সকল ব্যাপারেই শিশুর মতো আন্তরিকতা। সেণ্ট পীটার্সবার্গের সমাজে তাঁকে নিয়ে সবাই হাসি-ঠাট্টা করে। কিন্তু দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের তরুণী প্রিন্স মিশকিনকে ভালোবেসেছে। অ্যাগ্লেইয়া ধর্মভীরু চরিত্রবতী মেয়ে। মিশকিন তাকে বিয়ে করবে না। কারণ নিজেকে সে তার যোগ্য মনে করে না। নাস্তাসিয়ার চরিত্র নিন্দামুক্ত নয়। তাকেই বিয়ে করবে বলে স্থির করল। তাহলে একটি পতিত আত্মা উদ্ধার করে শহীদ হতে পারবে। কিন্তু নাস্তাসিয়া যখন প্রিন্স মিশকিনের এই উদ্দেশ্য জানতে পারল তখন সে তার বর্বর চরিত্র পানিপ্রার্থী রোগোজিনের সঙ্গে চলে গেল। রোগোজিন যখন বুঝতে পারল নাস্তাসিয়া মনে মনে প্রিন্স মিশকিনকেই ভালোবাসে তখন সে ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে নাস্তাসিয়াকে হত্যা করল। নাস্তাসিয়ার এই শোচনীয় মৃত্যুর আঘাত প্রিন্স মিশকিনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। এতদিন লোকে তাকে ইডিয়ট বললেও সত্যি সে ইডিয়ট ছিল না; এবার সে প্রকৃতই ইডিয়ট হল। পাগলা গারদে যেতে হল তাকে।

শিল্পকলার দিক থেকে 'দি ইডিয়টের' অনেক ক্রটি আছে। দস্তয়েভস্কি নিজেও তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কাহিনীর আকর্ষণ পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে, আঙ্গিকের ক্রটি বাধা সৃষ্টি করে না। আর 'ইডিয়টের' সব চেয়ে বড় সম্পদ কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। প্রিন্স মিশকিনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে এবং এই একটি চরিত্র পাঠকের মন আচ্ছন্ন করে রাখে। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টে' প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা আছে; কিন্তু প্রিন্স মিশকিনের শোচনীয় পরিণতির মধ্যে এবং অন্যান্য চরিত্রের ট্র্যাজেডির মধ্যে আমরা পাপের পরাজয় দেখতে পাই না। বাস্তব সংসারের সঙ্গে আত্মিক শক্তির বিরোধের প্রতীক প্রিন্স মিশকিন। তার শোচনীয় পরিণতি পাঠককে মিশকিনের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করে।

'দি ইডিয়টের' মতো গুরুগম্ভীর উপন্যাসের পর দস্তয়েভস্কি লিখলেন একটি লঘু উপন্যাস—'দি ইটার্নাল হাস্‌ব্যাণ্ড' (১৮৭০)। এই উপন্যাসের নায়িকাকে বলা হয় মাদাম বোভারির রাশিয়ান সংস্করণ। প্যাভেল প্যাভ্‌লোভিচ্‌ স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার চিঠি থেকে জানতে পারল সে স্বামীকে ঠকিয়ে অনেক পুরুষকে

দাক্ষিণ্য বিতরণ করেছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই কাহিনীতে দস্তয়েভস্কির আত্মজীবনীর ইঙ্গিত আছে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী মনে মনে তরুণ শিক্ষককে ভালোবাসত। প্রতারিত স্বামীর বেদনা এবং বঞ্চনার কৌতুক মিশেছে এই কাহিনীর মধ্যে।

'দি পসেসড্' বা 'দি ডেভিলস্' (১৮৭১) লিখে দস্তয়েভস্কি তুর্গেনিভের 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স'-এর উত্তর দিয়েছেন। নিহিলিজমের বিরুদ্ধে আক্রমণই দস্তয়েভস্কির লক্ষ্য।

উপন্যাসের নায়ক নিকোলাই স্ট্যাভ্রোগিন অভিজাত বংশের সুশ্রী তরুণ সকল বিষয়েই তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ, কিন্তু হৃদয়বত্তার একান্ত অভাব। নিকোলাইর বিধবা মা ভার্‌ভারা পেত্রোভনা এক বিরাট জমিদারীর মালিক। মহকুমা শহরের নিকটেই তাঁর বাড়ি।

কাহিনী যখন শুরু হয় তখন নিকোলাই সেনাবিভাগ ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে এসেছে। কতকগুলি অশোভন ব্যবহারের জন্য তার দুর্নাম রটেছিল। এর মধ্যে একটি প্রধান হল জড়বুদ্ধি মারিয়া তিমোফিয়েভ্‌নাকে বিয়ে করা। যাই হোক, বাড়ি ফিরে নিকোলাই এবং স্থানীয় আরো কয়েকজন মিলে নিহিলিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলল। নিকোলাইর প্রধান পরামর্শদাতা ভেরখোভেন্‌স্কির বিবেকের বালাই ছিল না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে যে কোনো কাজ করতে পারে। ভেরখোভেনস্কির প্ররোচনায় ঐ অঞ্চলে নিহিলিস্টরা অরাজকতার সৃষ্টি করল। আগুন লাগানো, লুঠতরাজ, হত্যা কিছুই বাকী রইল না। নিকোলাইয়ের স্ত্রী তিমোফিয়েভনা এবং তার ভাইয়ের হত্যা গোপন করবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ওদের বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিল। বিপ্লবীদের এই কার্যকলাপ নিকোলাইর অজানা ছিল না।

নিকোলাই এবার মুক্ত। সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী তরুণী লিজাভেতা দ্রজদভ্‌কে এখন বিয়ে করতে বাধা নেই। লিজাভেতা তার প্রেমে উন্মত্ত। লিজাভেতা নিকোলাইকে পরম বিশ্বাসে আত্মদান করল। নিকোলাই পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করে বলল, সে ভালোবাসে না, কোনোদিনই ভালোবাসতে পারবে না তাকে। নিকোলাই এত ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে যে, লিজাভেতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা দেখে জনতা নির্মম ভাবে প্রহার করে লিজাভেতাকে হত্যা করল। পালিয়ে রক্ষা পেল নিকোলাই।

দস্তয়েভস্কি নিহিলিস্টদের কার্যকলাপ সমর্থন করতে পারেন নি। তাদের

উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তিনি সমালোচনা করেছেন। সমসাময়িক রাশিয়ার জটিল পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে কাহিনীর জটিলতার মধ্যে। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 'দি পসেসড্'-এ কতকগুলি আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। বিপর্যয় অতিক্রম করে রাশিয়া যে একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে সে সম্বন্ধে দস্তয়েভস্কি বারবার আস্থা প্রকাশ করেছেন।

দস্তয়েভস্কির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভের' পূর্বে প্রকাশিত হয় 'এ র' ইয়ুথ'। A Raw Youth (1875) দস্তয়েভস্কির প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসগুলির অন্তর্গত নয়। অবৈধ সন্তানের সমাজ ও পিতার সঙ্গে সম্পর্কের সমস্যাই এই কাহিনীর বিষয়বস্তু। গল্পের আকর্ষণ বিশেষ না থাকলেও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের জন্য এই উপন্যাস স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বৈত জীবনের মানসিক দ্বন্দ্বের নিপুণ বিশ্লেষণের মধ্যে দস্তয়েভস্কির কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।

এর পরে আমরা দস্তয়েভস্কির কাছ থেকে পেলাম 'লেখকের দিনলিপি' বা The Diary of a Writer. ১৮৭৬-'৭৭ সালের 'নাগরিক' পত্রিকায় সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে দস্তয়েভস্কি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতেন। কতকগুলি রেখাচিত্র-জাতীয় রচনাও ছিল। এদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ না থাকলেও দস্তয়েভস্কির চিন্তাধারার পরিচয় পাবার জন্য প্রয়োজন আছে।

'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' দস্তয়েভস্কির মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনা অনুসারে তিনি এই উপন্যাস সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তিনি শুধু প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। অনেক বৎসর যাবৎ তিনি 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসের' মতো পাঁচখণ্ডের একটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন। ভেবেছিলেন উপন্যাসের নাম রাখবেন The Life of a Great Sinner. কয়েক পুরুষের কাহিনী লেখা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা সংশোধন করে দু'খণ্ডে কারামাজোভ পরিবারের কাহিনী বলা স্থির হয়। 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' পরিকল্পিত দু'খণ্ডের প্রথম খণ্ড মাত্র। তথাপি 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' দস্তয়েভস্কির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পাপ-পুণ্যের যে নির্মম সংগ্রাম মানুষের মনে নিরন্তর চলছে তার এমন নিপুণ মর্মস্পর্শী চিত্র পৃথিবীর উপন্যাস সাহিত্যে কমই পাওয়া যায়। শিল্পকলার উৎকর্ষে, চিন্তার ঐশ্বর্যে এবং কাহিনীর আকর্ষণে এই উপন্যাস দস্তয়েভস্কির শ্রেষ্ঠ রচনা।

বৃদ্ধ ফয়দোর কারামাজোভ কৃপণ, কুটিলস্বভাব এবং গভীররূপে ইন্দ্রিয়াসক্ত। তার তিন ছেলে—দ্‌মিত্রি বা মিতিয়া ; আইভান বা ভানিয়া এবং অ্যালেক্সি বা আলোয়শা। বড় ছেলে মিতিয়া সৈনিক, বাবার মতো ইন্দ্রিয়াসক্ত ; কিন্তু তার মধ্যে বৃদ্ধ কারামাজোভের মতো লুকোচুরি নেই। চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা গোপন করবার জন্য সে একটুও ব্যস্ত নয়। সবকিছু সে খোলাখুলি বলে। ইচ্ছাপূরণের পথে কোনো বাধা সে সইতে পারে না। বাধা পেলে ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ভাই ভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে ; নিহিলিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল ; সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করতে ভালোবাসে। ভানিয়া ধর্ম মানে না। তৃতীয় ভাই আলোয়শা ধর্মাসক্ত। সকলের প্রতি তার ভালোবাসা ও সহানুভূতি ; তার মধুর স্বভাব সকলকেই আকৃষ্ট করে।

এই তিন ভাই রাশিয়ার তিন অবস্থার প্রতীক। বড় ভাই বুদ্ধি ও সংস্কৃতি বর্জিত প্রাচীন রাশিয়ার ; দ্বিতীয় ভাই উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসী রাশিয়ার এবং তৃতীয় ভাই মানবতাবোধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রাশিয়ার প্রতিনিধি।

বৃদ্ধ কারামাজোভের একটি অবৈধ পুত্রও আছে। ছেলেকে জন্ম দিয়েই ওর মা'র মৃত্যু হয়। এখন এই অবৈধ পুত্র স্মেরদিয়াকভ কারামাজোভের বাড়ি চাকরের কাজ করে। সে মাঝে মাঝে মৃগী রোগের আক্রমণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় ; তার আচরণে বোঝা যায় সে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগছে।

বড় ছেলে তার প্রণয়িনী গ্রুশেঙ্কার সঙ্গে স্ফূর্তি করে টাকা উড়িয়েছে প্রচুর। সে টাকা মিতিয়ার নয়। ক্যাতেরিনাকে বিয়ে করবে বলে সে কথা দিয়েছে। ক্যাতেরিনা ধনী কর্ণেলের মেয়ে। তার টাকা ভেঙেছে মিতিয়া। সে টাকা এখন ফিরিয়ে দিতে হবে। তাই বাবার কাছে এসেছে টাকা চাইতে। বৃদ্ধ কারামাজোভের চোখ পড়েছে গ্রুশেঙ্কার উপর। ছেলের সৌভাগ্যে সে ঈর্ষান্বিত। তার উপর সে কৃপণ। সুতরাং টাকা দিতে রাজী হল না। পিতা-পুত্রে কলহ বাধল। পিতাকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এমন কথা প্রকাশ্যে বলতেও মিতিয়া দ্বিধা বোধ করল না।

নানা কারণে মধ্যম ভাই ভানিয়াও বাবার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সে মাঝে মাঝে বলত, বাবার মৃত্যু হলে সকলেরই মঙ্গল। এই কথা স্মেরদিয়াকভ শুনেছে কয়েকবার। তার অসুস্থ মনে এর শোচনীয় প্রতিক্রিয়া হল। বৃদ্ধ

কারামাজোভকে হত্যা করে সে নিজের গলায় ফাঁসি পরালো। আত্মহত্যার পূর্বে বৃদ্ধের যত অর্থ সে অপহরণ করেছিল তা দিয়ে গেল ভানিয়াকে।

বৃদ্ধকে হত্যার অপরাধে দায়ী করা হল বড় ভাই মিতিয়াকে। পিতা-পুত্রের কলহের প্রমাণ পাওয়া গেল যথেষ্ট। ছোট ভাই আলোয়শা সাইবেরিয়ায় যাবে নির্বাসিত মিতিয়ার সঙ্গে। এই সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে তার গুরু ফাদার জোসিমার উপদেশ কার্যে পরিণত করবার জন্য। সেই উপদেশ হল : 'Be no man's judge. Humble affection is a terrible power which effects more than violence ; only active love can secure faith for us.'

দস্তয়েভস্কির ইঙ্গিত থেকে মনে হয় তাঁর মতে প্রকৃত হত্যাকারী ভানিয়া। ভানিয়ার মনের কুটিল কামনা দুর্বলচিত্ত স্মেরদিয়াকভকে প্রভাবান্বিত করে হত্যার প্রেরণা দিয়েছে। সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবীরা তাদের মনের গোপন অনুচিত অভিলাষ দিয়ে জীবন এমনিভাবে কলুষিত করে তোলে।

'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' সমাপ্ত করবার পর দস্তয়েভস্কি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আরো অন্তত বিশ বছর বাঁচবেন এবং আরো অনেক বই লিখবেন। সেই অলিখিত উপন্যাসগুলি গুণের দিক থেকে কি রকম হত কে জানে! লেখক হিসাবে দস্তয়েভস্কি ভাগ্যবান এইজন্য যে, প্রতিভার নিম্নগামিতার গ্লানি তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। শেষ উপন্যাস তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

শেক্সপীয়রের মতো দস্তয়েভস্কির রচনা সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম। সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, পাপ পুণ্য ধর্ম নীতি প্রভৃতি জীবনের মৌলিক সমস্যার আলোচনা উচ্চশ্রেণীর পাঠকদের আকৃষ্ট করে; নাটকীয় ঘটনা ভাবাবেগ এবং নানাবিধ পাপানুষ্ঠান সাধারর্ণ পাঠকের মনোরঞ্জন করে। শিল্পকলার দিক থেকে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের সব চেয়ে বড় গুণ পাঠককে শেষ পর্যন্ত আকৃষ্ট করে রাখবার ক্ষমতা। কিছুদূর পড়বার পর পাঠকের মনে সমাপ্তি সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগে তাই তাকে টেনে নিয়ে যায়।

দস্তয়েভস্কির প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই পাপ ও পাপীর প্রাধান্য। পাপী ও লাঞ্ছিতের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি। দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে পাপীর আত্মা শুদ্ধ হয়, এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল। তিনি 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'

এবং অন্যত্র দেখিয়েছেন যে, জীবনের সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করা যায় না; প্রেমের পথে যে সমাধান হয় তাই শ্রেষ্ঠ সমাধান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে য়ুরোপে দস্তয়েভস্কির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। এর প্রধান কারণ দু'টি। প্রথমত যুদ্ধের ধ্বংসলীলার অভিজ্ঞতা থেকে য়ুরোপবাসীরা দস্তয়েভস্কির প্রেম ও আত্মশুদ্ধির জন্য দুঃখভোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। দ্বিতীয় কারণ, দস্তয়েভস্কিই প্রথম পাঠকের দৃষ্টি তাঁর পাত্র-পাত্রীর মনের অন্ধকার কোণে নিয়ে গেছেন। তাই তিনি মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস রচনায় অগ্রদূত। ফ্রয়েডের আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি যে নিপুণ মনোবিশ্লেষণ দ্বারা পাত্র-পাত্রীদের হৃদয় উদ্ঘাটন করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। দস্তয়েভস্কি মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যাগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে বিচার করেছেন, তাদের সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন; তাই তিনি আজও জনপ্রিয়।

স্টেফান ৎস্‌ভাইক

১৮৮১—১৯৪২

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবন ৎস্‌ভাইকের (Stefan Zweig) উপরে মোহ বিস্তার করত। মহৎ প্রতিভার আকর্ষণ থেকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্ত হতে পারেন নি। এই আকর্ষণ ৎস্‌ভাইকের পক্ষে অবিমিশ্র মঙ্গলের কারণ হয়নি। ৎস্‌ভাইকের রচনাবলী আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, চিরজীবন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রতিভার ছায়ায় বাস করবার ফলে তাঁর নিজের মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গল্প বলবার যে অসামান্য দক্ষতা ৎস্‌ভাইকের ছিল, তিনি তার সদ্ব্যবহার করেন নি। সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ এবং আবিষ্কারকদের জীবনের গল্প তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাই বার বার তিনি সৃষ্টির পথ ত্যাগ করে এঁদের প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্য কলম ধরেছেন। দীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনায় ৎস্‌ভাইক পূর্ণ-দৈর্ঘ্য উপন্যাস লিখেছেন মাত্র একটি, কিন্তু বড় জীবনী রচনা করেছেন অনেকগুলি। রোমা রোলাঁও জীবনী লিখেছেন; মহৎ জীবনের সন্ধানে তিনি ভারতবর্ষ পর্যন্ত এসেছেন; কিন্তু তাই বলে মৌলিক সৃষ্টি রোলাঁ উপেক্ষা করেন নি। জীবনীকার হিসাবে রোলাঁর ভূমিকা গৌণ; কিন্তু ৎস্‌ভাইক মুখ্যত চরিতকার। তিনি য়ুরোপের প্রতিভাবানদের ভক্ত; য়ুরোপীয় প্রতিভার পূজা ছিল তাঁর কাছে 'প্যাশান'। ৎস্‌ভাইকের রচনা এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

তাঁর প্রথম জীবনের পরিবেশ আলোচনা করলেই এর কারণটা পাওয়া যাবে। ১৮৮১ সনের ২৮শে নভেম্বর ভিয়েনা নগরীতে ৎস্‌ভাইক জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনা ছিল তখন য়ুরোপে আন্তর্জাতিক শহর। য়ুরোপের নানা দেশ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ভ্রমণকারী ও ছাত্র-ছাত্রী এসে ভিড় করত ভিয়েনায়। এখানে এলে তারা ভুলে যেত—কে ইংরেজ, কে ফরাসী, কে জার্মান। আমরা সবাই য়ুরোপীয়, আমাদের মধ্যে আছে আত্মার যোগাযোগ, ভাষা ও আচারের প্রভেদটা তুচ্ছ। ভিয়েনার সমাজে

সকলের মনে এমনি একটি ভাব জেগে উঠত। অনেক বছর পরে ৎস্‌ভাইক তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, এই ঐক্যবোধের মূল কারণ ছিল ভিয়েনার সঙ্গীত। য়ুরোপীয় বড় বড় শিল্পীরা আসতেন ভিয়েনায়। তাঁদের সঙ্গীত জাতিগত ছোটখাটো পার্থক্য দূর করে ঐক্যানুভূতি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করত।

ৎস্‌ভাইক সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। তাঁর বাবা ছিলেন কাপড়ের কলের মালিক। কোনো অভাববোধ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্কুলে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন ও সাহিত্য-চর্চা নিয়ে নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপন করবার সুযোগ পেয়েছেন। সহপাঠী হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের তরুণদের। তাদের কাছ থেকে শুনেছেন য়ুরোপের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাহিনী। কৌতূহল জেগেছে; বই পড়ে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হবার পর য়ুরোপের সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, য়ুরোপ ও তার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অষ্ট্রিয়া তাঁর জন্মভূমি—সে কথা ভুলে গেলেন, য়ুরোপ হল মাতৃভূমি। ৎস্‌ভাইকের য়ুরোপ এক ও অখণ্ড; ভাষার ব্যবধান ও আঞ্চলিক সীমানাচিহ্ন তাঁর য়ুরোপকে খণ্ডিত করতে পারেনি।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই ৎস্‌ভাইকের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। কোন্ কাগজে নতুন লেখা বা ছবি বেরল, কোথায় কার বক্তৃতা আছে—এ সব সংবাদ ছিল তাঁর নখাগ্রে। শুধু সংবাদ রাখতেন না, পড়তেনও। য়ুরোপের সকল প্রধান কবিদের কাব্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ভিয়েনার একটি অখ্যাত সাহিত্য-পত্রে পল ভ্যালেরির প্রথম পর্বের যে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। বহু বৎসর পরে ৎস্‌ভাইক তাঁকে সে সংবাদ দিয়ে বিস্মিত করেছিলেন।

গ্যেটে বলতেন, জনসাধারণের হাতে শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁদের যে রচনা তুলে দেন তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হলে আরও পেছনে খুঁজতে হবে। দেখতে হবে খসড়া পর্যায় থেকে কোন্ পথ অতিক্রম করে রচনা পূর্ণতা লাভ করেছে। ৎস্‌ভাইক এ কথা বিশ্বাস করতেন। তাই লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা ছিল তাঁর বাতিক। ৎস্‌ভাইকের সংগ্রহশালায় রোলাঁ, রিলকে, ক্লদেল, গোর্কি, ফ্রয়েড প্রভৃতি লেখকদের বিখ্যাত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই ৎস্‌ভাইক লিখতে আরম্ভ করেন। উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রুপোলী সুতো' বের হয়। আত্মপ্রকাশের

ব্যাকুলতা ছাড়া এই কবিতাগুলির মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। ৎস্‌ভাইক নিজেও এদের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। নিজের ক্ষমতার উপর দীর্ঘকাল তাঁর সন্দেহ ছিল। তাই তাঁর অনেক রচনা Stephen Branch ছদ্মনামে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জার্মান ভাষায় ৎস্‌ভাইকের অর্থ 'শাখা'।

নিজের ক্ষমতায় সন্দিহান, অথচ অন্তরে আছে সৃষ্টির তাগিদ; তাই ৎস্‌ভাইক প্রথম অনুবাদের সহজ পথ ধরলেন। ক্রমে এই অনুবাদ তাঁর নেশা হয়ে দাঁড়ালো। বিভিন্ন সাহিত্যের যে সব রচনায় প্রতিভার স্বাক্ষর পড়েছে তাদের অনুবাদ করে জার্মানভাষীদের হাতে তুলে দেওয়া তিনি কর্তব্য বলে মনে করলেন। অনুবাদ মনের দিগন্ত প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অখণ্ড য়ুরোপীয় সংস্কৃতির যে আদর্শ ৎস্‌ভাইকের এত প্রিয়, অনুবাদ তার সহায়ক। সুতরাং অনুবাদের মধ্যে ডুবে গেলেন; প্রতি বৎসর একটি করে অনুবাদের বই বের হতে লাগল। শুধু যে নিজে আরম্ভ করলেন তাই নয়, অন্য লেখকদেরও অনুবাদ করতে উৎসাহ দিতেন। বেলজিয়ামের কবি ভারহারেনের কাব্যের অনুবাদ তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি; বোদ্‌লেয়ার, ভারলেন, উইলিয়াম ব্লেক, কীট্‌স, বেন জনসন প্রভৃতি বহু লেখকের রচনা ৎস্‌ভাইক অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগ্রন্থগুলি পৃথিবীর ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক। সুতরাং তাদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য তাঁর যত্নের ত্রুটি ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জার্মানী কিংবা অন্য দেশের নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনো প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলে পাঠক-মহলে সে কথা ৎস্‌ভাইক বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে প্রচার করতেন। অনেক লেখকের পাণ্ডুলিপি তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আনন্দের সঙ্গে। এতটা উৎসাহের ফলে কখনও কখনও বিপদেও পড়তে হয়েছে; কিন্তু তার জন্য তিনি ভয় পাননি। সুযোগ এলেই নবীন লেখকদের প্রতিভাদীপ্ত রচনা পাঠকদের নিকট সুপারিশ করেছেন।

অনুবাদের সাহায্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন ভিয়েনার যুদ্ধদপ্তরে কাজ করেছিলেন ৎস্‌ভাইক। যুদ্ধের নির্মম মূর্তি প্রত্যক্ষ করবার পর তিনি যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে পড়লেন। য়ুরোপীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখে এসেছেন এতদিন; যুদ্ধ সেই ঐক্যের আদর্শ মিথ্যা প্রমাণ করে দিল। ৎস্‌ভাইক দেখলেন, তাঁর অখণ্ড য়ুরোপ আত্মকলহে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। আদর্শ-ভঙ্গের বেদনা তাঁকে দিল

মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণা। যুদ্ধ তাঁর মনে যে সব চিন্তা জাগিয়েছিল তাদের তিনি প্রকাশ করলেন Jeremiah নাটকে। ব্যক্তি অথবা জাতি শত্রুর হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেও তাদের আত্মা থাকে অপরাজিত। যত বড় শক্তিমানই হোক না কেন, পরাজিতের আত্মাকে জয় করতে পারে না। সুতরাং সকল সংগ্রামে বিজয়ী অপেক্ষা বিজিতের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহুদী-গুরু জেরেমিয়ার কাহিনীর মধ্য দিয়ে ৎস্‌ভাইক এই তত্ত্বটি বলতে চেয়েছেন। জেরেমিয়া ও তাঁর অনুগামীরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন; ক্যালডিয়ার বিজয়ী সেনাপতি বিবেকের দংশন অনুভব করছেন বন্দীদের দেখে। তাঁর মনে হল আমাদের জয় বাইরের জয়। আমি শত্রুসৈন্য হত্যা করতে পারি; কিন্তু তার অন্তরে যে ভগবান বসে আছেন তাঁকে স্পর্শ করবার ক্ষমতাও নেই। একটা জাতির স্বাধীনতা হরণ করতে পারি, কিন্তু জাতির আত্মাকে বন্দী করবার ক্ষমতা কই? সুতরাং জয়ী হয়েও হেরে গেলাম।

যুদ্ধক্লিষ্ট য়ুরোপ ৎস্‌ভাইকের এই আশার বাণীতে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিল। অভিনীত না হলে নাটকের বাণী মূর্ত হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। তখন ১৯১৭ সন। যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধবিরোধী নাটক অভিনয় করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বক্তৃতা-প্রধান নাটকটির বিশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডে কিছুদিন 'জেরেমিয়া'-র অভিনয় হয়েছিল।

জীবনে যে সঙ্কট দেখা দিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় কি? সঙ্কটত্রাণের পথ খুঁজে না পেলে যুদ্ধ বার বার এসে মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে যাবে; দূর হবে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন, রুদ্ধ হবে মানব-কল্যাণের সকল পথ। প্রথম মহাযুদ্ধের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থেকে ৎস্‌ভাইক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনী ও চরিত্র আলোচনার মধ্যেই সঙ্কটমুক্তির উপায় আছে। যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্কট জয় করে প্রতিভার জ্যোতির্লোকে পৌঁছেছেন, সমাজ ও জাতির সমস্যা সমাধানের পথ তাঁরাই দেখাতে পারেন। ৎস্‌ভাইক নিজে সঙ্কটকালে শক্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছেন এঁদের জীবন থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধে জেরেমিয়ার আদর্শ তাঁকে শান্তি দিয়েছে। ১৯৩৪ সনে হিটলারের দমননীতি যখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, তখন তিনি তন্ময় হয়ে লিখেছেন ইর‍্যাস্‌মাসের জীবনী। স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও দ্বেষ দূর হয়ে একদিন ন্যায় ও যুক্তি জয়লাভ করবে—ইর‍্যাস্‌মাসের এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে সঙ্কটত্রাণের শক্তি দিয়েছে। শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন

মোঁতেনি। যে রাত্রিতে ৎস্ভাইক পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেই রাত্রিতেও তাঁর টেবিলের উপর সাজানো ছিল মোঁতেনির জীবনী ও রচনাবলী।

গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে; তাই সাধারণ মানুষের জীবনী আজকাল সমাদৃত হয়। কিন্তু চরিতকার হিসাবে ৎস্ভাইক ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। তিনি শুধুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনী রচনার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নির্বাচন করবার প্রয়োজন ছিল। ৎস্ভাইক গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু য়ুরোপের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁকে জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সঙ্কটে যাঁদের চরিত্র-অধ্যয়ন শক্তি দিতে পারবে, ৎস্ভাইক সাধারণত তাঁদের জীবনই নির্বাচন করেছেন। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের বাদ দিয়ে তিনি নিয়েছেন নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনী। কিন্তু কখনও কখনও তিনি হয়ত একটি জীবন-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আমেরিগো ও ম্যাগেলানের জীবনের বিচিত্র গল্প তাঁকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেছে ব'লেই লিখেছেন তাঁদের চরিতকথা। এঁরা যথাক্রমে আমেরিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন। Healers through the Spirit-এ ৎস্ভাইক আলোচনা করেছেন মেস্মার, বেকার-এডি এবং ফ্রয়েডের কার্যকলাপ। মনকে প্রভাবান্বিত করে রোগ নিরাময়ের যে পদ্ধতি নিয়ে এঁরা কাজ করেছিলেন তার আলোচনার প্রয়োজন ছিল। The Tide of Fortune-এ ৎস্ভাইক এক এক জন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে-সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে তাদের ছবি এঁকেছেন। এগুলি পুর্ণাঙ্গ ছবি নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি নাটকীয়তায় পুর্ণ। সিসারোর মৃত্যু, গ্যেটের শেষ প্রেম, স্কটের দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার ইত্যাদি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

ৎস্ভাইকের জীবনী নৈর্ব্যক্তিক এবং ইতিহাসাশ্রয়ী নয়। একটি জীবনের যে দিকটা তাঁর কাছে ভালো লেগেছে, সে দিকটাই তিনি বড় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধারাবাহিক জীবনী রচনায় উৎসাহ ছিল না তাঁর। তিনি কীর্তি-আলোচনায় প্রাধান্য না দিয়ে জীবনের ছবি এঁকেছেন। কীর্তি তো সকলের কাছেই উন্মুক্ত, যে কেউ তা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু কীর্তির শিখরে পৌছতে যে সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল তার খবর কজন রাখে? ৎস্ভাইক অবিষ্কারকের কৌতূহল নিয়ে প্রতিভাবানদের জীবনের সেই অপরিজ্ঞাত দিকটা আলোচনা করেছেন।

ৎস্‌ভাইক দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে বালজাকের জীবনী লিখেছেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পরিমার্জিত করে যাবার সময় পাননি। তাঁর মৃত্যুর পরে অপরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। বালজাকের ব্যক্তিগত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাঁর প্রেমের অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; কিন্তু সাহিত্য আলোচনার উপর একটুও জোর দেওয়া হয়নি। ডিকেন্স, দস্তয়েভস্কি, নীট্‌শে, হলডারলিন, ক্যাসানোভা, স্তাঁদাল, তলস্তয়, জোসেফ ফুশে (নেপোলিয়নের মন্ত্রী) প্রভৃতি বহু প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবনী ৎস্‌ভাইককে আকৃষ্ট করেছে। একবার ভাবলেন, জীবনী তো অনেক লেখা হয়েছে, আর লিখব না। কিন্তু সঙ্কল্প রইল না বেশিদিন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছেন পড়তে। হাতে-লেখা পুরনো কাগজ-পত্রের উপর তাঁর বরাবরই গভীর আকর্ষণ। চোখে পড়ল মেরি স্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ডের রিপোর্ট। তক্ষুনি তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, মেরি কি সত্যি তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন? প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের জন্য ডিটেকটিভের ঔৎসুক্য জাগল তাঁর মনে। মেরি স্টুয়ার্ট সম্বন্ধে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন; আর শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে গেল মেরি স্টুয়ার্টের জীবনী।

যদিও ৎস্‌ভাইক পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্য-কণ্টকিত জীবনী লেখেন নি, তথাপি প্রত্যেকটি তথ্য নিয়ে তাঁকে আলোচনা করতে হয়েছে। অনেক লেখক আছেন, তাঁরা যা জানেন সবটাই লেখার মধ্যে প্রকাশ করেন; কিন্তু ৎস্‌ভাইক সব জেনে নিয়ে ব্যবহার করেন শুধু অত্যাবশ্যক অংশটুকু। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর জীবনী লেখবার সময় তিনি রানীর ব্যক্তিগত হাত-খরচার প্রত্যেকটি বিল পরীক্ষা করেছেন, সমকালীন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের ফাইল এবং আদালতের নথি-পত্র খুঁটিয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের মধ্যে এ সব সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের আভাস পর্যন্ত নেই।

ৎস্‌ভাইকের জীবনী-সাহিত্য সুখপাঠ্য। অনেকগুলি উপন্যাসের আঙ্গিকে লেখা। এক-একটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। তাঁর জীবনী-সাহিত্যে এবং অন্যত্র মানবতা ও নীতি-বোধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। ৎস্‌ভাইকের আত্মচরিত The World of Yesterday-ও এ সব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পৃথিবীর আত্মচরিত-সাহিত্যে এটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, আমি নিজেকে এত বড় বলে মনে করি না যে, অন্যকে আমার জীবনের কাহিনী শোনাবো। য়ুরোপের

ইতিহাসের এক সঙ্কটময় অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছি, তার কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। ছায়াচিত্র-বক্তৃতায় বক্তার যে ভূমিকা, এই গ্রন্থে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ভূমিকাও ততটুকু।

য়ুরোপের বাইরে ৎস্‌ভাইকের গল্পের সমাদর বেশি। অথচ ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয় যে, জীবনী-সাহিত্যের তুলনায় তিনি কথা-সাহিত্যকে উপেক্ষা করেছেন। ভিয়েনার জীবনের দু'টি বিশিষ্ট ধারা তাঁর গল্প-উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। এক দিকে কাব্য, সঙ্গীত ও রঙ্গমঞ্চের ভাবাবেগ-প্রবণতা; অন্য দিকে বিজ্ঞানের পরিমিতিবোধ ও যুক্তিবাদ। বিশেষ করে ফ্রয়েড ও ব্রোইয়ারের মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি ৎস্‌ভাইক যে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা পাওয়া ভার। ৎস্‌ভাইকের গল্পে গীতিকবিতার ভাবাবেগ এবং মনোবিজ্ঞানের শেষতম আবিষ্কারের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে।

ৎস্‌ভাইকের প্রথম গল্প 'এরিকা এভাল্ডের প্রেম'। এর পরে বের হল গল্প-সংগ্রহ 'প্রথম অভিজ্ঞতা' (১৯১১)। কিন্তু ১৯২২ সনে Amok (উন্মত্ত) প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়নি। জাভার এক দুর্গম অঞ্চলে চাকরি নিয়ে গেছে এক জার্মান ডাক্তার। দিনের পর দিন একঘেয়ে নিঃসঙ্গ জীবন। হঠাৎ একদিন একটি শ্বেতকায়া রমণী এল তাকে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দেবার প্রার্থনা নিয়ে। সেই নিঃসঙ্গ পরিবেশে একটি য়ুরোপীয় রমণীকে দেখে ডাক্তারের বহুদিনের নিরুদ্ধ যৌনবাসনা জেগে উঠল। উন্মাদের মতো সে মহিলার অনুসরণ করল সকল বিপদ তুচ্ছ করে। কিন্তু তাকে পেল না। অথচ অবস্থার আবর্তে পড়ে মহিলার কলঙ্ক এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর দায়িত্ব তাকেই নিতে হল।

Twenty-four Hours in the Life of a Woman আর একটি আশ্চর্য গল্প। এক বিধবা ভদ্রমহিলা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তিনি সচ্চরিত্রা এবং উন্নতমনা। হঠাৎ একদিন এক তরুণ জুয়াড়ী তাঁকে কাঁচপোকার মতো আকৃষ্ট করল। মহিলার হৃদয় মমতায় পূর্ণ হয়ে গেল; এই সর্বনাশা নেশা থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে গিয়ে দেহ দান করলেন, লোকলজ্জা ভুলে তার পেছনে ছুটলেন; তবু বাঁচাতে পারলেন না, শুধু নিজের জীবনটা নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছিনিমিনি খেললেন।

ফ্রয়েডের মতে এই গল্পটি ৎস্‌ভাইকের 'মাস্টারপীস্'। ফ্রয়েড এই গল্পের

প্রত্যেকটি লাইন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এর চরিত্রচিত্রণ ত্রুটিহীন। ফ্রয়েড বিজ্ঞানের যে তথ্য আবিষ্কার করেছেন, ৎস্ভাইক তাকেই সাহিত্যে দিয়েছেন কাব্যময় রূপ।

তাঁর শেষ বয়সের রচনা Royal Game আর একটি আশ্চর্য গল্প। দু'জন 'মনোম্যানিয়াক' (একটি বিষয়ে যাদের মন নিবিষ্ট) দাবাখেলা আয়ত্ত করেছে। একজন দাবাখেলায় পেয়েছে চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি। আর একজনের পরিচয় কারও জানা নেই। এদের দু'জনের দেখা হল সমুদ্রগামী এক জাহাজে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলতে বসেছে; যাত্রীরা চারদিকে এসে দাঁড়িয়েছে খেলা দেখতে। প্রত্যেকের মনে উৎকণ্ঠা—কে জিতবে? দাবাখেলা না জানলেও পাঠকের মনও উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন আকৃষ্ট করে রাখবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাবে ৎস্ভাইকের প্রত্যেকটি গল্পে। তাঁর একটি মাত্র উপন্যাস Beware of Pity (১৯৩৯)-তেও এই গুণটি আছে। একটি পঙ্গু তরুণী যাকে প্রেম নিবেদন করল, সে সুস্থ সবল তরুণ। যুবক তার জন্য দুঃখ অনুভব করে, মমতা বোধ করে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে না। মাঝে মাঝে করুণাকেই ভালোবাসা বলে ভুল হয়। শুধু করুণার বশবর্তী হয়ে যুবক যদি তরুণীকে গ্রহণ করে তাহলে তার জীবন হবে দুঃখময়; আবার অসহায়া পঙ্গু তরুণীর প্রেম প্রত্যাখ্যাত হলে সে যে কত বড় বেদনা পাবে তা কল্পনাও করা যায় না। এই দুই দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে পাঠকের মন ঘুরপাক খায়, পরিণতি সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কৌতূহল অক্ষুণ্ণ থাকে।

যারা তাদের জীবন, সময়, অর্থ, স্বাস্থ্য এবং সুনাম পরম অবহেলায় দু'হাতে উড়িয়ে দেয়, তারা ৎস্ভাইককে আকৃষ্ট করেছে। বর্তমান যুগের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তাদের জীবনে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের ৎস্ভাইক খুঁজে পেয়েছেন ভিয়েনার রেস্তোরাঁয়, য়ুরোপের প্রমোদকেন্দ্র ও জুয়ার আড্ডায়, এবং প্রাচ্যভ্রমণের দীর্ঘ পথের দু' পাশে। গল্পকার ৎস্ভাইকের বৈশিষ্ট্য রোঁলা 'অ্যামক' ও অন্যান্য ছোট উপন্যাসের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় সুন্দর করে বলেছেন: 'The characteristic trait in (Zweig's) artistic make-up is the passionate desire to recognise the unflagging insatiable curiosity, the demonic urge to see, to know, to live every life himself. It has made of him a veritable

'Flying Dutchman', a passionate pilgrim. He is the impudent yet devout admirer of genius, whose mystery he has plucked out only to love it more deeply, the poet who has made Freud's dangerous key his own—the soul-snatcher.'

ৎস্‌ভাইক প্রাচ্য ভ্রমণের পথে ভারতে এসেছিলেন। ভারতবাসীর রোগক্লিষ্ট দেহ এবং নিরানন্দ পরিবেশ তাঁকে ভারতের প্রতি বিমুখ করেছিল। ঠিক এমনি হয়েছিল হেরমান হেসের বেলায়। বর্তমান ভারত তাঁদের দু'জনকেই হতাশ করেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের আকর্ষণ কেউ এড়াতে পারেন নি। ৎস্‌ভাইকের Virata or The Eyes of the Undying Brother প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় রচিত একটি কাহিনী। লেখক একে লোক-কাহিনী বলে আখ্যা দিয়েছেন। কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে বা বীরগাথায় এর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

বুদ্ধের জন্মের পুর্বে রাজপুতানা অঞ্চলে বিরাট নামে একজন ন্যায়পরায়ণ, সংযমী ও উদারচেতা ব্যক্তি বাস করতেন। যোদ্ধা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। একবার সৈন্যেরা বিদ্রোহ করে রাজ্য আক্রমণ করল। রাজ্য যায় যায়। রাজা নিরুপায় হয়ে বিরাটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিরাট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ শত্রু-শিবির আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেন। পরদিন ভোরবেলা শত্রু-শিবিরে মৃতদেহের স্তূপ দেখে বিরাট শিউরে উঠলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর অগ্রজের মৃতদেহ। বড় ভাই যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সে কথা তাঁর জানা ছিল না। মৃত ভ্রাতার বিস্ফারিত চোখ দু'টি যেন তাঁকে তিরস্কার করছে। বিরাটের মনে হল ভগবান তাঁকে ইঙ্গিত করে বলছেন, যে কোনো মানুষকে হত্যা করাই ভ্রাতৃহত্যার মতো পাপ। অস্ত্রশস্ত্র নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন বিরাট। রাজা খুব সন্তুষ্ট তাঁর উপরে। তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, মহারাজ, জীবনে আর যুদ্ধ করব না।

রাজা বিস্মিত হলেন। একটু থেমে বললেন, বেশ, তুমি তা হলে বিচারপতির পদ গ্রহণ কর। তুমি ন্যায়নিষ্ঠ, প্রজারা তোমার কাছ থেকে সুবিচার পাবে।

বিরাট এ পদ গ্রহণ করলেন। দিনের পর দিন নানা বিচিত্র মামলার

বিচার করে চলেছেন। তাঁর সুবিচারের যশ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন না। একদিন সীমান্ত অঞ্চল থেকে এক উদ্ধত জোয়ান ম্লেচ্ছ যুবককে বেঁধে আনা হল বিচারালয়ে। সীমান্ত পার হয়ে সে অত্যাচার করত ভদ্রপল্লীতে। ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তাতে বাধা দেওয়ায় দশ-বারো জন লোক খুন করেছে

বিরাট বিচার করে যত জন লোক খুন করেছে তত বছর ভূগর্ভস্থ কারাগার-বাস এবং চাবুক মারবার আদেশ দিলেন। খুন করেছে, তবু প্রাণদণ্ড দেওয়া হল না। বন্দী যুবক উদ্ধতভাবে বলল, হে বিচারক, তুমি বিচার করেছ অন্যের কথা শুনে; তুমি আমাকে যে দণ্ড দিলে, সে দণ্ড যে কি তা তুমি জান না। তোমাকে কখনও চাবুকের মার খেতে হয়নি, মাটির নিচে বন্দী হয়ে থাকতে হয়নি। আমি রাগের মাথায় জ্ঞানশূন্য হয়ে খুন করেছি। আর তুমি বিচারের নাম করে সুস্থ মস্তিষ্কে আমাকে মাটির নিচে বন্দী করে তিলে তিলে হত্যা করবার আদেশ দিলে। এই কি বিচার? বন্দীকে কি কষ্ট ভোগ করতে হয় তার অভিজ্ঞতা যে বিচারকের নেই, তার কাছ থেকে কখনও সুবিচার আশা করা যায় না।

বিরাট দেখলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অগ্রজের চোখে যে অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টি ছিল এই বন্দীর চোখেও ঠিক তেমনি চাউনি ফুটে উঠেছে। বিরাট রাজার কাছ থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে সেই রাত্রিতে কারাগারে গেলেন। বন্দী যুবকের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, তুমি আমার পোশাক পরে বেরিয়ে যাও। এক মাস পরে রাজার কাছে এই চিঠি পৌঁছে দিও।

এক মাস ধরে বায়ুহীন সঙ্গীহীন অন্ধকার ভূগর্ভে থেকে বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে, নানা রকম উৎপীড়ন সইতে হয়েছে। এক মাস পরে কারাগারের দরজা খুলে গেল; রাজা এসেছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। বিরাট নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন, মহারাজ, আমাকে বিচারকের কর্তব্য থেকে মুক্তি দিন। আমি এখন উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, কেউ কারো বিচার করতে পারে না। বিচার ভগবানের হাতে। তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়া পাপ।

বিচারপতির পরিবর্তে রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলেন। কিন্তু বিরাট সম্মত হলেন না। কারণ প্রত্যেকটি কথা কার্যে পরিণত হবে। এক-একটি কথার সুদূরপ্রসারী পরিণামটা আগে থাকতে জানা যায় না। সকল

কর্ম থেকে বিরত হয়ে একাকী জীবন-যাপন করাই পাপের হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। রাজকার্য ত্যাগ করে নিভৃত গৃহকোণে বাস করতে লাগলেন বিরাট। তাঁর পরামর্শ চাইতে মাঝে মাঝে লোক আসে। বিরাট দেখলেন, আদেশের চেয়ে উপদেশ ভালো, বিচারের চেয়ে ভালো সালিসী।

কয়েক বছর কেটে গেল। একদিন এক ক্রীতদাসকে কেন্দ্র করে তাঁর আদর্শের সঙ্গে ছেলেদের আদর্শের সংঘাত বাধল। বিরাট জোর করে নিজের ইচ্ছাকে ছেলেদের উপর চাপাতে চাইলেন না। শান্তি ও সত্যের সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন বনে। বছরের পর বছর কঠোর তপস্যা করে চলেছেন বিরাট। বনের পশু-পাখিরা তাঁকে নিজেদের একজন বলে গ্রহণ করেছে, মানুষ বলে একটুও ভয় করে না। লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন শিকারী একদিন পথ ভুলে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে উপস্থিত। সে লোকালয়ে ফিরে গিয়ে এই আশ্চর্য ঋষির কথা প্রচার করল। রাজা নিজে এলেন বিরাটকে ফিরিয়ে নিতে। বিরাট আর ফিরে যাবেন না। এখানে মানুষের সঙ্গ নেই, কাউকে উপদেশ দিতে হয় না, শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই, সুতরাং পাপ থেকে তিনি মুক্ত।

অনেক লোক প্রত্যহ বিরাটকে দূর থেকে প্রণাম করে চলে যায়। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। একদিন বিশেষ জরুরী কাজে বিরাটকে যেতে হল নিকটবর্তী গ্রামে; গ্রামের প্রান্তে জীর্ণ কুটিরে বাস করে এক রমণী। তার চোখে ভৎ'সনার দৃষ্টি দেখে বিরাট থামলেন। ঠিক যেন মৃত অগ্রজের স্থির চোখের চাউনির মতো। এগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, আমি তোমার কাছে কোনো অপরাধ করেছি?

নারী জ্বলে উঠল: জানো না, তুমি আমার কি করেছ? আমার স্বামী ছিল এ অঞ্চলের সেরা তাঁতী। তোমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে সে সংসার ত্যাগ করেছে। উপার্জন করবার কেউ নেই। আমার তিনটি সন্তান পর পর না খেয়ে মারা গেছে। এর জন্য তুমি দায়ী।

বিরাট ব্যথিত হলেন। এতদিনে উপলব্ধি করলেন পৃথিবীতে থাকতে হলে সংসারকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কর্মবিরতিও কথা এবং কাজের মতো অন্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। নিজেকে ভুলে সেবা করবার মধ্যেই আছে মুক্তি, শুধু সংসার ত্যাগ করলে কিছু হয় না। কামনা থেকে মুক্ত হতে হবে,

সে কামনা জাগতিক বা আত্মিক হতে পারে। কামনা সৃষ্টি করে বিভ্রম, সেবা দেয় জ্ঞান।

বিরাট রাজধানীতে ফিরে রাজার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন কুকুরশালার অধ্যক্ষের পদ। বাকি দিনগুলি তাঁর কাটল পরম শান্তিতে কুকুরের সেবা করে।

এই কাব্যমণ্ডিত, তত্ত্বপ্রধান কাহিনীটি ৎস্‌ভাইকের অপূর্ব সৃষ্টি।

হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষের ফলে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে য়ুরোপ ত্যাগ করতে হয়েছে; জার্মানীতে ৎস্‌ভাইকের গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব হত, কিন্তু তিনি অষ্ট্রিয়ার নাগরিক বলে তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল অষ্ট্রিয়ার উপর। ৎস্‌ভাইককে দেশত্যাগ করতে হল। ১৯৪০ সনে তিনি বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। লণ্ডনে তিনি বিয়ে করলেন তাঁর সেক্রেটারি শ্রীমতী এলিজাবেথকে। ইংলণ্ড তাঁর ভালো লাগেনি। ইংরেজরা বড় পরিমিত কথা বলে, আচার-ব্যবহারেও বড় রূঢ় সংযম। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিছু দিন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার পর ৎস্‌ভাইক ব্রেজিলের পেট্রোপলিস শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন।

ব্রেজিল সুন্দর দেশ। প্রথম এসে মনে হল, এখানে শান্তিতে থাকতে পারবেন। ব্রেজিলের উপর তিনি একখানি বইও লিখলেন—Brazil : Land of the Future. কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। জলের মাছ ডাঙায় তুললে যেমন ছটফট করে, ৎস্‌ভাইকও তেমনি অস্থির হয়ে উঠলেন য়ুরোপের জন্য। পরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই ছেলেমানুষের মতো উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেন, আবার কবে য়ুরোপ যাবো? য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারীর পক্ষে অন্য দেশের পরিবেশ সহজে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রোলাঁ, গোর্কি, ভ্যারারেন, ভ্যালেরি, তোসকানিনি, হেরৎসাল, স্‌ভাইৎসার, বাক, মালার, ফ্রয়েড প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্মৃতি মনে পড়ে। কত বই চিঠি-পত্র পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ফেলে আসতে হয়েছে। তাদের অভাবে বাড়ি শূন্য মনে হয়। ৎস্‌ভাইকের ধারণা হয়েছে, এখন যা-কিছু লিখছেন তাতে প্রাণ নেই। প্রাণ থাকবে কি করে? এখানে মাতৃভাষা জার্মান কারও মুখে শোনা যায় না। হয়ত একদিন ভুলেই যেতে হবে।

ৎস্‌ভাইক ছিলেন প্রবল আশাবাদী। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম তাঁকে

আশাবাদী করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ তাঁর অখণ্ড য়ুরোপের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করলেও তিনি নিরাশ হননি। তিনি বলতেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের নিচে মানুষের আত্মা বেঁচে থাকবে। সাময়িক ভাবে আমাদের আত্মিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু তার মৃত্যু নেই, আবার সক্রিয় হয়ে সে মানুষের কল্যাণ করবে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নির্মম পীড়ন প্রত্যক্ষ করে ৎস্‌ভাইক নিরাশাবাদী হয়ে উঠলেন। য়ুরোপ থেকে পালিয়েও বুঝি রক্ষা পাওয়া যাবে না। হিটলারের বিজয় অভিযান যেরূপ অবাধে চলছে তাতে নাৎসীদের পক্ষে আমেরিকা জয় করা অসম্ভব নয়। ওদিকে জাপান। সিঙ্গাপুরের পতন হল। সিঙ্গাপুরের পতন নয়, ওটা য়ুরোপেরই পরাজয়। মানবমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে বাস করবার মতো একটু স্থান পৃথিবীর কোথাও বুঝি পাওয়া যাবে না।

পেট্রোপলিসের এক সভায় বিখ্যাত কবি মিস্ত্রাল-এর সঙ্গে প্রথম আলাপ হল। সভায় বসেই ৎস্‌ভাইক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন; নাৎসীরা কি দক্ষিণ-আমেরিকাও আক্রমণ করবে? আপনার কি মনে হয়?

মিস্ত্রাল বিশেষ কিছু না ভেবেই উত্তর দিলেন, অ[illegible]ব কি? আসতেও পারে।

উত্তর শুনে ৎস্‌ভাইকের মুখ মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেল।

এরপর থেকে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কে পূর্ণ হয়ে উঠল। বেঁচে থেকে নিরুপায় ভাবে প্রতিদিন মানুষের লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করবার বেদনা আর সহ্য করা যায় না। সংবাদপত্রে যুদ্ধের খবর পড়বার পর থেকে অস্বাভাবিক উত্তেজনা, গ্লানি ও হতাশার মধ্য দিয়ে দিনটা কেটে যেত। লেখা পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল। এ ভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

বাঁচলেন না বেশিদিন। ১৯৪২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি স্টেফান ৎস্‌ভাইক ও এলিজাবেথ শার্লট ৎস্‌ভাইকের আলিঙ্গনাবদ্ধ মৃতদেহ তাঁদের শোবার ঘরে পাওয়া গেল। শয্যার পাশে ছোট টেবিলের উপর দু'টি কাচের শূন্য বিষভাণ্ড। ৎস্‌ভাইকের বয়স ষাট, এলিজাবেথের ত্রিশ। ওই টেবিলের উপরই একটি ছোট চিঠি ছিল :···আমার মাতৃভাষার জগৎ এবং আত্মার গৃহ য়ুরোপ থেকে বিতাড়িত হয়ে যাযাবরের মতো দেশে দেশে ঘুরেছি। বয়স হল ষাট; এমনি করে ঘোরবার আর শক্তি নেই। আজকের কালো রাত শেষ হয়ে নতুন প্রভাত আসবে। আমার বন্ধুরা তা দেখে যাবেন। কিন্তু আমি বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছি। আমি যাত্রা করলাম একা।···

হেরমান হেসে

১৮৭৭—

জার্মানীর কাছে আমাদের ঋণ অনেক। এর সঙ্গে রাজনীতি বা অর্থনীতির যোগ নেই বলে ঋণটা স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকতে বাধে না। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান পণ্ডিতরা নিঃস্বার্থভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ করেন। তার ফলে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীত অন্যান্য জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আমরাও নিজেদের বিস্মৃত অতীতের সঙ্গে নবপরিচয় লাভ করি। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ছাড়া গ্যেটে, নীট্‌শে, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি মনীষীরা ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শোপেনহাওয়ার তো বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে, ভারতীয় দর্শনের এক পৃষ্ঠায় যতটা সত্যবস্তু পাওয়া যায়, কাণ্টের পরবর্তী দশখানা য়ুরোপীয় দর্শনের বইয়ের মধ্যেও তা নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে সমরানলের পাশে জার্মান পাণ্ডিত্যের শিখা ম্লান হয়ে এসেছে। হেরমান হেসের রচনার মধ্যে এখনো ভারতীয় চিন্তাধারার পরিচয় পেয়ে বিদেশে আত্মীয় লাভের আনন্দ অনুভব করা যায়। হেসের জন্ম জার্মানীতে এবং জার্মান ভাষা তাঁর সাহিত্যের বাহন; তবু নাৎসীবাদের বিরোধী বলে অনেকদিন যাবৎ তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব বরণ করেছেন। দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেও তাঁর মন যে এখনো খাঁটি জার্মান রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৪৬ সালে হেসে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত চারজন বিদেশী সাহিত্যিক ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিপ্‌লিঙের রচনায় ভারতের ছবি আছে, তাঁর প্রাণের স্পন্দন নেই। ১৯১৭ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী দিনেমার সাহিত্যিক কার্ল গেলেরূপের (Karl Gjellerup) উপন্যাসের অনুবাদ The Pilgrim Kamanita লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯১১ সালে। একটি বৌদ্ধ উপাখ্যান এই উপন্যাসের ভিত্তি। বিষয়বস্তুর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধাশীলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টমাস মান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯২৯ সালে। বেতাল পঞ্চবিংশতির একটি কাহিনী

অবলম্বন করে তিনি লিখেছেন The Transposed Heads (1940). হেসের সমগ্র রচনার মধ্যেই হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের মূল সত্যগুলো ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। বিশেষ করে তাঁর 'সিদ্ধার্থ' ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত একটি অনবদ্য কাব্যোপন্যাস।

হেসে পরিবারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ অনেক দিনের। কিন্তু হেরমান হেসের সাহিত্য-সাধনার কথা এদেশে বিশেষ আলোচিত হয়নি। তার কারণ হয়ত এই যে, যে-দু'টি জানালা দিয়ে জগতকে আমরা দেখি সেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বোধ হয় দার্শনিকতা ও প্রাচ্যমুখীনতার জন্য হেসে জনপ্রিয়তা লাভ করেন নি। কিন্তু য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডে বর্তমান কালের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকদের মধ্যে হেসে অন্যতম বলে স্বীকৃত। য়ুরোপের এবং অন্যান্য দেশের অনেক ভাষায় হেসের রচনার অনুবাদ হয়েছে।

হেরমান হেসে (Hermann Hesse) দক্ষিণ জার্মানীর ক্ষুদ্র শহর কাল্‌ভ-এ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৭ সালের ২রা জুলাই। তাঁর প্রথম যুগের রচনায় কাল্‌ভ-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। হেসের পূর্বপুরুষ এবং আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই ছিলেন পাদ্রি। তাঁদের পরিবার বিবাহের ব্যাপারে খুব উদার মতাবলম্বী ছিল। ঘরের বৌরা এসেছেন ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, বল্টিক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে। নানা জাতির মিশ্রণের ফলে কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা হেসে পরিবারে প্রশ্রয় পায়নি। নাৎসীদের বিশুদ্ধ রক্তের আদর্শকে হেসে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন এবং এই ঘৃণাই তাঁকে দেশছাড়া করেছে।

হেসের পিতা এবং মাতামহ দু'জনেই বেসেল ইভ্যাঞ্জেলিক্যাল মিশনের ভারতীয় কেন্দ্রের পাদ্রি ছিলেন। তাঁর মা'র জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। হেসের মাতামহের ভারতীয় বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তিনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনে সহায়তা করায় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন। সুতরাং ছেলেবেলা থেকেই হেসের ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছিল। পরে চীনা সংস্কৃতিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। হেসে অনেকবার স্বীকার করেছেন যে, এই দুই জাতির মহান ঐতিহ্য থেকে তিনি গভীর প্রেরণা পেয়েছেন।

পূর্বপুরুষদের পথ হবে হেসেরও পথ এই বিশ্বাস নিয়ে হেসেকে ভর্তি করে দেওয়া হল মলব্রনের ধর্মশিক্ষালয়ে। এখানকার পাঠ শেষ করে যেতে হবে

বিখ্যাত ধর্ম-বিশ্ববিদ্যালয় টুবিন্‌গেনে। তারপরে ধর্মযাজক হয়ে চলে যাবেন চীন কিংবা ভারতবর্ষে। কিন্তু সেই বালক বয়সেও হেসের কাছে ছক-বাঁধা জীবন অসহ্য বোধ হল। ইতিমধ্যেই তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রণয়সুধা লাভ করেছেন এবং একটা নিজস্ব জীবন-দর্শনের অস্পষ্ট অনুভূতি তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। জীবনের সবগুলি অলি-গলি নিজে খুঁজে বের করে চিনে নেবেন, তারপরে একদিন এগিয়ে যাবেন স্বনির্বাচিত পথে,—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। হেসে তাই বিদ্রোহ ঘোষণা করে পুঁথিগত ধর্মশিক্ষার অভিনয় শেষ করে দিলেন।

পুত্রের এই মতিগতি পিতামাতাকে বিচলিত করে তুলল। জার্মানীতে তখন একজন ধর্মগুরু ওঝাগিরি করে এমন নাম করেছেন যে, তাঁকে বলা হত ক্রাইষ্ট অব ব্লুমহার্ড। কাঁধ থেকে ভূত নামাবার জন্য পনেরো বছরের কিশোর হেরমানকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু এই ক্ষীণদেহ বালকের স্বকীয়তার কাঠিন্য ওঝার মন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিল। পরিজনরা হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। হেসে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চাকার তলায়' (Unterm Rad) এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। সেখানেও দেখতে পাই একটি অনুভূতিপ্রবণ কিশোর হৃদয়হীন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পরবর্তীকালের রচনা 'নারসিজ উন্‌ত গোল্ডমুন্তে' অন্য একটি বালকের চরিত্র আছে যাকে পিতার প্রভুত্বের দাপটে নিজের আত্মার প্রেরণাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছিল।

স্কুল ছেড়ে হেসে এক ঘড়িওয়ালার শিক্ষানবিসী আরম্ভ করলেন। এখানে তিনি শ্রমিক জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে গভীর পরিচয় লাভ করবার সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতা থেকে হেসে লিখেছেন তাঁর মর্মস্পর্শী উপন্যাস 'ক্লুল্‌প' (Knulp).

মন উপবাসী রেখে শ্রমিকের কাজ করতে তাঁর বেশিদিন ভালো লাগল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বই-এর দোকানে সামান্য একটা কাজ নিয়ে টুবিন্‌গেন গেলেন। এখানে জার্মান সাহিত্যের সমুদ্রে অমৃত মন্থন করবার সুযোগ অবহেলা করলেন না হেসে। ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক জার্মান সাহিত্য শেষ করে আবার তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এখানকার মাইনে বড় অল্প, আরো আয় না হলে বাঁচা দায়। তাই একটা বই-এর দোকানে চাকরি পেয়ে ১৮৯৯ সালে বেস্‌লে চলে এলেন। এই দোকানে কাজ করতে করতেই তাঁর সাহিত্য জীবন

শুরু হয়। কয়েকখানা বই সাফল্য অর্জন করবার পর তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন।

১৯০২ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে হেসে লেখক, জেলে, মালী প্রভৃতির কাজ করেছেন। এই সময়ে তাঁর মনে যে বিপ্লব চলছিল, তারই ছবি পাওয়া যাবে প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'পিটার ক্যামেন্‌ৎসিনদ'-এ। আলপ্‌স পর্বতের পাদদেশের এক নিভৃত গ্রাম থেকে পিটার এল শহরে। বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র বলে তার নাম হল; তার কথা আলোচিত হল সংবাদপত্রের স্তম্ভে। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল সুদীর্ঘ ভ্রমণে। পিটার দেখল নানা দেশ, অভিজ্ঞতার বিচিত্র পুঁজি সঞ্চয় করল, কিন্তু মনে শান্তি পেল না। বহুদিন পরে আলপ্‌সের কোলে ছোট গ্রামটিতে ফিরে এসে দেখল এখানকার নিবিড় স্নেহ, গভীর শান্তি রয়েছে অবিকৃত। যৌবনের অমূল্য দিনগুলি যে মরীচিকার পিছনে ছুটে হারিয়েছে, পিটার তারই কৌতুককর কাহিনী লিখতে আরম্ভ করল গ্রামের শান্ত পরিবেশে।

হেসেও অন্তঃসারশূন্য য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে বাস করে মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ এক প্রাসাদের একতলায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন,—এমনি মনে হত তাঁর। এই কৃত্রিম সভ্যতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ১৯১১ সালে হেসে ভারতে এলেন। ভারতবর্ষ তাঁর মা'র জন্মভূমি এবং সকল দর্শন ও সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র। কিন্তু যত বড় আশা নিয়ে হেসে ভারতে এসেছিলেন, তত বড় ব্যর্থতাই পেলেন। তাঁর Indien Buch পড়লেই দেখা যাবে যে, বাস্তব ভারত তাঁর কল্পনার ভারতকে নির্মমভাবে হতাশ করেছে। পরে অবশ্য বুঝেছিলেন যে, বাইরে থেকে এসে দু'দিন ঘুরে গেলেই কোনো দেশের আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বুঝতে হলে হৃদয়ভরা দরদ ও অনেক সাধনার প্রয়োজন।

প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়া থেকেই হেসে নানাপ্রকার পারিবারিক বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতিটা ছিল সব চেয়ে বড় আঘাত। যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য তাঁর বইয়ের আয় কমে গেল। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লিখে সামান্য যা আয় হত, তাই ছিল একমাত্র সম্বল। অর্থাভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর মানসিক যন্ত্রণা। এই যুদ্ধের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে যান্ত্রিক সভ্যতার অভিযান। তাঁর মতবাদ জার্মান কর্তৃপক্ষের অনুকূল ছিল না। তাই

ছদ্মনামে প্রকাশিত তাঁর Demian উপন্যাসটি জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পুরস্কার পাবে, এমন ঘোষণা সত্ত্বেও আত্মপরিচয় দিয়ে সে পুরস্কার গ্রহণ করা হেসের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

হেসে লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পান আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস Hermann Lauscher লিখে। এই প্রথম পরিণত রচনার মধ্যেই তাঁর জীবনের একটি প্রধান সুরের পরিচয় ধরা পড়ে। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর ও কুৎসিত, তুচ্ছ ও মহৎ, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই জীবনের সব চেয়ে বড় শিক্ষা এই তত্ত্ব তাঁর পরবর্তী প্রায় সকল গ্রন্থেই পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে 'সিদ্ধার্থে।' তাঁর প্রথম উপন্যাসে তিনি বলছেন: 'সংসারের রঙ্গমঞ্চে যে-সব নরনারী অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় পেতে চাই; রাস্তা দিয়ে যে গাড়ি যাচ্ছে, তাদের চলার শব্দ কান ভরে শুনব; দূর-দূরান্তের অখ্যাত স্থানের ছোট ছোট সরাইখানায় মদের গ্লাস হাতে করে অলস মুহূর্তগুলি গল্প করে কাটিয়ে দেবার বাসনা জাগে; উচ্ছৃঙ্খল তরুণীদের সঙ্গে শালীনতার বন্ধনমুক্ত ভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলব; আবার কখনো ধনীর ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলব···।'

এরপরের উপন্যাস Peter Camenzind (১৯০৪)-এ যে ভবঘুরের দেখা পাই, সে পরবর্তী অনেক উপন্যাসে ফিরে এসেছে। এই ভবঘুরে কোন্ এক অনির্দেশ্য লক্ষ্যের মোহে তন্ময় হয়ে ছুটে চলেছে; কিন্তু পথের দু'পাশের ছোট ছোট সুখ ও সৌন্দর্যের কণাগুলিকে তাই বলে সে উপেক্ষা করে না।

হেসের প্রথম যুগের উপন্যাসের মধ্যে Demian (১৯১৯) স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এখানে হেসে নিঃসঙ্কোচে সংস্কারমুক্ত চিত্তে নিজের অন্তরাত্মাকে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই জন্যই হয়ত প্রথম প্রকাশের সময় তাঁকে ছদ্মনাম গ্রহণ করতে হয়েছিল। উপন্যাসের নায়িকা ইভা শাশ্বত নারীর প্রতিভূ; কিংবা হয়ত তার চেয়েও বেশি; পৃথিবীর প্রতি আমাদের যা কিছু আকর্ষণ, ইভা তারই প্রতীক। এই চিরন্তনী নারী আমাদের উৎপত্তির কারণ তাই তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার শেষ নেই। এই প্রসঙ্গে হেসে অন্যত্র বলছেন: 'মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ধারণা আছে, আমার কাছে তা সত্য মনে হয় না। আমি ভাবি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব, সেদিন আমার মা আমাকে তাঁর গর্ভের নিষ্কলুষ অনস্তিত্বে ফিরিয়ে নেবেন।'

১৯২৩ সালে 'সিদ্ধার্থ' কাব্যোপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ বলতে আমরা সাধারণতঃ যাঁকে বুঝি হেসের নায়ক কিন্তু তিনি নন। অবশ্য কাহিনীর পটভূমিকায় বুদ্ধের অদৃশ্য উপস্থিতি সব সময়ই অনুভব করা যায়, কাহিনীর মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই মাত্র একবার।

হেসের নায়ক এক তরুণ ব্রাহ্মণকুমার। শাস্ত্রপাঠ এবং যাগযজ্ঞ কিছুই তাকে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারল না। তাই সে গৃহ ত্যাগ করে বনে গেল, সকল প্রকার কঠোর তপশ্চর্যায় পারদর্শী হল। কিন্তু তবু উত্তর পেল না জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং জীবন অনিবার্যরূপে যে বেদনার বোঝা নিয়ে আসে তার হাত থেকেই বা মুক্তি পাওয়া যাবে কোন পথে ?

বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভালো লাগল, তবু সিদ্ধার্থ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল না। কারণ গুরুবাদে তার আস্থা নেই। জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ত্যাগ করে লোকালয়ে ফিরে এল। এতদিন সাধনা করেছে বৈরাগ্যের এবার সংসার-জীবনের আনন্দ-বেদনার পরিচয়টা পেতে হবে। নগরে এসে রূপোপজীবিনী কমলার কাছ থেকে প্রেমের প্রথম পাঠ গ্রহণ করল, এবং তারই সাহায্যে হল আর্থিক প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল চরম বিলাসিতায় কাটিয়ে হঠাৎ একদিন জীর্ণবস্ত্রের মতো সব ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ। খেয়াঘাটের এক বৃদ্ধ মাঝির আমন্ত্রণে তার কুটিরে বাকী জীবনটা সে কাটিয়ে দিল। তার জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর এতদিনে খুঁজে পেল মাঝি বাসুদেব ও নদীর কাছ থেকে। জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের মোটামুটি উপলব্ধি এই : জীবনের পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়, অন্যের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যায় না। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা শিক্ষা করা যায়, জ্ঞান পাওয়া যায় না। সংসারে দুঃখের গোড়ার কথা হল সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ভাগ করে দেখবার চেষ্টা। আসলে কালপ্রবাহ এক ও অবিভাজ্য। নদী উৎপত্তি স্থান থেকে মোহনা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান ; এই জলধারার যেমন অতীত ও ভবিষ্যৎ নেই তেমনি মহাকালকেও অতীত ও ভবিষ্যতে খণ্ডিত করা চলে না। প্রিয় জিনিস হারাবার ভয়ে আমরা কত দুঃখ পাই ; আসলে নদীর জলের মতো বিশ্বের কোনো জিনিসই হারায় না। নদীর জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, মেঘ সৃষ্টি করে, আবার বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। জীবনের স্রোত এমনি অবিশ্রাম ধারায় বয়ে চলেছে ; এর মধ্যে পাপ ও পুণ্য, ভালো ও মন্দ, মানুষ ও পশুর মিলন ঘটেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে যিনি ঐক্য দেখতে পান, সহস্র

ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সংসারকে যিনি ভালোবাসতে পারেন, জীবনের রহস্য উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

'এই কাহিনীর মাধুর্য এবং দার্শনিক তত্ত্বের সৌন্দর্য পাঠকের মন অভিভূত করে। বিশেষ করে ভারতীয় পাঠকের কাছে 'সিদ্ধার্থে'র আবেদন গভীর।

পরবর্তী উপন্যাস Steppenwolf (১৯২৭)-এ হেসে বৌদ্ধযুগের শান্ত পরিবেশ থেকে যুদ্ধক্লিষ্ট য়ুরোপে চলে এসেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে; য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীরা জীবনের উপর আস্থা হারিয়েছে; ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তাদের মন পীড়িত। এই উপন্যাস সেই অস্থিরচিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত য়ুরোপের মনোজগতের একটি দলিল। হেসে প্রধানত জার্মান জাতির দ্বৈত জীবনের কথা মনে করেই এই কাহিনী রচনা করেছেন। একদিকে জার্মানরা শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে। ভারতবর্ষের দর্শন ও সাহিত্য-চর্চায়ও তাদের আগ্রহের শেষ নেই। এরাই আবার নাৎসীবাদের আদর্শে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, শক্তির দম্ভে হৃদয়ের সকল সুকুমার বৃত্তি নির্মমভাবে দলিত করতেও এদের বাধে না।

উপন্যাসের নায়ক হ্যারি হ্যালারের বয়স পঞ্চাশ; যুদ্ধের আঘাত পেয়ে জীবনের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে সে। ভগ্ন স্বাস্থ্য তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে। বেদনানাশক বড়ি খেয়ে সে কোনো রকমে বেঁচে আছে। অপরিচিত ছোট একটা শহরে হ্যালার ঘর ভাড়া করেছে। এখানে কেউ তাকে চেনে না; সে কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। একদিন হঠাৎ একটি সুন্দরী মেয়ে এল তার ঘরে। এরপর থেকে প্রায়ই সে আসে, কিছুকাল থেকে চলে যায়। একদিন বাড়িওয়ালা শুনতে পেল হ্যালার ও মেয়েটির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। তারপরে হ্যালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল। হ্যালার চলে যাবার পর তার ঘর থেকে পাওয়া গেল একটি পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির সম্পাদক হিসাবে হেসে কাহিনী বলেছেন।

ভাগ্য-পীড়িত জীবন হ্যালারের। যুদ্ধের আগে থেকেই তার দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে। বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রীর তাড়নায় ঘর ছেড়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে পথে। পারিবারিক পরিবেশের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে তার চরিত্রে এসেছে অস্বাভাবিকতা। সে দ্বৈত জীবন-যাপন করে। তার এক জীবন ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন; আর এক জীবনে আছে স্টেপ অঞ্চলের নেকড়ের মতো আদিম হিংস্রতা। দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব; যুক্তিবাদী মানসিকতার সঙ্গে অন্ধকার

অবচেতন মনের কুটিল কামনার বিরোধ। হারমাইন ও মারিয়া—এই দু'টি মেয়ে এসেছিল তার জীবনে। এরাও হ্যালারের দ্বৈত জীবনের প্রতীক। একজন এসেছিল আত্মার দাবি মেটাতে, আর একজন দেহের দাবি। দুই দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না পেরে হ্যালার যখন আত্মহত্যার কথা ভাবছিল তখন অলৌকিক 'ম্যাজিক থিয়েটারের' রঙ্গমঞ্চে তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে নিরস্ত হল।

হ্যারি হ্যালার আউট সাইডার, সমাজে তার মর্যাদা নেই। সে বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যে সত্যিকার সঙ্গীত চায়, চায় না শব্দের টুং-টাং; আমোদে না ভুলে যে আনন্দ খোঁজে, যে সোনা ফেলে আত্মার ঐশ্বর্য কামনা করে, যে ব্যস্ততার পরিবর্তে প্রকৃত কাজ চায়, যে সোহাগে তৃপ্ত না হয়ে প্রেম চায়, বর্তমান সমাজে তার স্থান নেই। আধুনিক শহুরে সভ্যতার মধ্যে নায়ক সার্কাসের পিঞ্জরাবদ্ধ নেকড়ের মতো ঘুরে বেড়ায়। সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন; সে সত্যকে চিনেছে; কিন্তু সমাজ নির্ভেজাল সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না সাহসের অভাবে। তাই হ্যারি সমাজের চোখে অস্পৃশ্য। সে একমাত্র আশ্রয় পেল শিল্পের মধ্যে।

'স্টেপেনউল্ফ' হেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। লেখকের বক্তব্যের তত্ত্ব কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেনি। গল্পরসের সঙ্গে দার্শনিক প্রসঙ্গের সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটেছে।

Narziss und Goldmond (১৯৩০)-এর গোলমুণ্ড শিল্পী এবং নারসিজ দার্শনিক। তাদের আনন্দময় জীবনে সমস্যা দেখা দিল যখন তারা নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করল। এই উপন্যাসের দার্শনিক তত্ত্ব হল এই যে, পাপের অভিজ্ঞতা লাভ না করলে সত্যিকার মুক্তি পাওয়া যায় না। পাপকে এড়িয়ে গেলে সাধনায় ফাঁকি থেকে যায় এবং এই ফাঁকির চোরাবালিতে একদিন মহাপুরুষদেরও পতন হতে পারে।

এগুলো ছাড়া হেসে আরো অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন; তাদের প্রত্যেকটিতেই একটি দার্শনিক মতবাদ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি দর্শন লেখেন নি, লিখেছেন উপন্যাস। তবু উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারার বহুল প্রচার হয়েছে য়ুরোপে এবং তিনি একজন চিন্তানায়ক বলে স্বীকৃত। হেসে বলেন, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু লেখেন না। এ কথা নিশ্চয়ই সত্য; তা না হলে তাঁর রচনার শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হত। কিন্তু তাঁর সব লেখায় উদ্দেশ্য না

হোক, একটা আদর্শ পাই। সে হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গান। তিনি নিজের মতবাদ সম্বন্ধে বলছেন: 'আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি; কিন্তু যে গণতন্ত্র ব্যক্তিকে সম্মান না করে জনসাধারণের মন পিষ্ট করে এক বৃহৎ পিণ্ড তৈরি করতে চায়, সে গণতন্ত্রকে আমি মৃত্যুর মতো ঘৃণা করি। সামাজিক সমস্যা আমি বড় করে দেখেছি, কারণ সমস্যামুক্ত ব্যক্তিই সমস্যাহীন সমাজ সৃষ্টি করতে পারে।' বিশেষ করে যৌবনের শতটানায় পড়ে মানুষ যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, হেসে সহানুভূতির সঙ্গে তার বিশ্লেষণ করে পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই জন্য জার্মান ভাষাভাষী তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর রচনাবলীর সমাদর খুব বেশি।

Das Glasperlenspiel প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। এই গ্রন্থের জন্য হেসে পর বৎসর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জপমালার গুটি নিয়ে এক ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক খেলায় যিনি Magister Ludi বা প্রধান পুরোহিত তাঁর জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। পৃথিবীর সাহিত্যে এই ধরনের দ্বিতীয় বই আছে বলে আমাদের জানা নেই। দর্শন, উপন্যাস ও জীবনীর সবগুলো লক্ষণই এখানে সমানভাবে পরিস্ফুট এবং এর যে কোনো একটি নামে বইটি অভিহিত করা চলে। এ বই খুব কম লোকেই পড়বে; যারা পড়তে আরম্ভ করবে, তাদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত শেষ করবার ধৈর্য থাকবে না। কিন্তু যারা পড়বে, তারা প্রধান পুরোহিতের চরিত্র থেকে এক নূতন চিন্তাধারার রহস্যময় অনুভূতি লাভ করে পুরস্কৃত হবে। এর আখ্যানবস্তু কিংবা পটভূমিকার সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও প্রধান পুরোহিতের কাহিনী পড়তে পড়তে 'কার্লাইলের সার্টর রিসার্টাসের' কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

প্রধান পুরোহিতের কাহিনী অতীত বা বর্তমানের নয়; গল্পের কাল ভবিষ্যতে, অর্থাৎ আগামী ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে। পর পর অনেকগুলি বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে যে অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল, তা দূর হয়ে ক্যাস্টেলিয়া নামে এক কাল্পনিক রাষ্ট্রে এক নূতন সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েছে। এখানকার নাগরিকরা এক গুপ্ত সম্প্রদায়ের সভ্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জপমালার গুটি নিয়ে একপ্রকার রহস্যময় খেলা অভ্যাস করে। এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটেছে। সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত গুটিখেলা পরিচালনা করেন। খেলায় যিনি সব চেয়ে পারদর্শী, তাঁকে পৃথিবীর সকল রহস্যের মূল বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

ক্যাস্টেলিয়া এক অভিনব সমাজ। এর ধর্ম, আদর্শ ও জীবনযাত্রা স্বতন্ত্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ নেই। যারা আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পেরেছে তাদেরই কেবল বিদেশে দূত হিসাবে পাঠানো হয়। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির কাল্পনিক ছবি অনেক লেখকই এঁকেছেন। এখানে আমরা পাই আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা। ক্যাস্টেলিয়ার সঙ্গে আমাদের যুগের তুলনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়কে বলা হয়েছে সংক্ষিপ্তসারের যুগ; এবং এই সংক্ষিপ্তসারের প্রধান বাহন হল সংবাদপত্র। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সমাজের কোনো কল্যাণ করে না এমন সব বিষয়ে থিসিস লিখে পাণ্ডিত্যের গর্ব করেন। থিসিসের উদাহরণ এরূপ: 'সুরকার রোসিনির প্রিয় খাদ্য;' 'প্রসিদ্ধ বারবনিতাদের জীবনে পোষা কুকুরের প্রভাব', ইত্যাদি। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপব্যবহারে হেসে ক্ষুব্ধ হয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করেছেন।

ক্যাস্টেলিয়ার Magister Ludi বা প্রধান পুরোহিত জোসেফ ক্লেথ্‌টের জীবনী লিখেছেন হেসে। ক্লেথ্‌ট স্কুলে থাকতেই ক্যাস্টেলিয়ার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমশ সাধনার দ্বারা সকলের আস্থাভাজন হয়ে অতি অল্প বয়সে প্রধান পুরোহিতের পদে উন্নীত হন। ক্লেথ্‌টের আধ্যাত্মিক জীবনে যে সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল লেখক তার নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন।

ক্লেথ্‌ট যখন প্রতিপত্তির শিখরে উঠেছেন তখন হঠাৎ একদিন দেখা হল তাঁর স্কুলের বন্ধু ডেসিগনরির সঙ্গে। ক্যাস্টেলিয়ার নাগরিক নয় ডেসিগনরি, সে থাকে পার্শ্ববর্তী এক শহরে। স্কুলে পড়বার সময় সে ছিল হল্লাপ্রিয়, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এতদিন পরে তাকে দেখা গেল নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপের মতো জ্যোতিহীন। বেদনার রেখায় তার সমস্ত মুখমণ্ডল কলঙ্কিত। জোসেফ আর সব ভুলে গেল, কেবলই মনে পড়ে ডেসিগনরির বিষণ্ণ মুখ। কোন্ দুঃখ মানুষকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে পারে? ক্যাস্টেলিয়ায় থেকে জোসেফ তার পরিচয় পাননি। বুদ্ধদেব যেমন রাজপথে দুঃখীদের দেখে বিচলিত হয়েছিলেন, প্রধান পুরোহিতও তেমনি বন্ধুর মারফৎ সংসারের দুঃখ জেনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি ডেসিগনরির বেদনার কারণ জানবার জন্য বন্ধুর বাড়ি এলেন; আলাপ হল তার স্ত্রীর সঙ্গে। প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় এসে এই প্রথম একটি নারী চরিত্র দেখা গেল। ক্লেথ্‌টের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, পুত্র টিটোর শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ, এবং তাই হয়েছে অশান্তির

কারণ। জোসেফ প্রধান পুরোহিতের পদ ত্যাগ করে টিটোর শিক্ষার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন।

ক্যাঁস্টেলিয়া তার শিক্ষা, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার গর্ব নিয়ে সংসারের বাইরে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছে। জোসেফ উপলব্ধি করলেন পৃথিবীকে উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক সাধনা সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। বাড়ির একতলায় আগুন লাগলে চিলেকোঠায় বসে জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করাটা বোকামি। এই একতলার বাসিন্দা হল পৃথিবীর সাধারণ নাগরিক—যারা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও বেদনায় জর্জরিত। তাদের দীর্ঘশ্বাস চিলেকোঠার নিভৃত সাধনার কেন্দ্র ছাই করে দেবে। জোসেফ বুঝলেন শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণকে সঙ্গে করেই এগিয়ে যেতে হবে, তাদের বাদ দিয়ে যে সাধনা তা কখনো সত্য হতে পারে না। তিনি তাই প্রধান পুরোহিতের গৌরবময় পদ ত্যাগ করে সংসারের মধ্যে চলে এলেন এদের সেবাব্রত নিয়ে। প্রথম তিনি ভার নিলেন টিটোর শিক্ষার। ক্যাস্টেলিয়ায় জ্ঞান ও ধর্মের চর্চা হয় সমাজ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে; কিন্তু সমাজ-কল্যাণকে মুখ্য করে টিটোর শিক্ষা হবে।

একদিন খুব ভোরবেলা ছাত্রকে নিয়ে জোসেফ হ্রদের ধারে বেড়াতে এসেছেন। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, সূর্যের মুখ তখনো ভালো করে দেখা যায় না; শুধু হ্রদের ওপারের পাহাড়ের চূড়া একটু রক্তিম হয়ে উঠেছে। চতুর্দিকের শান্ত সৌন্দর্য টিটোকে উচ্ছ্বসিত করে তুলল। সূর্য ওঠবার আগে সাঁতার দিয়ে হ্রদ পার হবার জন্য সে ঝাঁপ দিল জলে। জোসেফকেও কেমন ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসল; তিনিও টিটোর পাছে পাছে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলেন। কিছু দূর এগিয়ে জোসেফের দেহ অবশ হয়ে গেল, বরফগলা শীতল জলে তিনি ডুবে গেলেন।

জোসেফের মৃত্যু দিয়ে বইটিকে শেষ করা হয়েছে। টিটো তাঁর জ্ঞান ও সাধনার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবে, এই ইঙ্গিত পেয়ে আমরা সান্ত্বনা পাই। যে বেদনামণ্ডিত সৌন্দর্যের মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে তা পাঠকের মন অভিভূত করে। গল্পাংশে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বড় হয়ে ওঠেনি; জোসেফ ক্লেখ্‌টের মানসিক বিবর্তনের সূক্ষ্ম চিত্রটাই উপভোগ্য।

জোসেফের মৃত্যুর পরে তাঁর রচিত কতকগুলি কবিতা এবং তিনটি কাহিনী

পাওয়া গিয়েছিল। পরিশিষ্টে সেগুলো দেওয়া হয়েছে। ক্যাস্টেলিয়ায় ছাত্রদের পূর্বজন্মের কাল্পনিক কাহিনী রচনা করতে দেওয়া হত। জোসেফ তাঁর তিন জন্মের আত্মচরিত লিখেছিলেন। প্রথম জন্মে তাঁকে দেখতে পাই আদিম মানব সমাজের বৃষ্টির ওঝা হিসেবে। দ্বিতীয় জন্মে তিনি খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী। তৃতীয়বার তিনি পৃথিবীতে এসেছেন ভারতের এক রাজপুত্র হয়ে। তাঁর এই হিন্দু জন্মের কাহিনীটি সব চেয়ে সুন্দর।

গল্পটি এই: রাজপুত্র দাস অতি অল্প বয়সে মা'কে হারিয়ে বিমাতার বিরাগভাজন হল। নিজের ছেলেকে রাজা করবার অভিপ্রায়ে বিমাতা ওকে দূর করবার উপায় খুঁজতে লাগল। এক শুভার্থী ব্রাহ্মণ ওর প্রাণ সংশয় দেখে চুপি চুপি রাজপ্রাসাদের বাইরে এনে এক দল রাখালের হাতে দাসকে দিয়ে দিলেন। দাস তাদের সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠল। যৌবনে প্রভাতী নামে এক গৃহস্থের মেয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে সংসার পাতল দাস। এদিকে তার বৈমাত্রেয় ভাই নল রাজা হয়েছে। একদিন শিকারে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নল এসে উপস্থিত হল প্রভাতীর গ্রামে। নল প্রভাতীর রূপে আকৃষ্ট হল; রাজার অনুগ্রহ প্রভাতীও প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। দাস সব জানতে পেরে নলকে হত্যা করে বনে পালিয়ে গেল।

বনের মধ্যে এক তপস্বীর দেখা পেয়ে দাস তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'রাজপুত্র হয়েও আমি রাজ্য পেলাম না; প্রভাতীর যে ভালোবাসা ছিল আমার প্রাণ, তাও হারালাম। কেন এমন হল?'

যোগী একটু হেসে শুধু বললেন, 'মায়া! মায়া!'

দাস আবার প্রশ্ন করল, 'মায়া কি বুঝিয়ে বলুন।'

যোগী কথা না বলে জলের পাত্রটা তার হাতে দিয়ে ইঙ্গিত করলেন, 'জল নিয়ে এস।'

ঝর্ণা থেকে জল আনতে গিয়ে প্রভাতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রভাতী লোকজন সঙ্গে করে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে; প্রজারা দাসকে শূন্য সিংহাসনে বসাবে। প্রভাতীর বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে দাস তার সঙ্গে চলে গেল রাজধানীতে। আবার নতুন জীবন আরম্ভ হল; কত বিলাস, কত আয়োজন! প্রভাতীর শাড়ী অলঙ্কারের সাধ মিটল এতদিনে। একটি পুত্র পেয়ে তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হল।

কিছু কাল পরে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দিল। দাস

চায় সন্ধি, কিন্তু প্রভাতী চায় যুদ্ধ। সেনাপতির সঙ্গে প্রভাতীর অসঙ্গত অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করেছে দাস। বড় বেদনা বোধ করে; প্রভাতীর মধ্যে সে আগের মতো আনন্দ খুঁজে পায় না। প্রভাতীর রূপ তাকে মুগ্ধ করেছিল। ভুলে গিয়েছিল এই রূপের জন্য প্রভাতীর কোনো কৃতিত্ব নেই। রূপের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে রূপের আধারকে পুজা করেছে এতদিন। আজ তাই মোহমুক্তির বেদনা অনুভব করছে।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যেতে হল। পথে যেতে যেতে দাস নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন যুদ্ধে যাচ্ছি? কর্তব্যবোধ? প্রজাদের রক্ষা করা? না, সে সব কিছু নয়। মনের গভীর তলদেশে একটি শঙ্কা কাজ করছে, সে হচ্ছে পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কা। শত্রু রাজ্যে ঢুকে ছেলের যদি কোনো অমঙ্গল ঘটায় তাই আগে থাকতেই তাকে বাধা দিতে চলেছে।

যুদ্ধে দাস হেরে গেল; পুত্র নিহত হল শত্রুর হাতে। আহত স্বামী-স্ত্রীকে শত্রুরা বন্দী করল। মৃত পুত্র কোলে করে প্রভাতী বসে আছে; সে দৃশ্য দাস সহ্য করতে পারল না; অসহ্য যন্ত্রণায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছা ভাঙতেই দেখল সে বনে দাঁড়িয়ে আছে যোগীর জলপাত্র হাতে করে। এতক্ষণ যা কিছু আনন্দ-বেদনা অনুভব করল তা হচ্ছে যোগীর সৃষ্ট মায়ার খেলা। হোক মায়া, তবু যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে দাসের। স্ত্রী, সন্তান, সিংহাসন—কিছুর জন্যই তার আকাঙ্ক্ষা নেই। সে জয়, প্রতিহিংসা, সুখ কিছুই চায় না। আজ তার একমাত্র কামনা শান্তি। মৃত্যুর মধ্যে চরম শান্তি পাওয়া যায় না। মৃত্যু মূর্ছার মতো; প্রবল আঘাতের যন্ত্রণা মানুষ সাময়িকভাবে ভুলতে পারে মৃত্যুর সাহায্যে। আবার পরবর্তী জীবনে জেগে ওঠে সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণায়, অশেষ বেদনায়। জীবন-মৃত্যুর চির-ঘূর্ণমান চাকাটা থামিয়ে দিতে পারলে পাওয়া যাবে চরম শান্তি, হবে নির্বাণ লাভ। যোগীর শান্ত চোখের চাউনির মধ্যে দাস দেখতে পেল তার লক্ষ্যের ইঙ্গিত। সে যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

জোসেফ ক্লেখ্‌টের কাহিনী ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত। এখানে যে সব সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে তা বর্তমানকালের সমাজ বিজ্ঞানীদের অনুধাবনের যোগ্য। প্রধান পুরোহিতের জবানীতে হেসে আংশিকভাবে যে কথা বলতে চেয়েছেন তা তাঁর ইউটোপিয়া জাতীয় এক কাব্যে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়। গত পনেরো বছর যাবৎ তিনি এই কাব্য লিখছেন।

হেসের উপন্যাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তিনি বাস্তববাদী অথবা

মনোবিশ্লেষণধর্মী লেখক নন। তিনি স্থান, কাল ও পরিবেশ হুবহু ফুটিয়ে তোলবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর অতিবাস্তববাদী লেখকদের মতো খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে কাহিনীকে বাস্তবতার দলিলে পরিণত করবার আগ্রহও তাঁর নেই। জীবনের দ্বন্দ্ব এবং আদর্শের সংঘাত তিনি সূক্ষ্ম রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও তাঁর কাহিনীতে অলৌকিকের স্পর্শ আছে। কিন্তু রূপক কিংবা অবাস্তব স্বপ্নময় দু'একটি দৃশ্য ও ঘটনা কাহিনীকে আচ্ছন্ন করেনি। তথাপি রচনার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি টমাস মান বা আঁদ্রে জিদের মতো জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

বর্তমান সমাজকে হেসে উপেক্ষা করেন নি। সমকালীন য়ুরোপের ফ্যাসিস্ট মানসিকতার তীব্র সমালোচনা পাই তাঁর অনেক রচনায়। জোসেফ ক্নেখট রুদ্ধদ্বার কক্ষে যোগাভ্যাস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল সমাজের কল্যাণ-কামনায়। এদিক থেকে বিচার করলে হেসে যে সমাজ-সচেতন লেখক সে কথা স্বীকার করতে হবে। তবে তাঁর দৃষ্টি উপর তলার সমাজের উপরেই প্রধানত নিবদ্ধ। হেসের নায়করা প্রায় সকলেই বুদ্ধিজীবী; লেখক, চিত্রশিল্পী বা সঙ্গীতশিল্পী। টমাস মানের মতো হেসের শিল্পী-নায়কদের সঙ্গে সাংসারিক জীবনের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধই কয়েকটি কাহিনীর উপজীব্য।

হেসের কবিখ্যাতিও কম নয়। প্রথম উপন্যাস বের হবার পর বৎসরই তাঁর কবিতার বই প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে কবিতা লিখেছেন এবং আজ তাদের মোট সংখ্যা তিন হাজারেরও উপর। হেসে নিজে সঙ্গীতজ্ঞ এবং চিত্রশিল্পী; তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে এই দু'টি শিল্পের সমস্যাকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে হেসের কবিতা প্রধানত স্বরধর্মী ও চিত্রধর্মী। তাঁর অনেক কবিতা গান হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হেসের অন্যান্য রচনার মতো কাব্যের মধ্যেও গূঢ় তত্ত্বকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি কবিতার ভাবানুবাদ দেওয়া হল:

কুয়াশার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে অদ্ভুত লাগে!
পাথর, ঝোপ-জঙ্গল নিঃসঙ্গ, নির্জন;
গাছপালা দেখা যায় না,
সবাই একাকী, নিঃসঙ্গ।

একদিন পৃথিবী ছিল বান্ধবে পূর্ণ,
জীবন ছিল আনন্দে ভরা ;
এখন নামছে কুয়াশা,
তাই বুঝি কেউ কাছে নেই।
সত্যি, কেউ জ্ঞানী নয়
অন্ধকার যাকে গ্রাস করেনি ;
নিয়তির আকর্ষণে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে
ছেড়ে যাই আর সবাইকে।
তুষারসিক্ত কুয়াশায় পথ খুঁজি,
অনুভব করি শুধু নিজের হৃদ্‌স্পন্দন,
অন্যকে জানবার সুযোগ কই ?
আমরা সবাই একা।

জীবনের সূর্যকে ঢেকে যখন মৃত্যুর কুয়াশা নেমে আসে তখন হঠাৎ উপলব্ধি করি এতদিন যাদের সঙ্গে কাটল তারা কেউ সঙ্গে যাবে না, এবার যাত্রা করতে হবে একা।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

১৮৯৮—

লেখকের কাজ কী? হেমিংওয়ে বলেছেন, লেখক হিসাবে তাঁর কাজ হল 'to put down what I see and what I feel in the best and simplest way I can tell it.'

এই উক্তির মধ্যে দু'টি কথা আছে। প্রথমতঃ, তাঁর কাহিনীগুলি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত; নিজে যা দেখেন নি, অথবা উপলব্ধি করেন নি, তা তিনি রচনার মধ্যে স্থান দেননি। দ্বিতীয় কথা হল ভাষা সম্বন্ধে হেমিংওয়ের আদর্শ। বক্তব্য যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করে বলাই তাঁর উদ্দেশ্য। হেমিংওয়ের গল্প-উপন্যাস এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

হেমিংওয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক। কল্পনা-ভিত্তিক রচনায় তাঁর আগ্রহ নেই। অথবা, বাস্তববাদী লেখকরা যেমন ঐতিহাসিক কিংবা সমাজতাত্ত্বিক দলিলের সাহায্যে কাহিনী রচনা করেন হেমিংওয়ের সে পদ্ধতি নয়। জীবনের যে দিকটার সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে তাই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। হেমিংওয়ের রচনা তাঁর জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। শুধু অন্তর্জীবনের প্রতি-ফলন নয়; সে তো সকল সাহিত্যিকের পক্ষেই সত্য। আর কত বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা! নানা দেশ, নানা ঘটনা, নতুন নতুন পরিস্থিতি, জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা অসংখ্য চরিত্র! প্যারিসের নির্বাসিত জীবন, যুদ্ধ, ষাঁড়ের লড়াই, শিকার প্রভৃতির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে হেমিংওয়ের গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। শুধু ঘটনার অভিজ্ঞতা নয়; হেমিংওয়ে যে-সব জায়গায় কিছুকালের জন্য বাস করেছেন তারা তাঁর কাহিনীর পটভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমেরিকা ছাড়া প্যারিস, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, আফ্রিকা, কিউবা প্রভৃতি যে-সব অঞ্চলে তিনি বাস করেছেন তাদের কোনো-না-কোনো গল্প উপন্যাসের পটভূমিতে পাওয়া যাবে। বিদেশের এই অপরিচিত পরিবেশ আমেরিকান পাঠকের নিকট আকর্ষণের বস্তু।

হেমিংওয়ে একান্তরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক বলেই তাঁর হাতে নারীচরিত্র

জীবন্ত হবার সুযোগ পায়নি। হেমিংওয়ের রচনায় পুরুষ চরিত্রেরই প্রাধান্য। বুদ্ধির দীপ্তিতে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোনো নারী-চরিত্রেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। পুরুষ মেয়েদের যে ভাবে দেখতে চায় মেয়েরা সে ভাবেই হেমিংওয়ের কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছে। অনেকে বলেছেন, হেমিংওয়ে নারী-বিদ্বেষী। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে তাঁর বিদ্বেষ প্রধানত আমেরিকান নারীদের বিরুদ্ধে। এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে, মার্কিন পুরুষদের নির্বীর্য করে সেখানকার নারীরা পুরুষের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করছে। আর একটি কারণ এদের চরম কৃত্রিম জীবন-যাপন। 'দি ফিফথ্ কলামের' মূর বালিকা অ্যানিটা বলছে : Put the paint in the body instead of blood. What you get ? American woman. রক্তের বদলে কিছু প্রসাধন সামগ্রী ইনজেকশান করে দিলেই মার্কিন নারী পাওয়া যাবে। 'ফর হুম দি বেল টলস্' এবং 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিও হয় পুরুষালি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত অথবা তারা পুরুষের যৌনলালসার প্রতীক।

হেমিংওয়ে সহজ, সরল স্বাভাবিক জীবনের সমর্থক। এই আদর্শের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর ভাষাও হয়েছে আশ্চর্যরূপে সরল ও স্পষ্ট, তথাপি জোরালো ও বেগবান। তরতর করে সে ভাষা বয়ে চলে। তাঁর রচনাশৈলী আমেরিকান সাহিত্যে বিপ্লব এনেছে। এ সম্বন্ধে তাঁর মত জানা যাবে নিচের উদ্ধৃতাংশ থেকে :

If a man writes clearly enough any one can see if he fakes. If he mystifies to avoid a straight statement, which is very different from breaking so-called rules of syntax or grammar to make an effect which can be obtained in no other way, the writer takes a longer time to be known as a fake and other writers who are afflicted by the same necessity will praise him in their own defence. (Death in the Afternoon).

অর্থাৎ, সরল ভাষায় লিখলে লেখকের মধ্যে কোনো ফাঁকি থাকলে সহজেই ধরা পড়ে। ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে রচনার অন্তঃসারশূন্যতা কিছুকালের জন্য ঢেকে রাখা যায়।

'কানসাস সিটি স্টার' পত্রিকায় হেমিংওয়ে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে সরল ভাষায় লেখা অভ্যাস করতে হয়েছিল। সকল বাহুল্য বর্জন করে অল্প পরিসরে বেশি কথা বলবার সাধনা ছিল তাঁর। প্রথম জীবনের এই অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের রচনা-শৈলীকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্যারিসে যখন ছিলেন তখন 'লস্ট জেনারেশানের' নেত্রী গারট্রুড স্টেইনের রচনার প্রভাবও পড়েছে তাঁর উপর।

হেমিংওয়ের কাহিনী কত নাটকীয় ঘটনা, মর্মস্পর্শী বেদনা এবং হিংস্রতায় পূর্ণ। কিন্তু তাঁর ভাষায় কোনো ক্ষোভ প্রকাশ পায়নি। তিনি নির্বিকার দর্শকের মতো কাহিনীর পট উন্মোচন করেছেন; লেখক মন্তব্য করেন না, বেদনার গভীর অনুভূতি কান্নায় হারিয়ে যায় না। আশ্চর্য তাঁর সংযম। হেমিংওয়ের ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্য, এখানেই তাঁর শক্তি।

হেমিংওয়ের উপন্যাসের রচনাশৈলীর দু'টি ধারা লক্ষণীয়। লেখক নিজে যেখানে গল্প বলছেন সেখানে ভাষা প্রয়োগে আছে মিতব্যয়িতা; পর পর ছবি সাজিয়ে ছোট ছোট বাক্যে গল্প বলেন তিনি। মনে হয় যেন গদ্য কবিতা পড়ছি। দ্বিতীয়টি হল তাঁর সুন্দর সংলাপ। পড়তে পড়তে মনে হবে যেন পাত্র-পাত্রীদের কথা কানে শুনতে পাচ্ছি। লেখক এখানে পশ্চাতে থাকেন। তাঁর উপস্থিতিটা অনুভব করা যায় না। পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ এবং লেখকের গল্প দুই পৃথক রচনাশৈলী আশ্রয় করে লিখিত বলে কাহিনী একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত।

১৮৯৮ সালের ২১শে জুলাই Ernest Miller Hemingway জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে হেমিংওয়ে তাঁর নামের 'মিলার' অংশটি বর্জন করেন। প্রথম দিকে প্রকাশিত বইগুলিতে পুরো নামই ব্যবহার করা হয়েছে। হেমিংওয়ের বাবা ছিলেন ডাক্তার ও নামকরা শিকারী। ডাক্তার রোগীর বাড়ি যাবার সময় মাঝে মাঝে শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতার ছাপ কিছু কিছু দেখা যাবে হেমিংওয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ In Our Time-এ। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হবে, মা ছেলেকে করতে চেয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী। দু'জনের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে হেমিংওয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ে অতি সাধারণ ছাত্রের মতো যাতায়াত করতে লাগলেন। ওখানে পড়ার উন্নতি হবার আশা নেই দেখে তাঁকে পাঠানো হল প্যারিসের স্কুলে।

সেখানেও সুবিধা হল না। বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল। যখন পনের বছর বয়স তখন হেমিংওয়ে একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পাঠ্য-পুস্তকের চেয়ে তাঁর ভালো লাগত শিকার। বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই গুণটি। ছেলের শিকার-প্রীতি পিতার ভালো লেগেছিল। হেমিংওয়ের বয়স যখন মাত্র দশ, তখন বাবার কাছ থেকে তিনি একটি বন্দুক উপহার পেয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে হেমিংওয়ে 'কানসাস্ সিটি স্টার' পত্রিকার রিপোর্টারের চাকরি আরম্ভ করলেন। কয়েক মাস পরেই এ কাজ ছেড়ে চলে গেলেন ইতালী। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালী তখন বিপর্যস্ত। হেমিংওয়ে ইতালীর পদাতিক বাহিনীতে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাজ নিলেন। যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। তার ফলে এখনো প্ল্যাটিনামের জানুস্ত্রাণ (Knee Cap) ব্যতীত চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁর দেহের সর্বত্র গুলির চিহ্নও দেখা যায়। এই যুদ্ধের প্রভাব হেমিংওয়ের জীবন ও রচনাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। Farewell to Arms ইতালিয়ান যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। ১৯১৯ সালে হেমিংওয়ে তাঁর ছেলেবেলার বান্ধবী হ্যাড্‌লি রিচার্ডসনকে বিয়ে করেন। পর বৎসরই তিনি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ নিয়ে তুরস্কে যান। বেশিদিন এ কাজ ভালো না লাগায় ১৯২১ সালে হেমিংওয়ে প্যারিসে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্রের জন্য রিপোর্ট অথবা সাময়িক-পত্রের জন্য কয়েকটি গল্প ছাড়া তিনি এ পর্যন্ত আর কিছু লেখেন নি। প্যারিসে এজরা পাউণ্ড ও গারট্রুড স্টেইন্-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে হেমিংওয়ের জীবনে নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে এঁদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলেও হেমিংওয়ের সাহিত্যিক জীবনের সূচনায় এই দু'জনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ঐ সময় আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ থেকে একদল তরুণ-তরুণী এসে প্যারিসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা অনেকেই দেশ থেকে বিতাড়িত। যে উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে প্রথম মহাযুদ্ধে হাজার হাজার তরুণ প্রাণ দিয়েছে, দুঃখ-কষ্ট সয়েছে, যুদ্ধের পরে দেখা গেল সে আদর্শের কোনো মূল্য নেই। যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও সমাজ-ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হল না, জীবনে এল না শান্তি। বরং আরো খারাপ হল। চোখের সম্মুখ থেকে আশার নিশানাটা হারিয়ে গেল। যুদ্ধের ক'বছরে যারা যৌবনে পা দিয়েছে তাদের যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে, দেহ পঙ্গু হয়েছে, তাদের ঘর ভেঙেছে, আর ভেঙেছে ভবিষ্যতের সকল স্বপ্ন। এই

আঘাতে এরা হয়ে পড়ল জীবন-বিদ্বেষী, উৎকেন্দ্রিক; নীতি ও ধর্মের উপরে আস্থা হারালো। শান্তি খুঁজল নারী ও সুরার মধ্যে। যুদ্ধকালে এই ছন্নছাড়া তরুণের দলকে স্টেইন নাম দিয়েছিলেন 'লস্ট জেনারেশান'। প্যারিসে 'লস্ট জেনারেশানের' ছিল সব চেয়ে বড় আড্ডা। হেমিংওয়ে এই দলে যোগ দিলেন। তাঁর প্রথম চারখানা বই এই দলের চিন্তাধারায় পুষ্ট এবং ভাবাবেগ প্রবণ। হেমিংওয়ের প্রথম সফল উপন্যাস The Sun Also Rises 'লস্ট জেনারেশানের' কয়েকজন লেখক ও শিল্পীর আলাপ-আলোচনার উপর ভিত্তি করে রচিত। তবু এই উপন্যাসটি একান্তরূপে দলীয় সঙ্কীর্ণতায় ভারাক্রান্ত নয়। এর মধ্যে সর্বজনীন আবেদনের যোগ্য সাহিত্যরস আছে; তাই 'দি সান অলসো রাইজেস্' প্রকাশিত হবার পর ঔপন্যাসিক হিসাবে হেমিংওয়ে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই উপন্যাস তাঁকে আকস্মিকভাবে খ্যাতিমান করে তুলল, তিনি নিজেই এতটা আশা করতে পারেন নি।

ছ' বছর পরে হেমিংওয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বিয়ে করলেন পলিনকে। এই পলিনের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে। মার্কিন লেখিকা মার্থা গেলহর্ন এখন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল। হেমিংওয়ে সেখানে গেলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়ে। স্পেনে পৌঁছে তিনি শুধু রিপোর্টার রইলেন না। তাঁর মন ডুবে গেল স্পেনের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই হেমিংওয়ের জীবন-দর্শনের প্রধান ভিত্তি রচনা করেছে। 'দি স্প্যানিশ আর্থ' নামক ফিল্মের ধারা-বিবরণী স্পেনে থাকতেই লিখেছেন। স্পেনের তৎকালীন জীবন নিয়ে হেমিংওয়ে তাঁর প্রথম নাটক 'দি ফিফ্থ কলাম' রচনা করেছেন দু' বছর পরে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টলস্' স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' ইতালীর যুদ্ধের পটভূমিকায় এক বৃটিশ নার্স ও আমেরিকান সৈন্যের প্রেমের কাহিনী। 'ফর হুম দি বেল টলস্'-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগদানকারী এক আমেরিকান স্বেচ্ছাসৈনিকের মাত্র চারদিনের বিপদসঙ্কুল প্রেম এবং তার পরে মৃত্যুর গল্প বলা হয়েছে। 'Men Without Women'-এ হেমিংওয়ে স্পেনের দস্যু এবং ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা যাদের পেশা তাদের কথা বলেছেন। 'Death in the Afternoon'-এ ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের কৌশল বর্ণনা করা

হয়েছে, আর আছে ষাঁড়ের লড়াইয়ের ইতিহাস। সুতরাং দেখা যাবে যে, স্পেন হেমিংওয়ের রচনাকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। স্পেনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ যে কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আর একটি ঘটনা থেকে। নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ পেয়ে হেমিংওয়ে বললেন যে, এ পুরস্কার আমাকে দেওয়া না হলে অন্য তিন জনকে দেওয়া যেতে পারত। এই তিনজনের মধ্যে তাঁর প্রথম সুপারিশই ছিল Karen Von Blix নামক স্প্যানিশ লেখকের জন্য। ইনি Isaac Dinesen ছদ্মনাম নিয়ে লেখেন।

যুদ্ধের প্রতি হেমিংওয়ের একটা অনিবার্য আকর্ষণ আছে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তিনি রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছেন। এবারকার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন Across the River and Into the Sea. যুদ্ধের বিষ মানুষের জীবন যে কিরূপ অসহনীয় করে তোলে তা কর্নেল ক্যান্টওয়েলের কাহিনী থেকে দেখা যাবে। ১৯৫২ সালে হেমিংওয়ে The Old Man and the Sea লিখে পুলিটজার পুরস্কার পান।

হেমিংওয়ের মতো জীবন-বিলাসী লেখক এ যুগে বিরল। শারীরিক শক্তি ও পৌরুষের তিনি পুজারী। মানসিকতার দোহাই দিয়ে দেহকে তিনি কখনো অস্বীকার করেন নি। এই জন্যই ষাঁড়ের লড়াই তাঁকে মুগ্ধ করে। এর মধ্যে তিনি দেখতে পান শক্তির বিকাশ। তিনি নিজে সরল ও দীর্ঘকায়; আমেরিকানদের চোখে তাঁর গায়ের রঙ একটু ময়লা। বিপদসঙ্কুল শিকার, মাছ ধরা এবং মুষ্টিযুদ্ধ হেমিংওয়ের চিত্ত-বিনোদনের প্রিয় পন্থা। কিছুকাল যাবৎ অবশ্য মুষ্টিযুদ্ধের শখ ত্যাগ করতে হয়েছে। হেমিংওয়ের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। 'ফর হুম দি বেল টলস্'-এর গ্যালি প্রুফ পেয়ে ৯৬ ঘণ্টা ধরে ক্রমান্বয়ে প্রুফ দেখেছেন, ঐ সময়ের মধ্যে নিজের ঘর থেকে একবার বের পর্যন্ত হননি।

হেমিংওয়ে থাকেন একজন ছোটখাটো রাজার হালে। কিউবায় পনেরো অ্যাকার বিস্তৃত জমির উপর তাঁর বাড়ি। সেখানে বাগান, সাঁতার কাটবার পুকুর, টেনিস কোর্ট আছে। আর আছে একটি উঁচু টাওয়ার,—তার উপরে হেমিংওয়ের পড়বার ঘর। তাঁর শোবার ঘর ষাট ফুট লম্বা, দু'পাশে নানা ধরনের পশুর মাথা সাজানো। তাঁর বাড়িতে ভবঘুরে, ভিখিরি, ফিল্ম স্টার, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অতিথি সব সময়ই আছে। তিনি তাদের ডেকে আনেন; কতদিন থাকবে তা কেউ জানে না।

এই জঙ্গী সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে আমেরিকার জনসাধারণের কৌতূহলের শেষ নেই। হেমিংওয়ে গম্ভীর প্রকৃতির লোক; ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি সর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখেন। তাই কৌতূহল তৃপ্ত না হয়ে আরো বাড়ে। ম্যাক্স ঈস্টম্যানের সঙ্গে একটি বইয়ের সমালোচনা নিয়ে হাতাহাতি হয়েছে, হেমিংওয়ের নীরবতার জন্য এই গুজবের সত্যতা নির্ণয় করা যায়নি।

হেমিংওয়ে পৌরুষের পূজারী হলেও কুসংস্কারকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। প্রত্যেক ভালো কাজ আরম্ভ করার আগে সুলক্ষণ কুলক্ষণগুলি তিনি মিলিয়ে দেখেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর লক্ষণের জাত বিচারে কিছু ত্রুটি থাকবার ফলে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে দু'বার বিমান ভেঙে পড়ে সস্ত্রীক প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। এর পূর্বেও তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে এসে Green Hills of Africa লিখেছেন। আমেরিকার Look ম্যাগাজিনের জন্য কতকগুলি ধারাবাহিক শিকার প্রবন্ধ লেখবার জন্য হেমিংওয়ে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। বিমান দুর্ঘটনার ফলে তাঁর লিভার ও কিড্‌নী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথম যৌবনে যুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। যুদ্ধের সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সৈন্যদের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে জোর করে দমন করবার ফলে চরিত্র বিকৃতি। হাজার হাজার তরুণকে অকারণে নিরুপায়ভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া য়ুরোপ''আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনও কৃত্রিমতায় ভারাক্রান্ত। সহজ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দমন করে সভ্য সমাজে বাস করতে হয়। এই দমিত ঈপ্সার তাড়নায় কেউ সুরা, কেউ বা যৌনবিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সহজ, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়াতেই মানুষের মুক্তি, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা। এই বিশ্বাস হেমিংওয়ে ফ্রয়েডের কাছ থেকে পাননি; পেয়েছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। হেমিংওয়ে নিজে স্বাভাবিক আদিম জীবনের স্বাদ পাবার জন্য মাঝে মাঝে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, অথবা অন্য কোনো লোকবিরল অঞ্চলে বেড়াতে যান। তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রও হঠাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে নতুন জীবনের সন্ধানে অরণ্যে বা পর্বতে চলে যায়।

স্বাভাবিক অভীপ্সা পুরণ করবার মতো সামাজিক অবস্থা এলেই মানুষের

দুঃখ দূর হবে। কিন্তু সব ইচ্ছাই কি পুরণ করবার অধিকার থাকা সঙ্গত? হেমিংওয়ে তা বলেন না। যে ইচ্ছা পুরণ করবার পর মন গ্লানিতে ভরে ওঠে না, সে ইচ্ছাই সঙ্গত। ষাঁড়ের লড়াই দেখবার আকাঙ্ক্ষা সঙ্গত, কারণ দর্শকরা আনন্দ পায়, মনের কোণে গ্লানি জমে না। সমাজে কোনো নিয়ম-কানুন থাকবে না, এ কথা হেমিংওয়ে বলেন না। নিয়ম থাকবে; তা হবে একটা ক্লাবের নিয়মের মতো। স্বেচ্ছায় মেনে চলবে, কেউ জোর করে চাপিয়ে দেবে না।

হেমিংওয়ের সকল রচনাই মৃত্যুর ছায়ায় ম্লান। পাঠক প্রথম থেকেই সচেতন হয় মৃত্যু অনিবার্য গতিতে আসছে এগিয়ে। মৃত্যুর সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম করে টিঁকে থাকার নামই জীবন। এ জন্য চাই পৌরুষ, চাই বীর্য। তাই হেমিংওয়ে দেহের শক্তিকে বড় করে দেখেছেন। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই তাঁর কাছে জীবনের প্রতীক। ক্রুদ্ধ ষাঁড় শিং বাঁকিয়ে মৃত্যুর মতো এগিয়ে আসে আঘাত করতে; মাতাদোর (ষাঁড়ের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে) প্রাণপণ শক্তিতে তাকে বাধা দিয়ে জয়ী হতে চায়। মাতাদোর যে সাহস নিয়ে লড়াই করে আমাদেরও মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

হেমিংওয়ের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নেই। কেননা, রাজনীতির চেয়ে মানুষ তাঁর কাছে বড়। একনায়কত্ব এবং গণতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ তিনি দেখতে পাননি। কারণ, যে মানুষের দেহ ও মন উপবাসী, একটা নিছক রাজনৈতিক আদর্শ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সাধারণ মানুষ কঠোর আঘাত না পেলে রাজনীতির সঙ্গে কখনো তার জীবনকে জড়াতে চায়না। হেমিংওয়ের রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে তর্ক উঠেছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে রাজনীতি কখনো প্রাধান্য করেনি। To Have and Have Not তাঁর একমাত্র বই, যেখানে রাজনীতির কথা আছে।

হেমিংওয়ে আমেরিকান হলেও তাঁর অধিকাংশ কাহিনী বিদেশী পটভূমিকায় রচিত। আমেরিকার বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি সুযোগ পেলেই আঘাত করেছেন। এর প্রতিশোধ হিসাবে আমেরিকার সমালোচকরা দীর্ঘকাল তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি। হেমিংওয়ের রচনা অশ্লীল, নিরাশাবাদী ও মানবতা-বিরোধী বলে একদল সমালোচক প্রচার করেছে; কিন্তু সমালোচকের তিক্ততা সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে তাঁর রচনার মাধুর্য ঢেকে রাখতে পারেনি। হেমিংওয়ের উপন্যাসে সত্যিকার গল্প ও সংঘাত আছে, যা একালের অনেক লেখকের রচনায় থাকে না। তিনি ওস্তাদ গল্পকার এবং

ভাষার যাদুকর। আমেরিকান কথা-সাহিত্যের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই পাঠকদের মন আকৃষ্ট করেছে। ১৯৪৪ সালে বিখ্যাত সাহিত্য-পত্র 'স্যাটারডে রিভিউ অব লিটারেচার' আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ফলে দেখা গেল যে, হেমিংওয়ে পেয়েছেন সব চেয়ে বেশি ভোট। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ সালে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টলস্' প্রকাশিত হবার পর সমালোচকের বিরূপতা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইংরেজী উপন্যাসের ধারা যখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল তখন হেমিংওয়ে এনে দিয়েছেন নতুন গতি। আমেরিকান নবীন সাহিত্যকদের তাঁর রচনা যেরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে, অন্য কারো সাহিত্যাদর্শ তা পারেনি।

১৯২৬ সালে প্রথম উপন্যাস The Sun Also Rises প্রকাশিত হবার পর হেমিংওয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল দেখে য়ুরোপ-আমেরিকার কয়েকজন তরুণ-তরুণী জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে প্যারিসে বাস করছে। এদের নিয়েই উপন্যাসের কাহিনী। নায়িকা লেডি ব্রেট অ্যাশলি বিবাহ-বিচ্ছেদের চরম আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। আদালতের পাকাপাকি আদেশ পেলেই মাইকেল ক্যাম্বেলকে বিয়ে করবে। আমেরিকান জেক বার্নেস ইতালীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধে আহত হয়ে সে পুরুষত্ব হারিয়েছে। জেকের মাছ ধরার সঙ্গী বিল গর্টন; ইহুদী ঔপন্যাসিক রবার্ট কন এবং তার প্রণয়িনী ফ্রান্সেন ক্লাইনও আছে এই দলে। ব্রেট নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে ক্যাম্বেলকে গ্রহণ করেছে; কিন্তু তাতেও তার তৃপ্তি নেই। আবার সে ঝুঁকেছে কনের দিকে। ব্রেট, ক্যাম্বেল ও কনের ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব কাহিনীর একটি প্রধান অংশ।

ষাঁড়ের লড়াই দেখবার জন্য ওরা সবাই এল স্পেন-এ। এখানে ব্রেট মুগ্ধ হল পেদ্রো রোমেরোর শৌর্য দেখে। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা রোমেরোর পেশা। ব্রেট তার প্রতি এমন গভীররূপে আকৃষ্ট হল যে দলের সবাই ভাবল সে বুঝি রোমেরোকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবে। কিন্তু সেই খেয়ালী তরুণীর কি মনে হল কে জানে! কিছুদিন পরে সে রোমেরোকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ক্যাম্বেলকে বিয়ে করাই সিদ্ধান্ত করল। গৃহকোণে রোমেরোর জীবন হবে মৃতপ্রায়। ষাঁড়ের সঙ্গে বিপদসঙ্কুল সংগ্রামের মত্ততাই তার জীবন; যে প্রাঙ্গণে জীবন-মৃত্যুর সমান অধিকার সেখানেই হবে তার প্রতিষ্ঠা। তাই

ব্রেট রোমেরোকে সঙ্কীর্ণ পারিবারিক জীবনে বন্দী না করে মুক্তি দিয়ে গেল।

'দি সান অলসো রাইজেস' যুদ্ধোত্তর কালের 'লস্ট জেনারেশানের' ছবিই শুধু নয়। আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটি যুবসমাজের গভীর জীবন-বিদ্বেষের দলিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পের পশ্চাতে একটি বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে বিল ও জেকই চরিত্রবান ও স্বাভাবিক মানুষ। মহৎ আদর্শ এবং সহানুভূতি ও মানব-প্রীতির প্রতীক জেক বার্ণেস। যুদ্ধের আঘাত তাকে ক্লীব করেছে। সঙ্গীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবার পূর্ণ ক্ষমতা তার নেই। তেমনি যুদ্ধ মানুষের শুভবুদ্ধি, আদর্শবাদ এবং সহানুভূতি নিষ্ক্রিয় করেছে।

তিন বছর পরে প্রকাশিত হয় আত্মজীবনীমূলক বিয়োগান্ত উপন্যাস A Farewell to Arms. নায়ক ফ্রেডারিক হেনরি জাতিতে আমেরিকান। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালিয়ান অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে সে যোগ দিয়েছে। এখানে পরিচয় হল ইংরেজ নার্স ক্যাথেরিন বার্কলির সঙ্গে। যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে হেনরি হাসপাতালে আসবার পর থেকে সে পরিচয় নিবিড় হল। ক্যাথেরিন প্রাণ দিয়ে সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুলল। তারা পরস্পরকে ভালোবেসেছে। যুদ্ধের পরিবেশে তারা নিরাশাবাদী হয়ে উঠেছিল ; ভালোবাসা এনে দিল জীবনের নতুন অর্থ।

ইতালিয়ান বাহিনী শত্রুর হাতে বিপর্যস্ত। জয়ের আশা নেই। প্রাণ বিপন্ন করে ওরা দু'জন পালিয়ে এল সুইজারল্যাণ্ডে। পাহাড়ের উপরে কিছুকাল স্বপ্নের মতো কেটে গেল। আনন্দের এমন পরিপূর্ণ আস্বাদ পূর্বে কখনো তারা পায়নি। কিন্তু অকস্মাৎ এল রূঢ় আঘাত। সন্তান জন্ম দিতে ক্যাথেরিন মারা গেল ; সন্তানও বাঁচল না। হেনরির জীবন আবার মরুভূমির মতো শূন্য হয়ে গেল।

মিলনের আয়োজন যখন সকল দিক থেকে পূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন এমন শোকাবহ পরিস্থিতিতে হেমিংওয়ে তাঁর কাহিনী সমাপ্ত করলেন কেন ? হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ এমনই ভয়ঙ্কর তার ছায়ায় কারো জীবনই সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে দূরে গেলেও তার অভিশাপ থেকে নিস্তার নেই।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে হেমিংওয়ে লিখেছেন For

Whom the Bell Tolls (১৯৪০)। আমেরিকান শিক্ষক রবার্ট জর্ডান স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্পেন-এ এসেছে লয়ালিস্টদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য। এখানে আলাপ হল মারিয়ার সঙ্গে। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে তাকে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে রবার্টের সঙ্গে দেখা হবার আগে। এই লাঞ্ছনার পরে মারিয়ার মনে হয়েছিল, আর বেঁচে থেকে লাভ কী? রবার্ট দূর করল তার হতাশা; আবার বাঁচবার স্পৃহা জাগল তার মনে। যুদ্ধ শেষ হলে সে রবার্টের সঙ্গে আমেরিকা যাবে, সেখানে তারা দু'জনে ঘর বাঁধবে। কিন্তু তাদের স্বপ্ন সফল হল না। একটা পুল উড়িয়ে দিতে গিয়ে রবার্টের মৃত্যু হল।

হেমিংওয়ে এখানেও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়েছেন। স্বাধীনতার আদর্শ যে দেশ ও জাতির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না তার দৃষ্টান্ত রবার্ট। সে নিজের দেশ ত্যাগ করে স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষা করবার জন্য সুদূর স্পেনে এসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি।

উপরে আমরা হেমিংওয়ের তিনটি প্রধান উপন্যাসের কথা আলোচনা করেছি। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের বৈশিষ্ট্য এই তিনটি উপন্যাসে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান।

হেমিংওয়ের সবগুলি উপন্যাসই এক সূত্রে গাঁথা। পরবর্তী কাহিনী ও চরিত্রগুলি পূর্ববর্তী কাহিনী ও চরিত্রের পূর্ণতর বিকাশ। কোনো কাহিনী বা চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে একা দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু The Old Man and the Sea. স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই উপন্যাসটি হেমিংওয়ের সাহিত্য-জীবনে নতুন অধ্যায় সংযোজনের ইঙ্গিত।

এক বৃদ্ধ জেলে বিরাট আকৃতির মার্লিন মাছ ধরেছে। সমুদ্রের জল থেকে তাকে টেনে তোলা সহজ কথা নয়। তিন দিন ধরে সংগ্রাম চলল। এই তিন দিনের কথাই গল্পের বিষয়বস্তু। বৃদ্ধ হলেও জেলের মধ্যে শক্তির বিকাশ আছে, এই শক্তি দিয়েই শেষ পর্যন্ত মাছটাকে পরাভূত করা হল। কিন্তু পূর্বের মতো হেমিংওয়ে এখানে মানুষের দৈহিক শক্তির গর্ব প্রকাশ করেন নি। তিনদিন ক্রমাগত মাছটার সঙ্গে সংগ্রাম করে জেলে মাছটাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ঐ মার্লিন মাছটা প্রকৃতির ও প্রাণীজগতের সব কিছু মহত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক। বৃদ্ধ জেলে প্রকৃতির পশু-পাখির সঙ্গে একটা অখণ্ড যোগসূত্র অনুভব করল। ভালোবেসেছে বলেই সে মাছটাকে মেরেছে। কারণ, If you love him it is not a sin to kill him. মৃত্যু ভালোবাসার সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করতে

পারে। হেমিংওয়ের মৃত্যু এখানে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। মৃত্যু এখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যানুভূতির দ্বার স্বরূপ।

মাছটার সঙ্গে লড়াই করে করে বৃদ্ধ জেলে একবারও হতাশ হয়ে পড়েনি। লেখক বলছেন,—Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated···It is silly not to hope, he thought. Besides I believe it is a sin.

এই আশার বাণী হেমিংওয়ের সাহিত্যে এনেছে নতুন বাঁক। তিনি হতাশা ও মৃত্যুর কালো ছায়া থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন আশার সূর্যালোকে।

১৯৫৪ সালে হেমিংওয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নোবেল কমিটি তাঁর দান সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 'দি ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী-'র কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করেছেন: 'His vigorous art and the influence of his style on the literary art of our times as manifested recently in his book 'The Old Man and the sea···'

হেমিংওয়ে অনেকগুলি সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের রচনারীতি প্রায় এক রকম। The Snows of Kilimanjaro (1936) হেমিংওয়ের সব চেয়ে বৈশিষ্ট্যপুর্ণ ছোটগল্প। গল্পের শেষাংশে তিনি স্ট্রীম-অব-কনশাসনেস-এর পদ্ধতি ব্যবহার করছেন।

আমেরিকান লেখক হ্যারি আফ্রিকার দুরধিগম্য বনে শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। চিকিৎসার সুযোগ নেই, মৃত্যু সমাসন্ন। স্ত্রী সঙ্গে আছে। আহত হ্যারির দীর্ঘ কথোপকথন থেকে পশ্চাতের কাহিনী জানা গেল। হ্যারি অর্থের লোভে বিয়ে করেছে। পাছে অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয় এই ভয়ে নিজের আদর্শ ত্যাগ করে স্ত্রীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আর এই কারণে সে মনে মনে স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

ঘা দূষিত হয়ে হ্যারি মারা গেল। মৃত্যুর মুহূর্তে হ্যারি স্বপ্ন দেখল তার এক বন্ধু বিমানে করে তাকে সমতল ভূমি থেকে বরফ ঢাকা অত্যুচ্চ কিলিমাঞ্জারোর শিখরে নিয়ে এসেছে। পর্বত শিখর পবিত্রতা ও জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের প্রতীক।

'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মসে'ও আমরা দেখতে পাই পর্বতের উপরে এসে নায়ক-নায়িকা সুখের সন্ধান পেয়েছিল। সমতলভূমি দুঃখ, অশান্তি, সংগ্রাম ও

নীচতায় পূর্ণ। পাহাড়-পর্বতের শিখরে আছে শান্তি, সুখ ও উদারতা। মানুষের চরিত্রের যা-কিছু মহৎ তার সঙ্গে পর্বত-শিখরের আছে আত্মীয়তা।

হেমিংওয়ে প্রধানত তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাই দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারের সুযোগ নেই তাঁর। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী সে বিষয়ে পাঠক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন রচনাগুলি বিশ্লেষণী মন নিয়ে পাঠ করলে। ড্রেইজারের মতো হেমিংওয়ে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার সমর্থক। স্বাভাবিক জীবন-যাপন করলে মানুষ দুঃখের হাত এড়াতে পারে। তাঁর রচনায় কামোন্মাদনা এবং মানুষের চরিত্রহীনতার অনেক দৃশ্য আছে। কিন্তু মনের যে কোনো প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক নামাঙ্কিত করে তিনি সমর্থন করেন না। বিকৃত কামনা স্বাভাবিক নয়। দেহের সহজ কামনা সমর্থন করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে হেমিংওয়ের রচনায় কোনো সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন নেই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের তিনি কাহিনীকার। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যে জীবন তার সমস্যা তাঁর মন আলোড়িত করেনি, সে সমস্যা সমাধানের জন্য পথ নির্দেশ করবার দায়িত্বও তাঁর নয়। পূর্বেই বলেছি, হেমিংওয়ের নায়িকারা পুরুষের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আর তাঁর পুরুষ চরিত্র-গুলিও শিকার করে, মাছ ধরে, ষাঁড়ের লড়াই দেখে, আড্ডা দেয় এবং শখ বা পোশাকী আদর্শের তাড়নায় যুদ্ধ করে। তাদের জীবন-যাত্রায় বাধ্যবাধকতার কঠোরতা নেই। একমাত্র 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী-র' নায়ক এর ব্যতিক্রম। সে শখ করে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। মাছের সঙ্গে লড়াই করতে বৃদ্ধ জেলে যে সুদৃঢ় আশাবাদ ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তার মধ্যে মানব-চরিত্রের মহাকাব্যোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, সাবলীল ভাষা এবং আশ্চর্য রচনাকৌশল হেমিংওয়ের কাহিনীগুলির বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। আর কিছুর জন্য না হোক, নিপুণ গল্পকার এবং দক্ষ ভাষাশিল্পী হিসাবে হেমিংওয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

চার্লস ল্যাম

১৭৭৫—১৮৩৪

ব্যারিস্টার মিঃ স্যামুয়েল সল্টের কেরানী জন ল্যাম। শুধু কেরানী নয়, দরকার হলে চাপরাশির কাজও করতে হয়। হাসিমুখেই সব কাজ করেন ল্যাম। ব্যারিস্টারের ডান হাত। ক্ষুদ্রাকৃতি কৃশকায় মানুষ। পাখির মতো ছোট ছোট চোখ; উঁচু নাক সামনের দিকে বাঁকা হয়ে নেমেছে। কাজ করতে করতে কখনও গুনগুন করে গান করেন। কিছু কিছু পদ্য লেখারও হাত আছে। স্ত্রী এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর কোনো দিক থেকেই মিল নেই। এলিজাবেথের তুলনায় জন মাথায় এবং ব্যক্তিত্বে খাটো। বিবাহিত জীবনে এলিজাবেথের সুখ নেই। উঁচু স্তর থেকে স্বামীর সংসারে নিচু স্তরে নেমে এসেছেন। এখন আর উপায় নেই; তাঁর মনের ক্ষোভে সর্বদা সংসারে থমথমে ভাব বিরাজ করে।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এলিজাবেথের সর্বশেষ সন্তানের জন্ম হল। পুত্রসন্তান। বাঁচবে তো? সকলের মনে কেবল এই আশঙ্কা। ক্ষুদ্রকায় দুর্বল শিশু; শুধু চামড়া দিয়ে কাঠির মতো সরু সরু হাড় ক'খানা জুড়ে রাখা হয়েছে। সকলের আগে চোখে পড়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাথাটি। এর পূর্বে ছ'টি সন্তানের মধ্যে মাত্র দু'টি বেঁচে আছে—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। জন্ম থেকেই যার এমন স্বাস্থ্য তার বাঁচবার আশা কোথায়?

কিন্তু আশ্চর্য, সে বাঁচল। মায়ের তার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। মা ভালোবাসেন বড় ছেলেকে, কারণ সে মামাবাড়ির ধারা পেয়েছে। কিন্তু এই ছোট ছেলে পেয়েছে বাবার চেহারা; শীর্ণ তোবড়ানো দেহপিণ্ডের দিকে চাইলেই তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। পিসিমা সারা ল্যাম এবং দিদি মেরি এই শিশুর ভার গ্রহণ করল। পিসিমা ভাইয়ের সংসারেই আছেন; সংসারে তাঁর আর কোনো অবলম্বন নেই। দশ বছরের মেয়ে মেরিরও বাড়িতে সঙ্গী নেই; দাদা বোর্ডিংয়ে থেকে স্কুলে পড়ে। সুতরাং এ দু'জন শিশুকে মানুষ করবার দায়িত্ব পিসিমা সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। নামকরণের পূর্বে মৃত্যু হলে পাছে নরকবাস

করাতে হয় এই ভয়ে জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাড়াহুড়া করে নামকরণ করা হয়েছে। শিশুর নাম রাখা হয়েছে চার্লস, চার্লস ল্যাম।

চার্লস একটু একটু করে হাঁটতে শিখল। সরু সরু পা, বড় মাথা ; দেখতে লাটিমের মতো। দিদির পিছনে পিছনে ঘোরে ; কখনও বা পিসিমার কোলে বসে গল্প শোনে। চার্লস কথা বলতে শিখেছে অনেক দেরিতে। প্রথম প্রথম জড়ানো কথা শুনে সবাই ভেবেছে এটা আদুরে ছেলের ন্যাকামি। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল চার্লস তোতলা ; মাঝে মাঝে কথা বেশ আটকে যায়।

কথা বলতে বাধত ; এর ক্ষতিপুরণ হিসাবেই বোধ হয় চার্লস মাত্র পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে দ্রুত বই পড়তে শিখল। হাতের লেখাও ওই বয়সেই বেশ গোটা গোটা সুন্দর। এত অল্প বয়সে এমন লেখা ও পড়ার ক্ষমতা দেখে লোকে বিস্মিত হয়ে যেত। দিদি অবশ্য তাকে অধিকাংশ গল্পের বই পড়ে শোনাতো। ভাই বোনের অধিকাংশ সময় কাটত রূপকথার রাজ্যে। বিকেল-বেলায় পার্কে বেড়াতে যেত। পিসিমাও প্রায়ই তাদের সঙ্গী হতেন। দিদি আর পিসিমাকে নিয়েই তার জগৎ। বাবা ছিলেন একটু দূরে, মা আরও দূরে।

পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হতে তখনও কয়েকদিন বাকি আছে ; চার্লস অসুখে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, বসন্ত। তখনকার দিনে বসন্তকে মনে করা হত সাক্ষাৎ যম। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল সবাই। চার্লসের দাদা তখন স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল ; সে আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে গেল। সেবা করবে কে ? মা'র আগ্রহ নেই। দিদি আর পিসির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। জিত হল মেরির। এমন কঠোর পরিশ্রম বুড়ী পিসিমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেরির বয়স তখন মাত্র পনের। শুধু জীবনের আশঙ্কা নয়। আছে রূপ বিকৃত হবার ভয়। তার সমস্ত জীবন সামনে পড়ে আছে। বিকৃতরূপা তরুণীর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সম্ভাবনা এক মুহূর্তে মুছে যাবে। তবু সব কিছু উপেক্ষা করে মেরি প্রাণ দিয়ে সেবা শুরু করল। মেরি আর চার্লস বিভীষিকা, অস্পৃশ্য ; কিছুদিনের জন্য তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সংসার থেকে। যমে-মানুষে টানাটানি। সাতদিন ধরে চার্লস অজ্ঞান। ডাক্তারের কোনো আশা নেই। তবু আশ্চর্য, এমন ভঙ্গুর দেহে এমন দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি। চার্লস চোখ খুলল, উঠে বসল, বেঁচে গেল। আরও সৌভাগ্যের কথা, বসন্তের বিষ মেরিকে স্পর্শ করল না।

কিন্তু এর চেয়ে মারাত্মক বিষ প্রবেশ করেছে মেরির দেহে। একদিন অকস্মাৎ তা প্রকাশ পেল। মেরির বয়স তখন ষোল। চার্লসকে নিয়ে একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে দাঙ্গার সামনে পড়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে দাঙ্গা। লণ্ডনের প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গা চলেছে। মেরি ভয় পেয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। কিন্তু সম্পূর্ণ রক্ষা পেল না। এক দাঙ্গাবাজ মাতাল নির্জনতার সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করল মেরিকে। এক ভদ্রলোক এসে না পড়লে কী হত সেদিন বলা যায় না। তবু যতটা লাঞ্ছিত হয়েছে তার আঘাতেই মেরির মন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এক সপ্তাহ যাবৎ সে শয্যাশায়ী হয়ে রইল ; কথা ও ভাবনা অসংলগ্ন। প্রায় উন্মাদ। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে।

মেরির জীবনে এই প্রথম উন্মত্ততা। হয়ত পুরোপুরি নয়, কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া গেল। সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিল না। মা তো কথায় কথায় বলেন, পাগলের গোষ্ঠী। জন ল্যামের মাথায় ছিট আছে। বুড়ী পিসিমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তো সকলেরই সন্দেহ। বংশপরম্পরায় মেরির মধ্যেও যে পাগলামির বিষ আসতে পারে এমন আশঙ্কা কারও কারও মনে ছিল। প্রথম বার মেরি তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। কিন্তু তারপরে যতদিন বেঁচে ছিল ঘুরে ঘুরে রোগ এসেছে। প্রায় প্রত্যেক বছরই তাকে কিছু সময়ের জন্য পাগলা-গারদে থাকতে হয়েছে।

কয়েক মাস পরে মেরি চার্লসকে সঙ্গে করে দিদিমার কাছে ব্লেকসওয়ারে বেড়াতে গেল। দিদিমা জাঁদরেল মহিলা। মেয়ের বিয়ে ভালো ঘরে হয়নি বলে তাঁর মনে সর্বদা ক্ষোভ ছিল। চার্লসের চেহারা জামাইয়ের মতো হয়েছে দেখে তিনি বিরূপ মনে নাতিকে গ্রহণ করলেন। দিদিমার প্রতিবেশীর মেয়ে অ্যান সিমনস্ চার্লসের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠল। লণ্ডনের বাইরে চার্লসের এই প্রথম আসা। দিদিমা, অ্যান ও ব্লেকসওয়ার চার্লসের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী জীবনে চার্লস তাঁর রচনায় এদের অমর করেছেন।

লণ্ডনে ফিরে এসে চার্লস স্কুলে ভর্তি হল। কিছুকাল ছোট দু'টো স্কুলে কাটিয়ে চলে এল ক্রাইস্ট হসপিট্যাল বিদ্যালয়ে। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের নাম নানা কারণে অমর হয়ে আছে। এখানে চার্লসের সঙ্গে আলাপ হল কোলরিজের। আজীবন দু'জনের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিদ্যালয়ে

মোটা একটা বাঁধানো খাতা রাখা হত। যে সব ছাত্র ভাল লিখত শিক্ষক অনুমোদন করলে তাদের লেখা এই খাতায় স্থান লাভ করত। কোলরিজের কয়েকটি কবিতা আগেই স্থান পেয়েছে। চার্লস ভয়ে ভয়ে তারও কয়েকটি কবিতা শিক্ষককে দেখতে দিল। শিক্ষক কবিতা দেখে খুশি হলেন। একটি কবিতা স্কুলের খাতায় উঠল। চার্লসের লেখা এই প্রথম সমাদৃত হল।

কিন্তু চার্লসের স্কুলে থাকা আর সম্ভব হল না। বাবার পক্ষে একা সংসারের দায়িত্ব বহন করে পড়ার খরচ চালানো কঠিন। আর পড়েই বা কী হবে? এই তো স্বাস্থ্য, এই চেহারা; তার উপরে তোতলা। ভালো চাকরি পাবে না; ব্যারিস্টার, শিক্ষক বা পাদ্রি হতে পারবে না। সুতরাং এখনই চাকরি শুরু করা ভালো। দাদাও চাকরি করছে। বাবা তাঁর মনিবকে বলে চার্লসকে একটি চাকরি সংগ্রহ করে দিলেন। সওদাগরী আপিস 'সাউথ সী হাউসে' চাকরি। বেতন মাসে পঁচিশ টাকা। চার্লসের বয়স তখন পনের পূর্ণ হয়নি।

সাউথ সী হাউসের হিসাব-বিভাগে আঠারো মাস চাকরি হল। সকাল ন'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত আপিস। বাড়ি থেকে আপিস বেশ দূর। চার্লস দু' বেলা হেঁটেই যাতায়াত করত। হাঁটতে তার ভালো লাগে। পথে যত বইয়ের দোকান আছে, সকালে বিকেলে তাদের শো-কেস দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

এই কিশোর কেরানীকে আপিসের কর্তা স্নেহ করতেন। তাঁরই চেষ্টায় চার্লস ইণ্ডিয়া হাউসে একটি চাকরি পেল। সেখানে চাকরির ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভালো। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি পেলে তখন অনেকেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত।

নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কয়েক দিন বিলম্ব আছে। চার্লস এই ফাঁকে দিদিমার বাড়ি বেড়াতে এল। দশ বছর পরেও ব্লেকসওয়ার বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে অ্যান সিমনসের সঙ্গে দেখা হল। দশ বছর পূর্বে যে ছোট মেয়েটির সঙ্গে খেলা করেছে, সে এখন ষোল বছরের তরুণী। চার্লস তার চেয়ে বছরখানেকের বড়। অপরিচিত জায়গায় ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে নতুন করে পেয়ে খুব আনন্দ হল চার্লসের। দু'জনে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুত, গল্প করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অ্যানের মা তাকে বেশ যত্ন করতেন। চার্লস লণ্ডনের ছেলে হলেও অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায়নি। শহরের মেয়েরা চার্লসের মতো ছেলেকে আমল দেয় না। ওই তো

চেহারা! কাঠির মতো সরু সরু পা; বেমানান বড় মাথা; দূর থেকে লাটিমের মতো দেখতে, তার উপর তোতলা। এখানে অ্যানের কাছে চার্লসের আছে স্বতন্ত্র মূল্য। সে লণ্ডনের ছেলে, কাজ করে বড় আপিসে। তা ছাড়া অ্যানের হৃদয় মমতায় পূর্ণ, মফস্বলের প্রকৃতির মতো। চার্লস মুগ্ধ হল, আত্মবিস্মৃত হয়ে ভালোবাসল অ্যানকে। তার চেয়ে বড় কথা, লণ্ডনে ফিরে আসবার আগেই সে জেনে এল অ্যানও তাকে ভালোবাসে। দু'জনেই প্রতিশ্রুতি দিল তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে, কোনো বাধা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারবে না। বর্ষার জল যেমন শূন্য শুষ্ক খাল-বিল-পুকুর পূর্ণ করে দেয়, তেমনই ভালোবাসার বন্যা চার্লসের জীবনের সকল শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করে দিল।

এক বছর পরে মেরিকে নিয়ে চার্লস আবার বেড়াতে এল দিদিমার বাড়ি। এবার অ্যানের সঙ্গে চার্লসের ঘনিষ্ঠতা দিদিমার চোখে পড়ল। চার্লস ও অ্যানের সম্পর্ক আর এক ধাপ এগিয়েছে। চার্লস অ্যানকে বিয়ে করবে। চার্লস ও মেরি চলে যাবার পর অ্যানের মা-বাবা এলেন দিদিমার কাছে ওদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। দিদিমা বিস্মিত হয়ে বললেন, পাগলের বংশে মেয়ের বিয়ে দিতে চাও? তোমরাও কি পাগল হয়েছ? চার্লসের জ্যেঠামশাই পাগলা-গারদে মারা গেছে; ওর পিসিমা পাগল; বাবার মাথায় ছিট আছে। আর এই যে শান্ত মেয়ে মেরিকে দেখলে, কয়েক বছর আগে সেও পাগল হয়ে গিয়েছিল।

সিমনস্ দম্পতি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে, দিদিমার নির্মম সত্যপ্রীতির জন্য তাঁরা এমন ভয়াবহ খবরটা আগেই জানতে পেরেছেন।

ওদিকে লণ্ডন পৌঁছে চার্লস তার দিনলিপিতে লিখল: আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের সপ্তাহ কাটিয়ে এলাম। আজ মনে হয় কোনো মানুষেরই বুঝি এত সুখ পাবার অধিকার নেই। অ্যানকে ঘরে আনাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

লীডেন হল স্ট্রীটের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে চার্লসের নতুন চাকরি শুরু হল। বত্রিশ বছরের দীর্ঘ চাকরি-জীবনের আরম্ভ। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের হিসাব রাখার কাজ। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোটা খাতার পৃষ্ঠাগুলি একে একে পূর্ণ করে হিসাবের জটিল অঙ্ক দিয়ে। আপিসের কাজ তার খারাপ লাগে না। কিন্তু একমাত্র অ্যানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে তার মন নেই। অ্যানের কাছ থেকে যেমন ঘন ঘন আবেগপূর্ণ চিঠি পাবে বলে আশা

করেছিল, তেমন চিঠি পায় না। সংবাদ এল, দিদিমার মৃত্যু হয়েছে। দিদিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অ্যানের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাটাও দূর হয়ে গেল।

এখন চার্লসের অবসর সময়ের অধিকাংশ কাটে এলিজাবেথান নাট্যকারদের নাটক পড়ে। অন্যের লেখা পড়তে পড়তে নিজের লেখার আকাঙ্ক্ষা হল। লিখে কিছু উপরি আয় হলে বেশ হয়। যে মাইনে পায় তার উপর নির্ভর করে বিয়ে করা যায় না। রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা কয়েকটি পাঠালো সংবাদপত্রে। ছাপা হল না, সব ফেরৎ এল। কোলরিজ চার্লসের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁরই সুপারিশে চার্লসের চারটি কবিতা একটি কাব্য-সঙ্কলনে ছাপা হল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতা নিয়েই প্রথম প্রবেশ চার্লসের। এইটুকু সামান্য সাফল্য তার সে সময়কার সমস্যাজর্জর জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। মেরির জীবনে আবার অন্ধকার নেমে এসেছে। এবার কয়েক মাস যাবৎ সে উন্মাদ হয়ে রইল। বাবার স্বাস্থ্য খুব খারাপ, তার উপর মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি ক্রমশ যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মা'র শরীরও খুব খারাপ, সর্বদা তাঁর কাছে কারও থাকা প্রয়োজন। আর আছে অথর্ব বুড়ি পিসিমা। সব ভার চার্লসের উপর। দাদা অন্যত্র থাকে।

যাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তার কাছে তো কিছুই গোপন করবার নেই। চার্লস অ্যানকে লিখল মেরির অসুখের কথা। এতদিন অ্যান দ্বিধা করছিল। এই চিঠি পেয়ে আর কোনো সংশয় রইল না। চার্লস তার বিংশতি জন্মদিবসে অ্যানের পত্র পেল। অ্যান লিখেছে, আমরা ভুল করেছিলাম। সেই ভুলকে আর বেশিদূর টেনে নিয়ে লাভ নেই। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ হোক। আর চিঠি লিখে কী হবে? তুমি রাগ করো না।

চার্লসের জীবনের ভিত্তিভূমি বিচলিত হল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। এমন ভালোবাসা নেই সংসারে যা লাভ-ক্ষতির হিসাব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে! যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল, কোলরিজ সম্প্রতি তাকে বিয়ে করেছেন। বন্ধুর সঙ্গে তুলনা করে নিজের জীবনের ব্যর্থতা বড় হয়ে দেখা দিল।

মেরি এখন সুস্থ হয়েছে। চার্লসের শরীরের অবস্থা দেখে সে ভয় পেল। যেন ঝড়ে পতনোন্মুখ একটা গাছকে ঠেকা দিয়ে কোনো রকমে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অ্যানের মা চিঠি দিয়েছেন। বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র। কোন

এক রিচার্ড বারট্রামের সঙ্গে অ্যানের বিয়ে। আর সে সইতে পারল না। বংশের ধারা অনুসারে কঠোর আঘাত সইবার মতো শক্ত মন নয় চার্লসের। একদিন রাত্রিতে খেতে বসে হঠাৎ তার বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা-প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল; শান্ত লোকটি উগ্রভাবে মারমুখী হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার এল। চার্লসের উপর নেমে এসেছে বংশগত অভিশাপ। পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে। মেরি কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না। সে সব ভার নেবে চার্লসের; সেবা করে তাকে ভাল করে তুলবে। কিন্তু ডাক্তার রাজী হল না। হাতকড়া লাগিয়ে তাকে নিয়ে গেল। মেরি অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে রইল, আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে ভগবান, এখন যেন আমার মাথা আবার খারাপ না হয়! তা হলে মা-বাবাকে কে দেখবে, কে চার্লসের খোঁজ করবে?

বেশ কিছুকাল পাগলা-গারদে কাটিয়ে চার্লস বাড়ি ফিরে এল। মেরির যত্নে চার্লস সুস্থ হয়ে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে তার চাকরি যায়নি। এখন চার্লসের কোনো ক্ষোভ নেই অ্যানের উপর। তাকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যি সে বিবেচনার কাজ করেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সেই সে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি দেখতে পায় আজকাল। শেষ পর্যন্ত মেরি আর সেই পরস্পরের অবলম্বন। পাগল দুই ভাই-বোন। যে যখন ভালো থাকবে সে তখন অন্যকে দেখবে। আর কেউ আসবে না তাদের জীবনে। কেউ তাদের ভালোবাসতে পারবে না।

চার্লস ভালো হয়ে ওঠবার কিছুদিন পরেই মেরির অসুস্থ হবার লক্ষণ দেখা গেল। ডাক্তার ডাকতে গেছে চার্লস। এর মধ্যে খাবার টেবিলে কী নিয়ে একটা তর্ক উঠেছে। হঠাৎ মেরি ক্ষিপ্ত হয়ে মাংস-কাটা ছুরিটা আমূল বিদ্ধ করে দিল মা'র বুকে। চার্লস ফিরে এসে দেখল সব শেষ। মা'র প্রাণহীন দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছে। বুড়ী পিসিমা কিছু না-বুঝে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। স্তিমিত-চেতন বাবার বোধ নেই কী ঘটেছে ঘরের মধ্যে। ছেলেকে দেখে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন, আয়, এক হাত খেলি।

এমন ক্ষিপ্ত পাগলকে সারাজীবন সরকারী গারদে রাখা উচিত। না হলে কখন যে কার ক্ষতি করবে কে জানে! কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করল না চার্লস। এই দিদি তার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তাকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়ে কী নিয়ে থাকবে? দিদিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে

পাঠিয়ে দিল। তারপরে থানা আর আদালতে ছুটোছুটি করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলল। সর্বদা কেবল ভয়, যদি এত বড় আঘাত সে সইতে না পারে? যদি সেও পাগল হয়ে যায়!

মেরি সুস্থ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু একে একে মৃত্যু হল পিসিমার ও বাবার। পিসিমা তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। স্কুলে পড়বার সময় রোজ অনেকটা পথ হেঁটে পিসিমা তার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যেতেন। স্নেহ-কোমল চিরপরিচিত মুখগুলি একে একে হারিয়ে যাচ্ছে: All, all are gone, the old familiar faces.

মেরি পাগল হয়ে নিজের মাকে খুন করেছে, চার্লস পাগলা-গারদে কিছুকাল কাটিয়েছে;—এ সব খবর প্রতিবেশী ও পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে আর অজানা নেই। সমাজের দুষ্ট ব্যাধির মতো তারা চিহ্নিত হয়ে গেছে। পথে বের হলে দুষ্টু ছেলেরা তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পাগল! ভদ্রসমাজে তারা অপাংক্তেয়। পাড়ার বাইরে কিছু দূরে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আমন্ত্রিত হয়েছিল চার্লস। খুব ভদ্র পরিবার। ভদ্রলোকের দুই মেয়ে; তারাও এল আলাপ করতে। একটি মেয়ের নাম হেস্টার সেভরি। তার শান্ত সৌন্দর্য ও নম্র ব্যবহারে চার্লস আকৃষ্ট হল। পরে হেস্টারের উদ্দেশ্যে একটি কবিতাও রচনা করেছে সে। কিছুদিন পরে যখন হেস্টারের আকর্ষণেই আবার সে বাড়ি গেল তখন দু'টি মেয়ে আর তার সামনে এল না। চার্লস বুঝতে পারল, তাদের আসতে দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে আমন্ত্রণকর্তা জানতে পেরেছেন তার পাগলা-গারদের ইতিহাস।

পথে বের হওয়া যায় না লোকের মন্তব্যের যন্ত্রণায়। মেরি আর চার্লস নতুন পাড়ায় উঠে গেল। কিছুদিন একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু ক'দিন? মেরিকে তো একবার করে উন্মাদ হাসপাতালে পাঠাতে হয়! অনেকটা পালাজ্বরের মত নিয়মিত ঘুরে ঘুরে আসে মস্তিষ্কের এই ব্যাধি। চার্লস তখন একা। ভয়ে ভয়ে থাকে কখন সেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মেরি যখন বাড়ি থাকে না তখন সময় কাটাবার প্রধান অবলম্বন মদ ও ধূমপান। কোলরিজের সাহচর্যে এই দু'টি নেশার অভ্যাস হয়েছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ; ডাক্তারের উপদেশ মেরির অনুরোধ তাকে এই অভ্যাস থেকে মুক্তি দিতে পারেনি।

এ ছাড়া বই পড়ে ও কিছু কিছু লিখেও তার সময় কাটে। সমাজের অন্য

সকলে তাকে এড়িয়ে চললেও লেখকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়ছে। কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডরোথি, ক্র্যাব, হ্যাজলিট, গডউইন প্রভৃতি লেখক এবং বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা চলে; কখনও মুখোমুখি, কখনও চিঠির মাধ্যমে।

চার্লসের কবিতা কিছু কিছু বেরিয়েছে সাময়িক পত্রিকায়। পরিচিত লোক, পরিচিত দৃশ্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে রচিত এই সব কবিতা। ১৭৯৮ সনে বেরিয়েছে তার গদ্য কাহিনী 'দি টেল অব রোজামাণ্ড গ্রে…'। এ বইয়ের প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি; বারো তেরো কপির বেশি বিক্রি হয়েছে কিনা সন্দেহ। শেলীর কিন্তু রোজামাণ্ড গ্রে-র কাহিনী খুব ভালো লেগেছিল। এরপরে চার্লস লিখল একটি ট্র্যাজেডি 'জন উডভিল'। থিয়েটার থেকে পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল। অভিনয়ের যোগ্য নয়। ১৮০২ সনে নিজের পয়সায় নাটকটি ছাপালো চার্লস। এই ট্র্যাজেডি বিশেষ সমাদর লাভ করল না।

কয়েক বছর পুর্বে শেলীর শ্বশুর উইলিয়াম গডউইনের অনুরোধে চার্লস শেক্সপীয়ারের নাটকের কাহিনী কিশোরদের উপযোগী করে গদ্যে লিখে দিতে সম্মত হয়েছিল। কাজ হাতে নিয়ে চার্লস তার দিদি মেরিকেও গল্প লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করল। মেরি তো প্রথম হকচকিয়ে গেল। সে আবার লিখবে কী? কিন্তু চার্লসের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত লিখতে রাজি হল। মোট কুড়িটি গল্পের মধ্যে চোদ্দটি কমেডির কাহিনী মেরির লেখা; চার্লস লিখেছে ছ'টি ট্র্যাজেডির গল্প। মেরি ও চার্লস দুজনের নামাঙ্কিত হয়ে ১৮০৭ সনে বইটি প্রথম বেরিয়েছে। এখনও এটি ইংরেজী শিশু-সাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃত।

পর বৎসর লঙম্যান্‌স প্রকাশ করল 'Specimens of English Dramatic Poets'. দুই খণ্ডের বড় বই। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফল। ভূমিকা ও টীকা যোগ করে সযত্নে সম্পাদনা করেছে চার্লস। কিন্তু এ বইও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। বই বেরোবার কিছুদিন পরে একটা পার্টিতে এক ভদ্রলোক চার্লসকে ডেকে বললেন, 'কোয়ার্টার্লি রিভিউ' বর্তমান সংখ্যায় তোমার বই সম্বন্ধে কী বলেছে দেখেছ? সমালোচক বলেছে, তোমার মন্তব্যগুলি নাকি পাগলের উক্তি।

ঘরের কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। চার্লস মাথা নত করে বসে রইল।

এর কিছুদিন পূর্বে চার্লসের ছোট একটি ফার্স 'মিস্টার এইচ—' অভিনয়ের জন্য গৃহীত হয়েছিল বিখ্যাত ড্রুরি লেন থিয়েটারে। অভিনয় মোটেই জমে নি। একদিন পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চার্লস লাভবান হয়েছিল তরুণী অভিনেত্রী মিস ফ্যানি কেলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে। মিস কেলির সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার প্রথম থেকেই চার্লসকে আকৃষ্ট করল। প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হলেও মিস কেলির ব্যবহারে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। তার এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে চার্লস লিখল :

You are not, Kelly, of the common strain,
That stoop their pride and female honour down
To please that many-headed beast The Town,
And vent their lavish smiles and tricks for gain.

মিস কেলির সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হল। মেরি একদিন বলল, চার্লস, কেলি তোমাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে কর না কেন ?

ভালোবাসে ? প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে না। সেবারের ক্ষতটা এখনও শুকোয় নি। ভয় হয়, আবার হয়ত কঠিন আঘাত পেতে হবে। সে আঘাত সইতে পারবে তো ? তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কেলির মমতাভরা দুই চোখ, তার মধুর ব্যবহার চার্লসের বিচারবুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে। বয়স হয়েছে চুয়াল্লিশ ; মাইনে বেড়েছে। বিয়ে করলে সংসার স্বচ্ছন্দেই চালাতে পারবে। জীবনে এই শেষ আশা। কিন্তু ভয় জেগে আছে মনের কোণে। প্রত্যাখ্যানের ভয়। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না, পাছে মুখের উপর 'না' শুনতে হয় !

২০শে জুলাই, ১৮১৯ সন। চার্লস নিজের মনের কথা জানিয়ে চিঠি লিখল মিস কেলিকে। চিঠি পেয়ে তক্ষুনি জবাব দিল মিস কেলি। না, চার্লসকে ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; বিয়ে করা তো আরও দূরের কথা ! তুমি যে আমাকে ভালোবেসেছ তার জন্য গৌরব বোধ করছি। কিন্তু আর কখনও এ প্রসঙ্গ তুলো না, ভালোবাসার কথা বলো না। আমরা আগের মতোই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলব।

চার্লস চিঠি পেয়েই জানালো, তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব আশা শেষ হয়ে গেল। আশা অবশ্য কখনও সত্যি ছিল না ; সে ভুল করেছিল। সেই ভুল ভাঙল। ভালোবাসা সে

পায়নি, পাবেও না কখনও। সে সৃষ্টি ও সমাজের ব্যতিক্রম ; জীবনের রাজ-পথ থেকে চিরদিনের জন্য নেমে দাঁড়াতে হবে।

লেখার মধ্যে চার্লস সান্ত্বনা খুঁজতে চাইল। ঠিক এই সময়েই লণ্ডন ম্যাগাজিনের সম্পাদক লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করল চার্লস। লেখা বেরুল ছদ্মনামে। কারণ চার্লসের এই নতুন জীবনের শুরু ; তার এক সহকর্মীর নাম একটু বদলিয়ে ছদ্মনাম গ্রহণ করল Elia। বিভিন্ন সময়ে নানা কাগজে প্রকাশিত এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি 'Essays of Elia' নামে সঙ্কলিত হয়ে ইংরেজী সাহিত্যে অমর আসন লাভ করেছে। চার্লস ল্যামের সাহিত্য-খ্যাতি এই প্রবন্ধগুলির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গভীর সহানুভূতি ও মানবতাবোধ চার্লসের ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অসামান্যতা দিয়েছে। যারা অবহেলিত, যাদের জীবন বেদনাক্লিষ্ট, এবং যে-সব পুরনো লোক পুরনো জগৎ নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি চার্লসের দরদের শেষ নেই। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতিটি লাইনে চার্লসকে চেনা যায়। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লসের মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক আর দ্বিতীয় নেই। চার্লস এ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। 'নিউ ইয়ার্স ঈভ' প্রবন্ধে কৈফিয়ত হিসাবে সে বলছে : আমার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই ; তাই একমাত্র লেখা ছাড়া আর কিছুর মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ নেই। লেখার মধ্যেই নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করি।

মিস কেলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও চার্লস যে অ্যানকে ভোলেনি তার প্রমাণ পাই Dream Children (1821) প্রবন্ধে। অ্যানের সঙ্গে বিয়ে হলে তার জীবন কেমন কাটত তারই কল্পনা। চার্লসের বয়স হয়েছে, বিশ্রাম করছে আরাম-কেদারায়। ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে মা-বাবার ছেলে-বেলার গল্প শোনবার জন্য। চার্লস তাদের সঙ্গে গল্প করছে। বলছে, কত ধৈর্য ধরে সাধনা করে তাদের মায়ের হৃদয় জয় করে তাকে ঘরে আনতে পেরেছিল। হঠাৎ তন্দ্রার মধ্যে দেখতে পেল ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল : 'We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bartrum father. We are nothing ; less than nothing, and dreams. We are only what might have been, and must wait upon the tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence,

and a name,—and immediately awaking, I found myself quietly seated in my bachelor arm-chair...'

স্বপ্ন-শিশুর দল ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেছে। অ্যানের (প্রবন্ধে অ্যালিস) বিয়ে হয়েছে বারট্রামের সঙ্গে, ল্যামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। অ্যান তার জীবনের জাল দিয়ে চার্লসের স্বপ্নকে ধরতে চায়নি। তাই সেই স্বপ্ন এখনও আকাশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

শুধু স্বপ্ন নয়, অ্যানকে ভুলতে পারেনি চার্লস। শুনেছে, এখন অ্যান সপরিবারে লিসেস্টার স্কোয়ার অঞ্চলে থাকে। কতদিন সে ওখানকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধু একবার অ্যানকে দেখবে বলে। একবার দেখেই চলে আসবে। কতদিন দেখেনি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইতালিয়ান পড়তেন আইসোলা নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। তাঁর নাতনী এমা আইসোলাকে মেরি ও চার্লস পালিত কন্যা হিসাবে গ্রহণ করল। এমা তাদের শূন্য জীবন একটু পূর্ণ করেছে। এই নব-যৌবনা তরুণী অনুক্ষণ চার্লসের সঙ্গী। এক সঙ্গে তারা বেড়ায়, গল্প করে, বই পড়ে। চার্লসের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে; এমার বয়স আঠারো-উনিশ। চার্লসের বেদনায় এমার গভীর সহানুভূতি, চার্লস উপলব্ধি করল এমা তার জন্য আত্মদান করতে প্রস্তুত। এই উপলব্ধি চার্লসকে দুর্বল করল; বয়স হলেও তার মনের আকাঙ্ক্ষা মরেনি। ভয় হয়, পাছে তার জন্য এমার ক্ষতি হয়! জীবনের প্রান্তে এসে একটি মধুর সম্ভাবনার পরিচয় পেল। কিন্তু এখন সে পরিচয়ে লাভ কী? এখন শুধু ক্ষতি করতে পারবে, কারও জীবনকে পূর্ণ করবার ক্ষমতা আর নেই। নিজের উপর আস্থা হারিয়েছে চার্লস। সে তাড়াতাড়ি উদীয়মান প্রকাশক এডওয়ার্ড মক্সনের সঙ্গে এমার বিয়ের ব্যবস্থা করল। এমা অভিমান করেছিল; কিন্তু চার্লস জানত এ অভিমান দু'দিনেই দূর হয়ে যাবে।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর চার্লস চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করল। পেন্সনের পরিমাণ ভাই-বোনের পক্ষে যথেষ্ট। টাকার অভাব নেই। কিন্তু জীবন হঠাৎ একান্তরূপে শূন্য হয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের ফাইলের স্তূপে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করবার সুযোগ পর্যন্ত রইল না। রিক্ত, নিঃসঙ্গ জীবনে অনন্ত অবসর।

মেরি এখনও প্রায়ই উন্মাদ হয়ে যায়। সে যখন বাড়ি থাকে না তখন

একাকীত্ব দুর্বহ হয়ে ওঠে। এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন অপেক্ষা উন্মাদ মেরির সাহচর্যও কাম্য। লণ্ডনের বাসা ছেড়ে শহরের বাইরে এক উন্মাদ হাসপাতালে ঘর ভাড়া করে মেরি ও চার্লস উঠে এল। যতদিন বাঁচবে আর বিচ্ছেদ হবে না। পাগল হলেও না।

কোলরিজের মৃত্যু হল। চার্লসের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় কোলরিজ চার্লস ও মেরির নাম উল্লেখ করেছেন। কম্পিত হস্তে চার্লস ও মেরির নাম লিখে তাঁর কাব্য-গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। শেষ উপহার।

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া চার্লসের এখন আর কোনো কাজ নেই। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে; পথ পিছল। চার্লস পথে বেরিয়েছে বেড়াতে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। মুখে আঘাত লাগল। চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়েছে। সামান্য ঘা, কোনো যত্ন নেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না।

দু' দিন পরে মুখ ফুলে উঠল। ডাক্তার বলল, বিসর্প। এই রোগে চার্লসের মৃত্যু হল ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৩৪ সনে।

And Lamb, the frolic and the gentle,
Has vanished from his lonely hearth.

আর্নেস্ট ডাউসন

১৮৬৭—১৯০০

এক বিস্মৃত কবির কথা।

তাঁর দেশের লোকেই ভুলে গেছে, আমাদের তো তাঁর নাম শোনবার কথা নয়। এখন তাঁর কাব্য-গ্রন্থ কিনতে পাওয়া যায় না, পুরনো বইয়ের দোকানেও পাবার আশা নেই। অথচ তাঁর মৃত্যুর মাত্র ষাট বছর পূর্ণ হল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ডিকাডেণ্ট কবিদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বলে সমসাময়িক সমালোচকরা তাঁর সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কবির মর্যাদা হয়ত কেউ দেবে না: কিন্তু মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সের স্বল্প-পরিসর রচনার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিশ্রুতিটাই রেখে যেতে পেরেছেন; শুধু অল্প কয়েকটি কবিতা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। একমাত্র Cynara কবিতাটির জন্যই ইংরেজী কাব্যের ইতিহাসে তিনি একটু স্থান দাবি করতে পারেন। এই কবিতা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর পর্যন্তও ইংলণ্ডের তরুণ ছাত্ররা তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করত। ইংলণ্ড-প্রবাসী কোনো কোনো বাঙালী ছাত্রও এই কবিতাটির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিল।

কবি আর্নেস্ট ডাউসনের কথা বলছি।

১৮৬৭ সালের ২রা অগাস্ট ইংলণ্ডের কেণ্ট অঞ্চলে আর্নেস্টের জন্ম হয়। পিতা আলফ্রেড ডাউসনের বেশ সচ্ছল অবস্থা; পৈতৃক সম্পত্তি 'ব্রিজ ডকের' তিনি একমাত্র মালিক। এই ডকে ছোট ছোট জাহাজ মেরামত করা হয়। অনেক লোক কাজ করে। কয়েক পুরুষের লাভের ব্যবসা। অর্থের সঙ্গে যোগ হয়েছিল রুচির। আলফ্রেডের ছিল গভীর সাহিত্য-প্রীতি। মেরিডিথ, রসেটি, ব্রাউনিং, স্টিভেন্সন প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গতা। তিনি নিজেও কিছু কিছু লিখতেন। একটি বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন।

আর্নেস্টের বয়স যখন বছর দশেক, তখন থেকে পরিবারে নানা সমস্যা দেখা

দিতে লাগল। প্রধান সমস্যা অর্থ-সঙ্কট। আর্নেস্টের মা ও বাবা দু'জনেই ক্ষয়রোগে ভুগছিলেন। ডকের কাজ দেখবার জন্য যে শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন আলফ্রেড ডাউসনের তা ছিল না। তা ছাড়া ডাক্তারের পরামর্শে তাঁদের প্রায়ই ফ্রান্স ও ইতালীতে কাটাতে হত। সুতরাং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে ডক থেকে আয়ের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। অনেকদিনের পুরনো ব্যবসা বলেই অবহেলা সত্ত্বেও একেবারে বন্ধ হল না।

আর্থিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে মারাত্মক রোগের জন্য দুর্ভাবনা মিলিত হয়ে আলফ্রেড ডাউসনকে বিষাদখিন্ন করে তুলেছে। ভবিষ্যতের আশা নেই, সম্বল নেই, ধৈর্য ধরে কোনো কাজ করবার শক্তি নেই; প্রত্যেকটি দিন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। আর্থিক অনটনের চেয়ে বড় ছিল পরিবারের দুরপনেয় বিষাদের আবহাওয়া। ছেলেবেলায় আর্নেস্ট এই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। উচ্ছল আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ সে পায়নি। জন্মের পর থেকে বিষাদ তার সঙ্গ নিয়েছে, মৃত্যু পর্যন্ত সেই সাহচর্য অবিচ্ছিন্ন ছিল।

পরিবারের বিষাদ ও বেদনার গ্লানিকর আবহাওয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবার সুযোগও আর্নেস্টের ছিল না। কারণ, মা-বাবার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরতে হত বলে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। তাহলে সহপাঠীদের সাহচর্যে স্কুলের ক' ঘণ্টা সময় সে হয়ত বাড়ির কথা ভুলে থাকতে পারত। ছেলেবেলায় আর্নেস্ট ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হবার সুযোগ পেলে তার জীবন যে অন্য রকম হত, তাতে সন্দেহ নেই। স্কুলের জীবনে যে নিয়মানুবর্তিতা অভ্যস্ত হয়ে যায়, আর্নেস্ট তা শেখার সুযোগ পায়নি বলেই হয়ত তার পরবর্তী জীবন এত উচ্ছৃঙ্খল ছিল।

উনিশ বছর বয়সে আর্নেস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন্স কলেজে ভর্তি হল। এত দিন সে নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করতে পারেনি, অনেক বিষয়ে সে খুবই কাঁচা ছিল। তবু যে কি করে ভর্তি হতে পেরেছিল সেটা বিস্ময়ের কথা। যাই হোক, দীর্ঘকাল ফ্রান্সে থেকে আর্নেস্ট ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। এ ছাড়া লাতিন ভাষায় তার অধিকারের প্রমাণ পেয়ে কলেজের অধ্যাপকেরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর্নেস্টের রচনায় এ দু'টি ভাষারই যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। জীবনের শেষ ভাগে কিছুদিন তাকে জীবিকার্জনের জন্য নির্ভর করতে হয়েছিল ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের

উপর। তার বহু কবিতার নামকরণ লাতিন কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে করা হয়েছে।

১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে আর্নেস্ট কলেজ-হোস্টেলে এসে উঠল। বাবার বেশি টাকা দেবার ক্ষমতা ছিল না। সস্তা ভাড়ার চিলেকোঠায় তার স্থান হল। একেই সে একটু কুনো স্বভাবের মানুষ, চিলেকোঠায় বাসা নিয়ে সেই স্বভাব আরো প্রশ্রয় পেল। অনেকের সঙ্গে তার আলাপ হল না, ঘনিষ্ঠতা হল অল্প কয়েক জনের সঙ্গে। এদের মধ্যে একজন আর্থার মুর। পরে আর্নেস্ট ও আর্থার যুক্তভাবে দু'টি উপন্যাস রচনা করেছে। আর্নেস্ট মিশুক না হলেও সে যে কবিতা লেখে এবং ফরাসী ও লাতিন ভাষায় যে তার অসামান্য অধিকার আছে, সে কথা ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হল না। এক বছর হোস্টেলে থাকবার পর আর্নেস্টের কুনো স্বভাব অনেকটা দূর হয়েছিল। কিন্তু এই সময়ে প্রকাশিত তার কয়েকটি কবিতা থেকে দেখা যাবে আর্নেস্ট মন থেকে বিষাদের গ্লানি দূর করতে সক্ষম হয়নি। যদিও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, তবু নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে, আর্নেস্ট নাকি গভীর বিষাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নেশা করত। তার প্রিয় নেশা ছিল ভাঙ। ভাঙ খেতে সে নাকি শিখেছিল এক হিন্দু ছাত্রের কাছ থেকে।

হঠাৎ ১৮৮৮ সালের মার্চ মাসে আর্নেস্ট কলেজের পড়া বন্ধ করে বাড়ি চলে গেল। পরীক্ষার অল্পদিন বাকি। অধ্যাপকরা বুঝিয়ে বললেন, ডিগ্রি না নিয়ে গেলে কি হবে? কিন্তু কারো কথাই সে শুনল না। পারিবারিক অবস্থার জন্য যে পড়া ছাড়তে হয়নি এ কথা নিশ্চিত। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও আলফ্রেড ছেলেকে পড়া বন্ধ করতে বলেন নি। চঞ্চল মন নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভরসা পায়নি বলে পড়া ছেড়ে এসেছিল আর্নেস্ট। ছেলের এই ব্যবহারে বাবা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। এখন আর্নেস্ট কোন পথ অবলম্বন করবে, সেই হল সমস্যা। একটু লেখবার ক্ষমতা ছাড়া তার আর কোনো বিশেষ গুণ নেই। কিন্তু শুধু লেখার উপর জীবিকার জন্য তো নির্ভর করা যায় না! নতুন লেখকের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে যে আশা থাকে তা আর্নেস্টেরও ছিল। কিন্তু সাফল্য অর্জনের জন্য যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তা সইবার মতো শারীরিক ও মানসিক শক্তি তার ছিল না। সুতরাং বাবাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে আর্নেস্ট ডকের কাজ দেখতে আরম্ভ করল। তার প্রধান কাজ হল ডকের হিসাব রাখা। সে ডকের আপিসে এসে বসত বটে, কিন্তু হিসাব-পত্রের

জটিলতা একটুও ভালো লাগত না। বিকেলবেলা বাড়ি না ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে এক কাফে থেকে আর এক কাফেতে ঘুরে বেড়াতো। এখন তার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিক্টর প্লার।

বন্ধুরা প্রায় সকলেই শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার স্বপ্ন দেখে। টেবিলের চার পাশে বসে সাহিত্য ও শিল্পের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে ; এ আলোচনায় তাদের ক্লান্তি নেই। কাফে বন্ধ হয়ে গেলে আর্নেস্ট প্রায়ই পথে বেরিয়ে লণ্ডনের শহরতলীতে বাড়ি ফেরবার গাড়ি পেত না। তখন অন্য কোনো রেস্তোরাঁ খোলা থাকলে সেখানে গিয়ে বসত, কিংবা কোনো বন্ধুর ঘরে রাতটা কাটিয়ে দিত। এই অনিয়মিত জীবন-যাত্রা ভিতরে ভিতরে যে তার শক্তি ক্ষয় করছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবু এই সময় সাহিত্য জগতে প্রবেশের পুর্ব-প্রস্তুতিটা আর্নেস্ট ভালো ভাবেই করছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্রিকায় তার কবিতা প্রকাশিত হত। ১৮৯০ সালের মধ্যেই সে প্রায় পঞ্চাশটি ভালো কবিতা লিখে কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তৈরি করে রেখেছে। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা খুবই ভালো। এ ছাড়া একটি স্বল্পায়ু সাহিত্য-পত্রের সহকারী সম্পাদকের কাজ করবার সুযোগও আর্নেস্ট পেয়েছিল।

ওলাইভ শ্রাইনারের 'দি আফ্রিকান ফার্ম' তখন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর্নেস্ট এ বই পড়েছিল বিশেষ যত্ন সহকারে। বইয়ের মার্জিনে তার নিজের মন্তব্য লিখে রেখেছে। এই সব মন্তব্য থেকে আর্নেস্টের মানসিক অবস্থা তখন কেমন ছিল তার খানিকটা হদিস পাওয়া যায়। শ্রাইনার তাঁর বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, দর্শন, মদ ও মেয়েরা জীবনের দুঃস্বপ্ন যদি একটু দূরে রাখতে পারে, তাহলে মন্দ কী! আর্নেস্ট এর পাশে মন্তব্য করল : এইটুকু যোগ্যতাও মেয়েদের নেই, তারা বরং সেই দুঃস্বপ্নকে আরো ভয়ঙ্কর করে তোলে।

আর এক মার্জিনে আর্নেস্ট লিখেছে : মেয়েরা ক্রমবিবর্তনের পথে পুরুষ অপেক্ষা কয়েক ধাপ পিছিয়ে আছে (যেমন, বিড়াল আছে কুকুরের পেছনে)। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে মেয়েদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করবার অল্প দিন পরেই আর্নেস্ট গভীর ভাবে একটি কিশোরীকে ভালোবাসল। এই সর্বগ্রাসী প্রেম আর্নেস্টের জীবন, মৃত্যু এবং সাহিত্য-সাধনা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করেছিল।

১৮৯১ সালের কোনো এক দিন। লণ্ডনের সোহো অঞ্চলে একটি

নিরিবিলি রেস্তোরাঁ। খুঁজতে খুঁজতে আর্নেস্ট 'পোল্যাণ্ড' নামে একটি ছোট হোটেল আবিষ্কার করল। এক পোলিশ দম্পতি যুদ্ধ-বিগ্রহের হাত এড়িয়ে লণ্ডনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জীবিকার্জনের জন্য তারা খুলেছে এই হোটেল স্বামি-স্ত্রী আর একটি মেয়ে। এখানে লোকের ভিড় কম; তা ছাড়া খাবারের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা। সুতরাং আর্নেস্টের খুব পছন্দ হল। তার বন্ধুরাও আসত মাঝে মাঝে।

একদিন খেতে খেতে হঠাৎ চোখে পড়ল হোটেলের মালিকের মেয়ে এক কোণের একটা টেবিলে বসে মা'র সঙ্গে কথা বলছে। সেই প্রথম দেখাতেই সে আদেলেদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করল। অথচ তেমন আকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল না। আদেলেদের বয়স তখন মাত্র বারো, আর্নেস্ট চব্বিশ বছরের যুবক। আর্নেস্ট লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি; মাথা-ভরা বাদামী চুল; ভাসা-ভাসা চোখ; চোখা নাক। চার্লস কণ্ডরের আঁকা প্রোফাইলের দিকে চাইলে কীটসের ছবি মনে পড়ে যায়। কণ্ডরের তুলিতে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে আর্নেস্টের গভীর বিষাদ। আর কিশোরী আদেলেদ জীবনের দুঃখের দিকটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাকে হয়ত সুন্দরী বলা যায় না; কিন্তু তার নিষ্কলুষ সজীব লাবণ্যশ্রী আর্নেস্টকে মুগ্ধ করেছে। এমন শুচিস্নিগ্ধ কৌমার্যের রূপ সে আর কখনো দেখেনি।

প্রথম প্রথম আর্নেস্টের আকর্ষণকে সকলেই সহজ ভাবে নিয়েছে। ভেবেছে একটি হাসি-খুশি কিশোরীর সঙ্গে সাধারণ বন্ধুত্ব। আর্নেস্টের বন্ধুরাও আদেলেদের সঙ্গে গল্প করত। হোটেলের কর্ত্রী কিছুই মনে করত না আর্নেস্টের ঘনিষ্ঠতায়। হোটেলের অনেক খদ্দেরই আদেলেদকে পছন্দ করে, তার সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসে। কিন্তু বছর খানেক পরে যখন দেখা গেল, আর্নেস্ট আদেলেদের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তখন আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। অনেকের মনে হল এটা নিশ্চয়ই বিকৃত যৌনতার পরিচায়ক। তা না হলে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে কি করে একজন পূর্ণবয়স্ক যুবক এমন গভীর ভাবে ভালোবাসতে পারে? বন্ধুদের অনুরোধ, মা-বাবার উপদেশ—কিছুই আর্নেস্টের মন ফেরাতে পারল না। অথচ আদেলেদ বা তার মা-বাবার কাছ থেকে আর্নেস্ট তেমন কোনো আশ্বাস পায়নি। আর্নেস্টের চালচলন দেখে জামাই হিসাবে তার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আদেলেদের অভিভাবকরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। আর আদেলেদ? প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি

করবার বয়স ও বুদ্ধি তার ছিল না। কিংবা কারো কারো মতে আদেলেদের মধ্যে প্রকৃতই তেমন পবিত্রতার জ্যোতি ছিল না, যা দেখে আর্নেস্ট মুগ্ধ হয়েছিল। আর্নেস্ট নিজের ধ্যানের আদর্শকে ভুল করে আদেলেদের উপর আরোপ করেছে। শোনা যায়, সমারসেট মম্ তাঁর 'অব হিউম্যান বন্‌ডেজ'-এর পরিচারিকার চরিত্র আদেলেদের ছায়া নিয়েই নাকি এঁকেছেন।

আদেলেদের সঙ্গে পরিচয়ের বছরখানেক পর্যন্ত আর্নেস্ট বেশ আনন্দেই কাটিয়েছে। আদেলেদকে ভালোবাসার পরিণাম হিসাবে তখনো দুঃখ পায়নি। এই নবজাগ্রত প্রেমের উপলব্ধি তার সাহিত্য-সাধনার প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়ালো। কিছু দিনের জন্য আর্নেস্টের বিষাদক্লিষ্ট মনে দেখা দিল নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস। সে কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখে চলেছে; বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা বের হয়; সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। এ সময় আর্নেস্ট রাইমার্স ক্লাবের (The Rhymers' Club) একজন প্রধান সভ্য ছিল। এই ক্লাবের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে আর্নেস্ট রিস, আর্থার সিমন্‌স ও উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর নাম সুপরিচিত। আমাদের কবি মনোমোহন ঘোষও ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; আর্নেস্টের একটি চিঠিতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে দেখতে পাই।

ক্লাবের সভ্যরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করত; বৈঠকে বসে কাব্যালোচনা করত। তা ছাড়া ক্লাবের তরফ থেকে সভ্যদের কবিতা সঙ্কলনের ব্যবস্থাও হয়েছিল। অবশ্য মাত্র দু'টি সঙ্কলন বেরিয়েই এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্কলন দু'টিতে আর্নেস্টের বারোটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

আর্নেস্ট যদিও কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তবু তার নিজের কিন্তু গদ্যের উপরেই ঝোঁক ছিল বেশি। তার আশা ছিল গল্প, উপন্যাস লিখেই সে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ১৮৯৩ সালে অক্সফোর্ডের বন্ধু আর্থার মূর-এর সহযোগিতায় রচিত 'এ কমেডি অব মাসক্‌স' (A Comedy of Masks) প্রকাশিত হয়। আর্নেস্টের এটি প্রথম বই। দু'বছর পরে মূর-এর সঙ্গে লেখা আর্নেস্টের আর একটি উপন্যাস 'আড্রিয়ান রোম' (Adrian Rome) বেরিয়েছিল। দু'টি বই-ই সমালোচকদের সম্বর্ধনা লাভ করেছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস দু'টি দ্বিতীয় শ্রেণীর। কাহিনী মূলতঃ আত্মজীবনীমূলক বলে আর্নেস্টের জীবনী আলোচনায় এদের বিশেষ মূল্য আছে। কাব্য-গ্রন্থ বেরোবার আগেই ১৮৯৫ সালে তার গল্পসংগ্রহ 'Dilemmas' বের হল। পর বছর আর্নেস্টের প্রথম

কাব্য-গ্রন্থ 'ভার্সেস' (Verses) পাওয়া গেল। ছোট বই; কিন্তু এর আন্তরিকতা এবং মাধুর্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৮৯৯ সালে আর্নেস্টের গদ্য ও পদ্য সঙ্কলন 'Decorations' প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া অর্থোপার্জনের তাগিদে আর্নেস্টকে জোলা, বালজাক প্রভৃতি ফরাসী লেখকের বই অনুবাদ করতে হয়েছিল। লিওনার্ড স্মিদার্স নামে একজন নতুন প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় না হলে আর্নেস্ট লেখার উৎসাহ পেত কি না সন্দেহ। এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সহানুভূতিশীল প্রকাশক দুর্লভ। আর্নেস্টের চরম দুর্দিনে প্রতিদানের আশা অনিশ্চিত জেনেও স্মিদার্স যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করেছে। আর্থার সিমনসের সম্পাদনায় এই প্রকাশক 'স্যাভয়' নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য-পত্র বের করায় আর্নেস্ট নিয়মিত লেখার সুযোগ পেয়েছিল। এই পত্রিকায় ইয়েটস, হ্যাভলক এলিস, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি লেখকেরা লিখতেন।

আর্নেস্টের সকল মৌলিক রচনাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আদেলেদের প্রভাব পড়েছে। প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'ভার্সেস' আদেলেদকেই উৎসর্গ করেছে আর্নেস্ট। উৎসর্গ-পত্রে সে লিখেছে: To you, who are my verses: তুমিই আমার কবিতা, তোমাকেই দিলাম। আদেলেদকে ছাড়া আর্নেস্ট নিজের ভবিষ্যৎ জীবন ভাবতেই পারে না। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ভাবে পোল্যাণ্ডে এসে হাজিরা দেয়। আদেলেদের সঙ্গে এক কোণে বসে গল্প করে, কখনও বা তাস খেলে; একে একে সকল খদ্দের চলে যায়, আর্নেস্ট রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। প্রত্যহ আদেলেদের সঙ্গে গল্প করা সম্ভব হয় না; তবু চুপ করে বসে থাকে একটু দেখবার আশায়। আদেলেদ এখনো তার প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু আর্নেস্ট ওদের পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আদেলেদকে সে এখন তার ডাক নাম 'মিসি' বলে ডাকে। তাকে কবিতা পড়ে শোনায়। মিসি আর্নেস্টকে কখনো আকর্ষণ করে না। বরং অনেক সময় তার বিরূপ ব্যবহারে আর্নেস্ট গভীর বেদনা পায়। মিসির বয়স অল্প, তাই সে এখনো যথেষ্টরূপে সাড়া দিতে পারছে না, এই ভেবে আর্নেস্ট সান্ত্বনা খোঁজে।

মিসির প্রতি আকর্ষণের মধ্যে আর্নেস্টের মনে একটা পুজার ভাব আছে। এই আকর্ষণে দেহ গৌণ, আত্মার যোগাযোগটা বড়। অন্য কেউ আর্নেস্টের এ ধরনের সৃষ্টিছাড়া প্রেম বুঝতে পারত না। মিসিও পারেনি। কিন্তু আর্নেস্ট মিসির সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বেও কলুষস্পর্শহীন বালিকার প্রতি আকর্ষণ

অনুভব করত। ১৮৮৬ সালে তার কবিতা প্রথম ছাপা হয়। সে কবিতা Sonnet of a little girl. এরপরে অন্যত্র কবি প্রিয়াকে little lady, child, ইত্যাদি বলে উল্লেখ করেছে দেখতে পাই। যে কবিতাটি লিখে আর্নেস্ট প্রথম খ্যাতি লাভ করে সেটি মিসির উদ্দেশে রচিত। মিসির ঔদাসীন্যে কবির বেদনা এবং তার নীরব আত্মনিবেদন সুন্দর ভাবে কবিতায় ফুটেছে। কবি বলছে, আমার দেবার মতো কিছুই নেই একমাত্র নীরব প্রেম ছাড়া।

Yea, for I cast you, sweet !
This one gift, you shall take ;
Like ointment, on your unobservant feet,
My silence, for your sake.

আমার নীরব প্রেমের দান, অলক্ষ্যে মলমের মতো তোমার পায়ের সঙ্গে মিশে থাকবে।

মিসির আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে কখনো কখনো আর্নেস্ট খুবই আনন্দ লাভ করত। আবার যখন মিসি তাকে উপেক্ষা করত তখন মন হতাশায় ভরে উঠত। এই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ক'বছর ধরে তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। একটা সমাধান না হলে শান্তি নেই। মিসির বয়স পনেরো পূর্ণ হতে কয়েক দিন বাকী আছে ; এমন সময় একদিন সুযোগ পেয়ে আর্নেস্ট বলল তার মনের কথা। মিসি রাগ করল না ; বরং বলল, অনেক দিন থেকেই সে এ কথা শুনবে বলে আশা করে ছিল। তবে এখনো তার বিয়ের বয়স হয়নি, সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। মিসির মা তাকে আশা দিল। বলল, বছর দুই পরে মিসি হয়ত সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে। এইটুকু আশা আর্নেস্টের পক্ষে আপাতত যথেষ্ট।

এই সময় আর্নেস্ট তার এক বন্ধুকে লিখছে : মিসির সঙ্গে আমার যোগা-যোগের ইতিহাসটা বিচিত্র। স্পঞ্জ যেমন জল আকর্ষণ করে, মিসি তেমনি আমার মন আকর্ষণ করে নিয়েছে। নিজেকে তাই বড় অসহায় বোধ করছি।

আর্নেস্ট মিসিকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তাব করেছে, এ কথা গোপন রইল না। শুভাকাঙ্ক্ষীরা ক্ষুব্ধ হল। সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনো সুন্দরী তরুণীকে সে বিয়ে করতে পারে। তাতে আর্থিক সুবিধার সম্ভাবনাও আছে। হোটেলওয়ালীর অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে কোনো দিক থেকেই আর্নেস্টের যোগ্য নয়। সে মিসিকে কবিতা পড়ে শোনায়, তার নামে কবিতার বই উৎসর্গ করে ; কিন্তু মিসির কি

তা বোঝবার মতো রুচি বা শক্তি আছে? একেবারে পাগল না হলে আর্নেস্ট এমন ব্যবহার কেন করবে?

বন্ধুবান্ধবের সমালোচনা আর্নেস্টকে বিচলিত করতে পারে না। মিসির ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য না করে তার মন আবার বিষাদে ভরে ওঠে। মিসির কাছে সে তার হৃদয় উন্মুক্ত করেছে, মিসি তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি; তবু পুর্বের মতোই মিসি দূরে দূরে থাকে। মিসি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এই আশায় বৃথাই একে একে দিন কাটছে।

যে আশার পরিবেশে মিসির সঙ্গে আর্নেস্টের পরিচয় হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই তার পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছে। মিসি একটু আশ্বাস দিয়ে আবার দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে। বাড়িতেও সান্ত্বনা নেই। ডকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে; একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে শীগগিরই। সেই চিন্তায় আর্নেস্টের বাবা হাত-পা গুটিয়ে মৃতকল্প হয়ে বসে আছেন। ডকের অবস্থা যত খারাপ হয় আলফ্রেডের ঘুমের ওষুধের মাত্রা তত বেড়ে চলে। এক দিন ওষুধের মাত্রা এত বেশি হল যে তাঁর ঘুম আর ভাঙল না। আলফ্রেড হয়ত আত্মহত্যা করবার উদ্দেশ্যেই মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খেয়েছিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব পড়ল আর্নেস্টের উপর। অথচ এ দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষা বা শক্তি তার ছিল না। সংসার অবশ্য ছোট। মা এবং ছোট ভাই রাউল্যাণ্ড। কিন্তু একমাত্র আয়ের পথ বন্ধ হবার উপক্রম হওয়ায় এই ছোট সংসারের ভারই দুর্বহ হয়ে উঠল। আর্নেস্ট সাহিত্য-সাধনাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিল; সমালোচকদের কাছে এর মধ্যেই তার কবিতা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সাহিত্যের কথা ভুলে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল আর্নেস্টকে। সামান্য বেতনের যে কোনো চাকরির জন্য সে নানা জায়গায় দরখাস্ত করতে লাগল। বন্ধুবান্ধবের সুপারিশ-পত্র নিয়ে কত জায়গায় দেখা করল; কোথাও কোনো সুবিধা হল না।

অর্থের ভাবনা তো আছেই, তার উপর মাকে নিয়েও আর্নেস্টের কম চিন্তা নয়। মা'র প্রতি অবশ্য সে কখনো গভীর আকর্ষণ অনুভব করেনি; তবু মা'র মুখের করুণ সৌন্দর্যটুকু সে এখন ভুলতে পারে না। মা যে বর্তমানে সম্পূর্ণ-রূপে তার উপর নির্ভরশীল, এ কথা সব সময়ই আর্নেস্টের মনে পড়ে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মা'র মন আত্মগ্লানিতে ভরে উঠেছে। তাঁর ধারণা, শ্বশুরকুলে ক্ষয়রোগ তিনিই নিয়ে এসেছেন। তার ফলে স্বামীর মৃত্যু হল, তাঁর মৃত্যু

হবে, হয়ত ছেলেদেরও এই রোগ আক্রমণ করবে। শ্বশুরবংশ ধ্বংস করবার পাপবোধ তাঁর মনের উপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। এই মানসিক যন্ত্রণা দূর করবার সাধ্য আর্নেস্টের নেই। মা'র মনে হত তিনি মারা গেলেই ছেলেদের মঙ্গল হবে। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকমাস পর তিনিও ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

ছোট ভাই রাউল্যাণ্ড চলে গেল এক আত্মীয়ের বাড়ি। এবার আর্নেস্টের মিসিকে ভালোবাসার বেদনা ছাড়া আর কোনো বন্ধন নেই। এই অন্ধ আকর্ষণের পরিণতি কি হবে সে জানে না। মিসির বয়স হল প্রায় সতের। বয়সের চেয়ে তাকে বড় দেখায়। দু'বছর অপেক্ষা করতে বলেছিল মিসি; সে দু'বছর শেষ হয়ে এল। কিন্তু মিসির দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। বরং মাঝে মাঝে তার ব্যবহারে আর্নেস্ট ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আর্নেস্টের ভালোবাসার সঙ্গে যদি চপলতা থাকত তাহলে হয়ত মিসির কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যেত। আর্নেস্টের প্রেমে যে আদর্শবাদ ছিল মিসির পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। শুধু মিসি নয়, অনেকের কাছেই আর্নেস্টের ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্বোধ্য। আর্নেস্টের প্রেম দু'ভাগে বিভক্ত ছিল; এক ভাগ দেহের ক্ষুধা, আর এক ভাগ আত্মার ক্ষুধা। তার আত্মা কামনা করেছিল মিসিকে, এর মধ্যে দেহের আকর্ষণ ছিল গৌণ। দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আর্নেস্ট অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘুরত, কখনো কখনো তাদের নিয়ে আসত পোল্যাণ্ডে। মিসি তার সঙ্গিনীদের সন্দেহের চোখে দেখত; কিন্তু আর্নেস্টের মনে এ নিয়ে কোনো শঙ্কা ছিল না।

আর্নেস্ট যদি মিসিকে পৌরুষের সঙ্গে দাবি করতে পারত, তাহলে হয়ত মিসি বিয়েতে সম্মতি দিত। কিন্তু আর্নেস্টের ছিল প্রবল অভিমান। সে জোর করবে না, অন্তরের আকর্ষণে যদি এগিয়ে আসে তবেই মিসিকে ঘিরে তার যে স্বপ্ন তা সফল হবে। এ ছাড়া নানা দ্বিধায় আর্নেস্টের হৃদয় হয়েছিল ক্ষতবিক্ষত। ১৮৯৪ সালের শুরু থেকেই মাঝে মাঝে জ্বর হয়, আর কাশি তো প্রায় সব সময়েই লেগে আছে। মা-বাবাকে সে ভুগতে দেখেছে ছেলে-বেলা থেকে, সুতরাং এই অসুখ, এবং ধীরে ধীরে ওজন কমে যাওয়া যে কিসের লক্ষণ, তা আর্নেস্টের বুঝতে আর বাকী রইল না। এর উপরে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, উপার্জনের কোনো পথ নেই। সুতরাং তার প্রেমের গভীরতা সত্ত্বেও জোর ছিল না। আর্নেস্ট ছিল আদর্শ প্রেমের পূজারী। তাই তার মনে

গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল মিসি যেন এক দিন তার সকল অক্ষমতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করে।

মিসির মধ্যে সেই আদর্শবাদের বাষ্পও ছিল না। আর্নেস্টের আদর্শবাদী প্রেম তার কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগল। প্রায়ই খিটিমিটি শুরু হয়। এক দিন তো বেশ ঝগড়া হয়ে গেল। সঠিক কারণটা কেউ জানে না। এরপর থেকে আর্নেস্ট সম্পূর্ণ হতাশ না হলেও প্রেমের সফলতা সম্বন্ধে তার সন্দেহ ক্রমশ বাড়তে লাগল। একমাত্র সান্ত্বনা আছে লেখার মধ্যে। লিখতে বসলে সব হতাশা, বেদনা ও দুরাকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে যায়। লিখে উপার্জনেরও সুযোগ এল। নতুন প্রকাশক লিওনার্ড স্মিদার্স তাকে দিল ফরাসী সাহিত্যের কতকগুলি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ করতে। লণ্ডনে কাজ এগোবে না। বিকেল হলেই দুর্নিবার আকর্ষণে পোল্যাণ্ডে যাবে। সেখানে অর্ধেক রাত কাটিয়ে আহত মন নিয়ে ফিরবে। তার জের চলবে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত। সুতরাং মিসির কাছ থেকে অনেক দূরে পালাতে না পারলে কাজ হবে না। স্থির করল ফ্রান্সে যাবে। সেখানে লেখা ভালো হবে, তা ছাড়া দক্ষিণ-ফ্রান্সের উষ্ণ আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবার আশা আছে।

প্রকাশকের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে আর্নেস্ট ফ্রান্স যাত্রা করল। একটানা বেশি দিন থাকা সম্ভব হল না। কয়েক মাস পরে লণ্ডনে ফিরে এল। মিসির মনের হদিস আর একবার নিতে হবে, এই হল একটা কারণ; দ্বিতীয় কারণ, বন্ধ হবার মুখে ডক থেকে যদি কিছু টাকা সংগ্রহ করা যায় তার চেষ্টা করা। কয়েকবার যাতায়াত করল; কোনো উদ্দেশ্যই বিশেষ সফল হল না।

দক্ষিণ-ফ্রান্সের চেয়ে প্যারিসই ভালো লাগে। এখানে এসে আর্নেস্টের আলাপ হয়েছে ভার্লেন, জিদ, পিয়ের লুই প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েও আর্নেস্টের লেখা অগ্রসর হয় না। মৌলিক রচনা কিংবা অনুবাদ, কিছুই আসে না কলমের মুখে। ওদিকে লণ্ডন থেকে প্রকাশকের কেবল তাগিদ আসে। অগ্রিম টাকা পাঠানো ক্রমশ অনিয়মিত হয়।

এখন তার সব চেয়ে বড় সঙ্গী মদ। প্যারিসের সস্তা কাফেতে তৃতীয় শ্রেণীর মদ নিয়ে বসে থাকে। সারা রাত কেটে যায়। অন্ধকারে যে-সব মেয়েরা প্যারিসের পথে পথে ঘোরে, তারা এসে বসে তার টেবিলে। চীৎকার করে অশ্লীল কথা বলতে এবং হুল্লোড় করতে একটুও বাধে না। এমনিতে

রূপোপজীবিনীদের প্রতি তার আকর্ষণ নেই। তাদের জন্য করুণা হয়। সামান্য যা কিছু পয়সা পকেটে থাকে ওদের দিয়ে দেয়। কখনো কখনো হয়ত এক জনের সঙ্গে বাড়ি যায়। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করে না। হঠাৎ অন্ধকার সিঁড়ির কোণে বসে পড়ে মেয়েটির সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা বলে। তার পরে প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিয়ে নোংরা পল্লীর অন্ধকার পথে বেরিয়ে আসে। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে ততক্ষণ মিসি তার হৃদয় অধিকার করে থাকে; অন্য কোনো মেয়েকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু মদ খেয়ে যখন জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, তখন মিসির সঙ্গে অন্য মেয়ের পার্থক্যটা আর থাকে না। তখন সব মেয়েই সমান।

আর্নেস্টের এতদিন মদের প্রতি আসক্তি ছিল না। শীতের দেশে যতটুকু মদ খাওয়া স্বাভাবিক ততটুকুর প্রতিও সে আকর্ষণ অনুভব করেনি। তার ব্যবহার ও কথাবার্তা চিরদিনই ছিল সুরুচিসম্মত,—বন্ধুদের আদর্শস্থানীয়। একটি মেয়ে আঘাত দিয়ে তার জীবনে যে আবর্ত সৃষ্টি করেছে তার ফলে চরিত্রের গভীরতা থেকে পাঁক উপরে ভেসে উঠেছে।

কবির কাব্যে নাকি ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া পড়ে। আর্নেস্ট যখন 'সিনারা' কবিতা লিখেছিল তখন সে জানতে পারেনি, এ কবিতা হবে তার জীবনের মর্মবাণী:

Last night, ah, yesternight, betwixt her lips and mine
There fell thy shadow, Cynara ! thy breath was shed
Upon my soul between the kisses and the wine ;
And I was desolate and sick of an old passion,
Yea, I was desolate and bowed my head :
I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

সিনারা, কাল রাত্রিতে আমার বান্ধবীর মুখের উপর যখন আমার মুখ নেমে আসছে তখন আমাদের দু'জনের মুখের মাঝখানে ভেসে উঠল তোমার মুখ।

কাল রজনীতে আরেক জনেরে বাঁধিতে বাহুর পাশে,
হেরিনু তোমার ছায়া যে, সিনারা! মৃদু তব নিশ্বাস
পরাণে পশিল—সুরাপান আর চুম্বন—অবকাশে;
তখনি স্মরিনু কেহ নাই মোর! সব গান সব হাসি
বিরস করিল সেই পুরাতন বেদনার উচ্ছ্বাস;
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি।

All night upon mine heart I felt her warm heart beat,
Night-long within mine arms in love and sleep she lay ;
Surely the kisses of her bought red mouth were sweet ;
But I was desolate and sick of an old passion,
When I awoke and found the dawn was grey :
I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভুলিনি। সারা রাত বান্ধবীর বাহুবন্ধনে থেকেও মনে পড়েছে কেবল তোমার কথা। আমার ভালোবাসার এই রীতি।

সারা রাত তার তপ্ত সে বুক শ্বসিল বুকের 'পর,
সে ছিল মগন আলস-লালসে আমারি আলিঙ্গনে,
পণ্য হলেও বড় যে মধুর বধূর বিম্বাধর !
তবু মনে হল বড় একা আমি, সেই ব্যথা উচ্ছ্বাসি'
উঠিল আবার, জাগিনু যখন ধূসর উষার ক্ষণে ;
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি।

I have forgot much, Cynara ! gone with the wind,
Flung roses, roses, riotously with the throng,
Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind ;
But I was desolate and sick of an old passion,
Yea, all the time, because the dance was long :
I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

সিনারা, সাদা লিলি ফুলের মতো তোমার সকরুণ স্মৃতি ভুলবার জন্য দু'হাতে রক্ত-গোলাপ ছড়িয়েছি, ধূলার মতো জীবনের সব কিছু বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বৃথা, তোমাকে ভুলতে পারিনি।

ভুলিনু সকল—ছুটিনু সহসা মত্ত ঝটিকাসম,
ছিঁড়ে ছড়াইনু রাশি রাশি ফুল ফুর্তির ফোয়ারায়,
মাতিনু নৃত্যে—ঐ ম্লান মুখ স্মরণ না আসে মম ;
তবু মনে হল বড় একা আমি, দংশিল পুন আসি'
বুকে সেই ব্যথা—দীর্ঘ সে রাত্রি, কাটিতে যেন না চায় !
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি।

I cried for madder music and for stronger wine,
But when the feast is finished and the lamps expire,

Then falls thy shadow, Cynara ! the night is thine ;
And I am desolate and sick of an old passion,
Yea, hungry for the lips of my desire :
I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

যখন উৎসবের কোলাহল শেষ হয়, একে একে আলো নিবে যায়, তখন অন্ধকারে আবির্ভাব হয় তোমার ছায়া-মূর্তির। বাকি রাতটা একমাত্র তুমি আমার মন অধিকার করে থাক। সিনারা, তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি

আমি যে তখন সুরার গরল, সুরে আগুন চাই !
তারপর যবে উৎসব-শেষে দীপমালা নিবে যায়,
তোমারি সে ছায়া নামে ধীরে ধীরে, সারা রাত হেরি তাই ;
অমনি শূন্য মনে হবে সব—সেই ব্যথা উচ্ছ্বাসি'
অধীর করে যে তব প্রিয়-মুখ-চুম্বন-লালসায় ;
আজিও, সিনারা, আমার ধরণে তোমারেই ভালবাসি। *

আর্ণেস্টের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রা ক্রমে ক্রমে চরমে পৌছল। অনেক দিন সে কিছুই খায় না ; খিদে পায় না। হোটেলে কখন যে তাকে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। ছেঁড়া পোশাক, মাথায় অবিন্যস্ত চুলের বোঝা ; মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এই ভাবে আর্ণেস্ট ঘোরাফেরা করে। একটু ভদ্রভাবে চলতে হলে যে পয়সা প্রয়োজন সে-পয়সা সে খরচ করে মদের পেছনে। কিছুদিন আর্ণেস্টের মধ্যে লড়াই করবার একটা প্রবৃত্তি জেগে উঠল। এক রুটিওয়ালার সঙ্গে মারামারি করে হাজতে যেতে হয়েছিল। কেউ বলে, রুটির কারখানায় ঢুকে মালিকের স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়েছিল আর্ণেস্ট। আবার এর প্রতিবাদও শোনা যায়। একটু বচসা হলেই লড়াইয়ের আহ্বান করেছে, এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। ক্ষিপ্ত হলে নিজের দুর্বল শরীরের কথা সে ভাবে না। তার এই সংগ্রামী মনোবৃত্তিটা বিশেষ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় ; যে সংসার তাকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করেছে সেই সংসারের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার মুষ্টি যেন সর্বদা উদ্যত হয়ে আছে।

এই পঙ্কিল, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মধ্যেও মিসি তার মন থেকে একটুও দূরে সরে যায়নি। এখনও আর্ণেস্ট আশা করে। হয়ত একদিন মিসির মন বদলাবে। এই আশাতেই সে তার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ মিসির নামে উৎসর্গ করল।

---

* কাব্যানুবাদ : মোহিতলাল মজুমদার

এর জন্য বন্ধুবান্ধবের উপহাস সইতে হল। মিসি কি বুঝবে কবিতার? বেণাবনে মুক্তা ছড়ানো। আর্নেস্ট হয়ত ভেবেছিল কবিতা পড়ে যদি মিসি তাকে বুঝতে পারে, যে কবিতার মধ্যে তার হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

বই বেরুবার কয়েক মাস পরে লণ্ডনে এসে আর্নেস্ট জানতে পারল মিসির কাছ থেকে তার আশা করবার আর কিছু নেই। মিসির বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। পাত্র তাদেরই হোটেলের পরিচারক অগাস্টে। বিয়েতে আর্নেস্টের নিমন্ত্রণ হল; কিন্তু যাবার মতো মনের বল সঞ্চয় করতে পারল না। আর্থার মূরের মারফৎ মিসিকে তার উপহার পাঠিয়ে দিল।

যাক, আশা করবার আর কিছুই রইল না। এবার সে একেবারে মুক্ত। আত্মহত্যা করলে কেমন হয়? আর বেঁচে থেকে লাভ কি? তার তো মৃত্যু হয়ে গেছে; এরপরও সে বেঁচে আছে অন্যায়ভাবে। কিন্তু আত্মহত্যা করবার জন্য যে শক্তি ও উদ্যম প্রয়োজন সেটুকুও অবশিষ্ট নেই। এর চেয়ে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা সহজ।

একদিন বন্ধু ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ও মেয়ের জন্য তুমি কেন দুঃখ করছ? সে মোটেই তোমার যোগ্য ছিল না। তাহলে সে তোমাকে উপেক্ষা করে হোটেলের চাকরকে বিয়ে করতে পারে?

আর্নেস্ট প্রতি-প্রশ্ন করল, কীটস ফ্যানি ব্রনের মধ্যে কী দেখেছিল বলতে পার?

হ্যারিস সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, কত বড় বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে তোমার মতো কবিকে...

বাধা দিয়ে আর্নেস্ট বলল, সে কথা থাক। তোমরা ওর মধ্যে কিছু দেখতে পাওনি বলেই ও আরো বেশি করে আমার ছিল। অন্য কেউ ওর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়নি, আমি তা দেখেছিলাম। হায় ঈশ্বর! কেন তুমি ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেলে? কেন?

তারপর আর্নেস্ট ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগল:

Because I am idolatrous and have besought,
With grievous supplication and consuming prayer,
The admirable image that my dreams have wrought
Out of her swan's neck and her dark abundant hair:
The jealous gods, who brook no worship save their own,
Turned my live idol and her heart to stone.

আমি পৌত্তলিক। কঠোর তপস্যা করে আমার স্বপ্নের প্রিয়াকে মূর্তিমতী ও প্রাণময়ী করেছিলাম। এত দিন তার পূজা করেছি। কিন্তু দেবতারা বড় ঈর্ষাপরায়ণ; অন্য কারো পূজা তাঁরা সইতে পারেন না: তাই তাঁরা আমার স্বপ্নসম্ভবা প্রিয়ার জীবন্ত মূর্তিকে এবং তার হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করেছেন।

বন্ধুরা যখন মিসির সমালোচনা করেছে, আর্নেস্ট তাতে কখনো যোগ দেয়নি। বরং তার পক্ষ সমর্থন করে কথা বলেছে। মিসির বিবাহিত জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখের। সামান্য উপার্জন দিয়ে অগাস্টে সংসার চালাতে পারত না। অনাহারের জ্বালা এড়াবার জন্য মিসিকেও চাকরি নিতে হয়েছিল। মিসির এই দুঃখে আর্নেস্টের গভীর সহানুভূতি সত্ত্বেও কিছুই করবার ছিল না। সে মিসির কাছে একটি শান্ত অভিযোগ শুধু রেখে গেছে:

You would have understood me,

had you waited...

তুমি অপেক্ষা করলে হয়ত আমাকে বুঝতে···

এবার সে কাজ করবার সঙ্কল্প নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে এল। যেন সে উপলব্ধি করেছে জীবনের হিসাব নিকাশ করবার সময় এসেছে; যত বাকী কাজ সব শেষ করে ফেলতে হবে। নিয়মিত ভাবে প্যারিস থেকে কপি পেয়ে প্রকাশক বিস্মিত হয়ে গেল। তিন বছর ধরে তাগিদ দিয়ে যে কাজ পায়নি তা শেষ হল তিন মাসের মধ্যে। অন্য সব কিছু বন্ধ রেখে আর্নেস্ট কেবল অনুবাদ করছে। অস্কার ওয়াইল্ড জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্যারিস এসেছেন। তিনি তিরস্কার করে বললেন, এ কী করছ তুমি? শুধু অনুবাদই করবে? নিজের লেখা কই?

নিজের লেখা? একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠল আর্নেস্টের মুখে। সেজন্য তো প্রকাশক টাকা দেবে না! কিন্তু কিছুদিন পর থেকে অনুবাদের জন্য প্রাপ্য অর্থ আসাও অনিয়মিত হয়ে উঠল। প্রকাশকের অবস্থা ভাল নয়। তার পক্ষে অগ্রিম টাকা পাঠানো আর সম্ভব হবে না। টাকার অভাবে প্যারিসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল। আর্নেস্টের মনে হল লণ্ডনে দারিদ্র্য গোপন করে থাকা সহজ।

আবার লণ্ডন। তার এক কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও রাস্তায় দেখা হলে তাকে চিনতে পারে না। ইচ্ছা করে নয়, চেহারায় এত পরিবর্তন হয়েছে। কঙ্কালসার

দেহ, ছেঁড়া পোশাক, মুখের এক দিকে একটা উন্মুক্ত ঘা, বাঁধানো দাঁত খুলে পড়েছে, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। টলতে টলতে পথ চলে। আর্নেস্ট আশ্রয় নিল গাড়োয়ানদের আস্তানায়। কেউ জানবে না তার অস্তিত্ব। তাই সে চায়। অনেক বন্ধুই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বাউণ্ডুলে চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে কারো মর্যাদার হানি সে করতে চায় না। নিজের আত্মীয়-স্বজন অনেক আছে লণ্ডনে। তারা একটু খবর পেলে সকল রকমে তাকে সাহায্য করত। কিন্তু আর্নেস্ট নিষ্ঠুরতম আঘাত সইতে পারবে, কারো করুণা বা দয়া সে কিছুতেই সইতে পারবে না। আহত জন্তুর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়, গাড়োয়ানদের আস্তানা থেকে প্রকাশকের কাছে টাকার খোঁজে আসে, আবার আত্মগোপন করে।

নতুন করে লেখার চেষ্টা করবে বলে গাড়োয়ানদের আস্তানা ছেড়ে সে একটা সস্তা ঘরে উঠে এল। ঠিকানা বদলালেও লেখা হয় না। দেহ ও মন দুই-ই অক্ষম হয়ে পড়েছে। বাড়িওয়ালা ভাড়া পায় না। সে নোটিশ দিয়ে গেছে টাকা না পেলে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। শেষ চেষ্টা করবার জন্য আর্নেস্ট টলতে টলতে একমাত্র বন্ধু প্রকাশকের কাছে এল। কিন্তু তার আপিস তালাবন্ধ। একেবারে বন্ধ হয়ে গেল কি না কে জানে?

এখন কোথায় যাবে? বাড়িওয়ালার সামনে গিয়ে অপমানিত হতে পারবে না। ঘুরতে ঘুরতে একটা রেস্তোরাঁয় এসে বসল। পোশাকে ও চেহারায় ভিক্ষুকের মতো দেখতে। প্রেমের সব চেয়ে তিক্ত ফসল সে।

> Love's aftermath! I think the
> time is now
> That we must gather in,
> alone, apart,
> The saddest crop of all the
> crops that grow
> Love's aftermath…

এই রেস্তোরাঁয় সে দেখা পেল রবার্ট শেরার্ডের। শেরার্ড তার কবিতার গুণগ্রাহী পাঠক। মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সেই জন্যই হয়ত শেরার্ডের প্রশ্নের উত্তরে নিজের অবস্থা সব খুলে বলল আর্নেস্ট। অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলতে পারত না। শেরার্ড তাকে নিয়ে বাড়িওয়ালার কাছে গেল। তাকে বুঝিয়ে শান্ত করে আর্নেস্টকে শুইয়ে দিল বিছানায়। দু'দিন পরে

খোঁজ নিতে এসে দেখে আর্নেস্ট বিছানা থেকে আর নামতে পারেনি। ওঠার ক্ষমতা নেই।

আর্নেস্টের সঙ্গে তার আলাপ সামান্য; তার নিজের আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়; তবু সে তার প্রিয় কবিকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারল না। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে নিজের বাড়িতে শেরার্ড তাকে নিয়ে এল। স্বামী-স্ত্রী যথাসাধ্য সেবা করে একটু সুস্থ করে তুলল রোগীকে। শেরার্ড ডাক্তার ডাকতে চেয়েছে। কিন্তু আর্নেস্ট ডাক্তারের নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠত, সুতরাং ডাক্তার ডাকা হয়নি। আর্নেস্ট কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে পেটেণ্ট ওষুধ আনতে বলত। রোগীকে শান্ত করবার জন্য সেই সব ওষুধ এনে দিয়েছে শেরার্ড। পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ আর্নেস্টের অবস্থা ক্রমশ উন্নতির দিকে যেতে লাগল। আর্নেস্টের ধারণা আর কিছু দিনের মধ্যেই সে লণ্ডনে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু ষষ্ঠ সপ্তাহ থেকে অকস্মাৎ তার অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯০০) সারা রাত ধরে আর্নেষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করেছে। নিজে ঘুমোয় নি, শেরার্ডকে ঘুমোতে দেয়নি। পরদিন সকালে প্রবল কাশির তাড়নায় আর্নেস্ট অস্থির হয়ে উঠল। শুকনো খনখনে কাশির তাড়নায় তার শরীর ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে ওঠে। কাশি বেরিয়ে গেলে একটু শান্তি। একবার কাশির সঙ্গে প্রাণও বেরিয়ে গেল। শেরার্ডের স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল আর্নেস্ট।

কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যু সম্বন্ধে কবি লিখেছিল :

Out of a misty dream
Our path emerges for a while, then closes
Within a dream.

স্বপ্ন দিয়ে তার জীবন শুরু হয়েছিল সত্য, কিন্তু মৃত্যুর সময় কোনো স্বপ্নই অবশিষ্ট ছিল না। মিসি সব ভেঙে দিয়েছে। আর্নেস্ট স্বপ্ন দেখেছে মিসির কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে। কীট্‌স যেমন অসহ্য আনন্দানুভূতিকে চিরন্তন করবার জন্য ফ্যানি ব্রনের বুকের ওপর মাথা রেখে মরতে চেয়েছিল, আর্নেস্টের ছিল সেই কামনা :

Reap death from thy live lips in
one long kiss,
And look my last into thine
eyes and rest :

What sweets had life to me
sweeter than this
Swift dying on thy breast ?

• একটি সুদীর্ঘ চুম্বনে তোমার ঐ সতেজ সুপুষ্ট ওষ্ঠ থেকে মৃত্যুকে বরণ করে নেব। তোমাকে চুম্বন করতে পারার মধ্যে এমন অপরিসীম সুখ যে, এই দেহ সেই সুখের আস্বাদকে ধরে রাখতে পারবে না। তোমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার বুকের উপরে মাথা রেখে মরবার মতো আনন্দ আর কি আছে ?

আর একটি ভিন্ন সুরের কবিতায়ও আর্ণেস্ট মৃত্যুর সময় প্রেয়সীর মুখ দেখে মৃত্যুর কামনা করেছে :

Before the ruining waters fall
and my life be carried under,
And Thine anger cleave me through
as a child cuts down a flower,
I will praise Thee, Lord in Hell,
while my limbs are racked asunder,
For the last sad sight of her face
and the little grace of an hour.

আমি অনেক পাপ করেছি, তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার অধিকার নেই। হে নরকের দেবতা, আমার একটি অন্তিম প্রার্থনা রাখলে তোমাকে সাধুবাদ জানাবো। মৃত্যুর প্রবাহ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পূর্বে এবং বালক যেমন ফুল কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে, তেমনি করে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে একে কেটে ফেলবার আগে আমার প্রেয়সীকে একবার দেখতে দিও, এই আমার প্রার্থনা। আমার শাস্তি দেখে তার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হবে। সেই বেদনার্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মরবার শক্তি পাবো। আমার জন্য তার বেদনার প্রকাশটাই হবে নিরুদ্দেশ যাত্রার সব চেয়ে বড় পাথেয়।

সংবাদ পেয়ে আর্ণেস্টের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব এসে উপস্থিত হল। সবারই এক আক্ষেপ : হায়, যদি একবার জানতে পারতাম! তাহলে আর্ণেস্টকে এমন ভাবে কখনই মরতে দিতাম না। তার এই পলায়নকে কেউ বুঝতে পারল না। দুঃখ সে সইতে পারে, দয়া সইতে পারে না। তাই সে পালিয়েছিল। মিসিকে জীবন পণ করে ভালোবেসেও হারালো ; সুতরাং অন্যের স্নেহ-প্রীতির উপরও তার আস্থা শিথিল হয়েছে। মিসি যে শুধু নিজে দূরে

চলে গেছে তাই নয়, স্নেহ-প্রীতি-সৌহার্দ্যের সম্ভাবনাটুকুও সে তার জীবন থেকে মুছে নিয়েছে।

ভালোবেসে হারাবার বেদনা আর্নেস্টের কতকগুলি কবিতায় এমন ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যা সচরাচর দেখা যায় না। সমালোচকের চোখে এগুলি অবক্ষয়ের কবিতা, হতাশার দীর্ঘশ্বাস। তাই সাহিত্যের দরবারে স্থান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত। কিন্তু এ সব কবিতায় তো কৃত্রিমতা নেই, কবির জীবন দিয়ে লেখা কবিতা। জীবনে যারা বঞ্চিত, তারা আর্নেস্টের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করবে এই কবিতাগুলির মাধ্যমে। বেদনার মদে কলম ডুবিয়ে লেখা কবিতা; মরমী পাঠকের মন বেদনায় গভীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা তার পড়বার সময়, শক্তি ও প্রবৃত্তি কিছুই ছিল না। বিয়ের কয়েক বৎসর পরেই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছিল মিসির। তারপর লণ্ডনের কোন এক অখ্যাত অঞ্চলে দুঃখে-কষ্টে দিন কেটেছে। শোনা যায়, আর্নেস্টের মৃত্যুর দশ বছর পরে লণ্ডনের এক হাসপাতালে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মিসির মৃত্যু হয়েছিল।

কলেজের ছুটির সময় আর্নেস্ট 'দি আমেরিকান ফার্ম' পড়তে পড়তে এক জায়গায় দেখল লেখিকা লিখেছেন: 'আন্তরিক প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না।' আর্নেস্ট মার্জিনে মন্তব্য করেছিল: 'মিথ্যা কথা! সাহারা মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে যত আন্তরিক প্রার্থনাই করা যাক্, এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে কি?' কে জানত, আর্নেস্ট সেই যুক্তি নিজেই পরবর্তী জীবনে ভুলে যাবে? ভুলে গিয়ে সাহারা-হৃদয়ে এক বিন্দু প্রেমের প্রার্থনায় জীবনপাত করবে!

জন কীটস্

১৭৯৫-১৮২১

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ড। ঘোড়ার গাড়ী তখন প্রধান বাহন যাতায়াতের; ডাক চলে দেশের সর্বত্র; ডাক-গাড়ীতে চড়ে যাত্রীরাও যায় দূরে দূরে। বড়লোকের বিলাস জুড়ি-গাড়ী তো আছেই। সুতরাং সে যুগের প্রয়োজন মেটাতে লণ্ডন শহরে বড় বড় গাড়ী-ঘোড়ার ব্যবসা স্থাপিত হয়েছিল। এমনি একটা ব্যবসা-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন টমাস কীটস্।

নিচে ঘোড়ার অস্তাবল, গাড়ীর আস্তানা,—উপরতলায় থাকেন টমাস। তাঁর ভাগ্য ভালো; মনিবের মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছিল। পরিবারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সেস্ টমাসকে বিয়ে করে এই বাড়িতে এসে উঠেছেন। নিচের তলা সর্বদা মুখরিত থাকে গাড়ীর চাকার শব্দে, ঘোড়ার কর্কশ হ্রেষায় এবং লোহার জুতো-পরানো খুরের আঘাতে। ১৭৯৫ সালের অক্টোবর মাসের এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে একটি নবজাত শিশুর কান্নার অভিনব শব্দ একঘেয়ে কোলাহলের সঙ্গে যুক্ত হল। বাপ-মা প্রথম সন্তানের নাম রাখলেন জন। জন কীটস্। সেদিন কে জানত এই অসুন্দর পরিবেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ যুগের একজন অন্যতম সৌন্দর্য-সাধক প্রথম চোখ মেলে চাইবেন!

কীটসের কবি-প্রতিভার কোনো পরিচয় তাঁর ছেলেবেলায় পাওয়া যায়নি। সাত বছর বয়সে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কথায় কথায় সহপাঠীদের সঙ্গে লড়াই লেগে যেত। প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পেরে উঠবে কি না সে প্রশ্ন মনে জাগত না; কোনো ছুতো পেলেই উন্মাদের মতো কিল-ঘুষি চালাতে আরম্ভ করত বিরোধী পক্ষের উপর। কীটসের ছোট দু'ভাই—জর্জ এবং টমও তখন তার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। একদিন স্কুলের লম্বা-চওড়া এক কর্মচারী দুষ্টুমির জন্য টমের কান মলে দিল। অপমানে জ্বলে উঠল কীটস্; প্রচণ্ড বেগে তাকেই আক্রমণ করল ঘুষি বাগিয়ে। অথচ লড়াই করবার উপযুক্ত চেহারা তার ছিল না। একটু বেঁটে, ছোট-খাটো দেখতে। কিন্তু গ্রীক দেবতা অ্যাপলোর মতো অপূর্ব সুন্দর মুখ; মাথায় সোনালি চুলের গুচ্ছ; স্বপ্নময়

বাদামী চোখ। সে যখন উদ্দীপ্ত হয়ে লড়াই করত তখন তার উপর থেকে দৃষ্টি ফেরানো যেত না। মনে হত যেন পুরাণের কোনো দেবশিশু যুদ্ধে নেমেছে। স্কুলে যারা তাকে দেখেছে তারা ভাবত সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে পরবর্তী জীবনে কীটস্ উন্নতি করবে।

মৃত্যুর তিন বছর আগে কীটস্ লিখেছিল: জীবনের যাত্রারম্ভে দুঃখের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, ভেবেছিলাম তাকে পশ্চাতে ফেলে আমি যাবো এগিয়ে, কিন্তু আমার প্রতি একনিষ্ঠ তার ভালোবাসা, মমতা গভীর ছলনায় ভুলিয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে চেয়েছি, কিন্তু, হায়, সে সাধ্বী মমতাময়ী স্ত্রীর মতো কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।

ন' বছর বয়সে দুঃখের সঙ্গে তার মুখোমুখি পরিচয় ঘটল। অকস্মাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কীটসের বাবার মৃত্যু হয়। পিতৃশোকের ক্ষতটা মিলিয়ে না যেতেই তার মা রলিঙ্স নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন।

এ বিয়ে সুখের হল না; সুতরাং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যে। কীটসের মা তিন ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন। কীটস্ মা'কে বড় ভালোবাসত। তার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন কি একটা অসুখে মা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তার এসে নির্দেশ দিল কেউ যেন রোগীর কাছে এসে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়। পাঁচ বছরের বালক এ কথা শুনতে পেয়ে কোথা থেকে একটা মরচে-পড়া পুরনো তলোয়ার সংগ্রহ করে দরজায় পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল। মাকে আশ্রয় করেই হয়ত কীটসের শৈশব স্নিগ্ধ শান্তিতে কেটে যেতে পারত। কিন্তু এটুকু সৌভাগ্যও কীটসের ছিল না। পনেরো বছর বয়স পূর্ণ না হতেই মা'কে হারালো। মায়ের সেবার সকল ভার ছিল কীটসের উপর। সদা উদ্যতমুষ্টি জঙ্গী কিশোরটি সহসা মা'র জন্য স্নেহ-মমতায় গলে গেল। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মায়ের পাশে বসে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে কীটস্, নিজের হাতে ওষুধ ঢেলে দিয়েছে, রোগীর পথ্যও প্রস্তুত করত নিজে; মা যখন একটু ভালো থাকতেন তখন বই পড়ে শোনাতো। এত করেও মা'কে ধরে রাখা গেল না। যে রোগে তিনি মারা গেলেন তার আক্রমণ থেকে সে যুগে কেউ রক্ষা পায়নি। রোগটি যক্ষা। রোগ সাংঘাতিক হলেও তা যে সংক্রামক এ কথা তখন কেউ জানত না। রোগীর সাহচর্যের সুযোগে অলক্ষ্যে কীটসের অদৃশ্য দেহকোষে যক্ষার জীবাণু উপ্ত হয়ে রইল।

মা'র মৃত্যু গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করল কীটসের জীবন। বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা, কথায় কথায় ঘুষি বাগানো,—সব বন্ধ হয়ে গেল। তার একমাত্র সঙ্গী হল বই। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। সব সময় সে বই নিয়ে আছে। স্কুল লাইব্রেরির বই পড়া শেষ হল। হেডমাস্টার মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইও বাকী থাকল না। হেডমাস্টারের ছেলে কাউডেন ক্লার্ক ছিল কীটসের সাহিত্য-চর্চার সঙ্গী ও উৎসাহদাতা।

সাহিত্য-পাঠ সৃষ্টির প্রেরণা যোগালো। কীটসের প্রথম রচিত কবিতাগুলি সমর্থন পেল ক্লার্কের কাছ থেকে। লী হাণ্টের তখন নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে উচ্চ আসন। তিনি 'এগজামিনার' পত্রিকার সম্পাদক; তাঁর বাড়িতে নবীন সাহিত্যিকদের অবারিত দ্বার। ক্লার্ক কীটস্‌কে নিয়ে এল হাণ্টের বাড়ি। হাণ্ট শুধু মুখে উৎসাহ দিলেন না, তাঁর কাগজে কীটসের কবিতাও ছাপলেন। কীটসের কবিতা ছাপার অক্ষরে সেই প্রথম বের হল। সেটা ১৮১৬ সাল। লী হাণ্ট 'নবীন কবি' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখলেন কয়েক দিন পরে। তিনি সেই প্রবন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে আজকের অখ্যাত তরুণ কবি শেলী, কীটস্‌ ও রেনল্ডস্‌ একদিন বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে। রেনল্ডস্‌ কবিতা ছেড়ে চিত্রশিল্পে নাম করেছিলেন; অন্য দু'জন সম্বন্ধে হাণ্টের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয়নি। হাণ্টের বাড়িতেই শেলীর সঙ্গে কীটসের আলাপ হয়। সে আলাপ আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হতে দেরী হয়নি।

স্কুলের পড়া শেষ করে কীটস্‌ ডাক্তারী শিখবে বলে এক সার্জনের কাছে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ কাজ তার ভালো লাগে না। কাব্য-রসে যার মন ডুবে আছে তার কি করে ভালো লাগবে হাসপাতালে রোগীর সঙ্গ এবং ওষুধের বিকট গন্ধ? ডাক্তারের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ চোখে পড়ে জানালার ফাঁক দিয়ে গলে-আসা সূর্যের একটি রশ্মি। সেই সূর্যালোকে কত ধূলা-বালির কণা ভেসে বেড়ায়, কত রঙের খেলা ফুটে ওঠে। কীটসের মন সেই সূর্যরশ্মির পথ বেয়ে চলে যায় কোন এক অজানা রূপকথার রাজ্যে। পেছনে পড়ে থাকে হাসপাতাল আর ওষুধের শিশি। কিন্তু উপায় নেই; অভিভাবকের আদেশে এসেছে এ পথে। ডাক্তারীতে পয়সা আছে। তবু উপদেশ অগ্রাহ্য করে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় না করে, হাসপাতাল থেকে একদিন বেরিয়ে এসে শুরু করল কাব্য-লক্ষ্মীর শিক্ষানবিসী।

তার আগেই কীটসের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ বেরিয়েছে। বন্ধুদের আশা ছিল,

রসিক-সমাজে কবিতাগুলি অভ্যর্থনা লাভ করবে। কিন্তু মাস খানেক পরে প্রকাশক জানালো, এ বই বের করে বড় ভুল করেছে। যে ক'খানা বই বিক্রি হয়েছিল, তাদের ক্রেতারাও বই ফিরিয়ে দিয়ে দাম চাইছে। টাকা ঘুরিয়ে দিতে দ্বিধা করলে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দেয়। বন্ধুরা হতাশ হল; কীটস্‌ও কম নয়। বাস্তব জীবনের আঘাতে স্বপ্নের ফানুস বুঝি একটু টোল খেল। কিন্তু অদম্য আশাবাদী মন; কাব্য-সাধনা ছাড়ল না কীটস্‌। হাত দিল দীর্ঘ কাব্য 'এনডাইমিয়ন' রচনায়। ছ'মাসের মধ্যে শেষ করা চাই।

ডাক্তারী প া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কীটস্‌ দু'ভাই জর্জ ও টমকে নিয়ে লণ্ডন ত্যাগ করে উঠে এসেছে হ্যামস্টেডে। ছোটবোন থাকে দূরে, স্কুলে পড়ে। এখানে উঠে এল প্রধানত লী হাণ্টের সঙ্গ লোভে। শেলীও তখন হ্যামস্টেডে আছে হাণ্টের বাড়িতে। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে কীটসের গুণগ্রাহী বন্ধুও ছিল কয়েক জন।

ব্রাউন ও ডিল্‌ক দুই বন্ধু মিলে হ্যাম্পস্টেডে একটা বাড়ি তৈরী করেছে। দুই বন্ধুর দুই পৃথক অংশ। ব্রাউন বিয়ে করেনি; কেউ নেই তার। প্রত্যেক বছর ছ'মাসের জন্য তার অংশ ভাড়া দিয়ে সে ইংলণ্ডের নানা জায়গা ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। এবার ভাড়া দিল শ্রীমতী ব্রন্‌ বলে এক বিধবা মহিলার কাছে; তাঁর দুই মেয়ে, এক ছেলে। ব্রাউন কীটস্‌কে আহ্বান করল তার ভ্রমণের সঙ্গী হতে। সানন্দে রাজী হল কীটস্‌। এদিকে তার ভাই জর্জ বিয়ে করেছে; কিন্তু বড় আর্থিক অনটন, উপার্জনের পথ নেই। তাই জর্জ ঠিক করল, সে সস্ত্রীক আমেরিকা যাবে জীবিকার সন্ধানে। ওদের জাহাজে তুলে দিয়ে কীটস্‌ ব্রাউনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

ভ্রমণ শেষ না হতেই খবর গেল টম বড় অসুস্থ। কীটস্‌ তাড়াতাড়ি ফিরে এল। সেই মায়ের রোগ,—ক্ষয় রোগে ধরেছে টমকে। কীটস্‌ আবার রোগীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করল। ছেলে বয়সে মা-বাবা মারা গেছেন; কীটস্‌ই মানুষ করেছে ওকে। চিকিৎসার টাকা নেই। মা যে নগদ টাকা রেখে গিয়েছেন তাই দিয়ে চলেছে এতদিন। কিন্তু এই সাংঘাতিক রোগের চিকিৎসার সম্বল হাতে নেই। দাদামশাই উইল করে চার ভাই-বোনের জন্য টাকা রেখে গেছেন। কীটস্‌ গেল একজিকিউটারের কাছে। তিনি টাকা দেবেন না; কারণ টম ও তাদের বোন তখনো সাবালক হয়নি। কীটস্‌ অনুনয় করল নগদ টাকা চাই না, ডাক্তার ও ওষুধের বিল

মিটিয়ে দিন। কিন্তু তাও হবে না। আসলে কীটস্ যে একদিন এঁর আদেশ অমান্য করে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়েছিল তারই শোধ নিচ্ছেন ভদ্রলোক।

টমের পরিচর্যা করতে করতে কীটস্ প্রায়ই নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেত। ঐ সময়ের অনেক রচনায় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু শুধুই ক্ষণিক ছায়া ফেলেছিল কীটসের কবিতায়। চিরন্তন সৌন্দর্য তার প্রেরণার মূল উৎস ছিল। মৃত্যুভয় সে উৎসকে শুকিয়ে দিতে পারেনি। এই সৌন্দর্য-সাধনাকে বিদ্রূপ করলে কীটস্ আহত হত। 'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' এবং 'কোয়ার্টালি রিভিয়ু' ঠিক তাই করল। কীটসের 'কবিতাবলী' এবং 'এনডাই-মিয়ন'-এর উপর সমালোচনার নামে এ দু'টি কাগজ অভদ্র আক্রমণ প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না। সে আক্রমণে এমন প্রচণ্ড আঘাত ছিল যে শেলী, বায়রণ প্রভৃতি অনেকেই ভেবেছিলেন যে, এ জন্যই কীটসের মৃত্যু হয়েছে। বায়রণ তো ছড়া লিখেছিলেন কীটসের মৃত্যুর পর:

কে মেরেছে কীটস্‌কে ?
'আমি', বলল কোয়ার্টার্লি।

'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' লিখল: 'ছোকরা কীটস্ ছিল এক ওষুধের দোকানের শিক্ষানবিস; একদিন এক মাত্রা জোলাপের ওষুধ রোগীর বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে লোভের বশে খেয়ে ফেলল। এর ফলে যে-সব সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিল—ছড়া আবৃত্তি করা তার মধ্যে একটি। এই ছড়াগুলিতে এমন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে যার তুলনা নেই।···সুতরাং বাপু কীটস্, ফিরে যাও ওষুধের দোকানের বড়ি, মলম ও প্লাস্টারের মধ্যে; কবিতা ছেড়ে সেই কাজে লেগে থাকো।'

এর চেয়ে বড় হয়ে আর কোনো আঘাত কীটসের মনে বাজেনি। সুযোগ পেলেই সে কাগজ দু'টো নিয়ে বসত, একাগ্র মনে দিনের পর দিন তার কবিতার উপরে নির্মম কশাঘাতের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত। এ ত পড়া নয়, যেন তীব্র বিষ পান। সেই বিষে কি নেশা ছিল, তাই কীটস্ যখন-তখন কাগজ দু'টো তুলে নিত। প্রথম বড় হতাশ হয়ে পড়েছিল; তার প্রকাশক টেলরকে বলেছিল, আর কবিতা লিখব না। কিন্তু এই নৈরাশ্য সাময়িক। কিছুদিন পরে আমেরিকায় জর্জকে লিখল কীটস্: আমার বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে ইংরেজ কবিদের মধ্যে আমার নাম থাকবে।

১৮১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর। শীতার্ত সকাল। কীটস্ এসে বন্ধু ব্রাউনকে

ঠেলে ঘুম ভাঙালো : ওঠ, টম আর নেই। সংসারে আর কোনো বন্ধন রইল না কীটসের। ব্রাউন বলল, একা একা থাকবে কেন? আমার এখানে চলে এস।

কীটস্ রাজী হল।

টম যখন পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন আর একজন ধীরে ধীরে কীটসের হৃদয়ে প্রবেশ করছিল। সে একটি মেয়ে। কীটসের মতো আবেগ-প্রবণ তরুণ কবির পক্ষে আরো অনেক আগেই প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরিবারে মেয়েদের সাহচর্যের সুযোগ ছিল না বলে অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে সহজ হতে পারত না। হাসপাতালে রুগ্না মেয়েদের দেখেছে; সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে মেয়েদের দেখবার সুযোগ কম ছিল। বন্ধু রেনল্ডসের পরিবারে এবং অন্য দু'-এক জায়গায় কীটস্ মেয়েদের সামনে আসবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার বাধাটা এসেছে তার দিক থেকেই। কীটস্ লম্বায় মাত্র পাঁচ ফিট ছিল। খর্বকায় হবার বেদনা সকল সময় তাকে পীড়ন করত। এই হীনমন্যতার ভাব একটা চাপা নিশ্বাসের মতো প্রকাশ পেয়েছে তার দু'-একটা কবিতা ও চিঠিতে। তার মনে হত কে ভালোবাসবে আমার মতো খাটো লোককে? তা ছাড়া কীটসের মনে হয়েছে যে, এমন মেয়ে সে একজনও দেখেনি যে তার আদর্শ ও সৌন্দর্যলিপ্সার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

১৮১৮ সালে ত্রয়োবিংশ জন্মদিবসে কীটস্ লিখল, আমি কখনো বিয়ে করব না। সাঁ-সাঁ করে বয়ে চলেছে যে বাতাস, সে আমার স্ত্রী; আর আকাশের তারাগুলি আমার সন্তান। কিন্তু এমনই পরিহাস যে, মাত্র কয়েক দিন পরে ব্রাউনের বাড়িতে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল যে তার জীবনের বাকী তিনটে বছর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফ্যানি ব্রন্ শুধু তার জীবনে নয়, কাব্যেও প্রবেশ করল। ফ্যানির সঙ্গে দেখা হবার পর যা কিছু লিখেছে কীটস্ তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ ভাবে ফ্যানির প্রভাব পড়েছে।

ফ্যানি তখন অষ্টাদশী তরুণী; রূপবতী, লাবণ্যময়ী; প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল; ভালোবাসে নাচ-গান-বাজনা-আর বই পড়া। সাজ-পোশাক সম্বন্ধে আছে দুর্বলতা। তার ব্যবহার মার্জিত এবং মর্যাদাবোধের পরিচায়ক। ফ্যানির এ সব বৈশিষ্ট্য কীটস্‌কে প্রথম আকৃষ্ট করতে পারেনি। প্রথম সাক্ষাতে যে

জিনিসটি তার চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা ফ্যানির খর্বকায়ত্ব। মাথায় সে কীটসের চেয়ে লম্বা হবে না। তার অবচেতন মন বলে উঠল, এই মেয়েটি তো আমাকে খাটো বলে উপেক্ষা করতে পারবে না! এই গোপন আশ্বাস কীটস্‌কে সাহস দিল এগিয়ে যাবার। দেখা হবার কয়েক দিন পরে ফ্যানির বর্ণনা দিয়ে জর্জকে যে চিঠি লিখেছে তাতে আছে সমালোচনার স্বর, কীটস্‌ প্রথমই বলেছে, মেয়েটি মাথায় আমার মতোই লম্বা।

দ্বিতীয়বার যখন সাক্ষাৎ হল তখন ফ্যানি কীটস্‌কে পছন্দ না করবার ভান করল। কিন্তু দু'দিনেই সকল দ্বিধা গেল দূর হয়ে। একে অন্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করল। কি চমৎকার করে কথা বলে কীটস্‌! শেক্সপীয়র, স্পেনসার, মলিয়ের, গ্রীক পুরাণের কাহিনী; তন্ময় হয়ে শোনে ফ্যানি। যেন গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া অপূর্ব সুন্দর মুখ; ক্ষণে-ক্ষণে মুখের রূপ বদলায় অনুভূতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে। যেন মঞ্চের পট-পরিবর্তন। এমন ব্যঞ্জনাময়, স্বচ্ছ মুখ সে আর দেখেনি, —যে মুখে হৃদয় এমন করে প্রতিফলিত হয়।

টমকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে সহানুভূতির সেতু গড়ে উঠল। টমের মতো ফ্যানির ভাইও ক্ষয়রোগী। কীটসের মা মারা গেছেন যক্ষ্মায়, ফ্যানির বাবার জীবনান্ত হয়েছে সেই রোগে। কীটসের মা-বাবা কেউ নেই, ছোট ভাইয়ের অসুখে এবং অর্থাভাবে পীড়িত—সুতরাং সহজেই সে নারী-হৃদয়ের মমতা আকর্ষণ করল। ফ্যানির মাও তাকে স্নেহ করতেন এই জন্য। সহানুভূতি প্রেমে পরিণত হতে দেরী হল না। ১৮১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কীটস্‌ ফ্যানিকে তার জীবন-সঙ্গিনী হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। ফ্যানি সানন্দে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করল সেই প্রস্তাব। সেদিন রাত্রিতে শোবার আগে ফ্যানি তার দিনলিপিতে লিখল: আজকের দিনটা আমার জীবনের সব চেয়ে সুখের দিন।

বাগ্‌দানের কথা খুব ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ছাড়া আর কেউ জানল না। ফ্যানি তখনো সাবালিকা নয়; সুতরাং মা'র অনুমতি চাই বিয়েতে। শ্রীমতী ব্রন্‌ উপদেশ দিলেন কীটস্‌ উপার্জনশীল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। ফ্যানি সত্যি ভালোবেসেছিল কীটস্‌কে; তার প্রতিভার দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়েছিল ফ্যানি। তা না হলে স্বামীত্বে বরণ করবার মতো কোনো সাংসারিক গুণ কীটসের ছিল না। অমন লাভের পথ ডাক্তারী ছেড়ে সে আরম্ভ করছে কবিতা লিখতে; কবি-খ্যাতি লাভ করবে এমন আশাও নেই; এ পর্যন্ত পেয়েছে

বিদ্রূপ। নিজের ব্যয় বহন করতেও এখনো সমর্থ হয়নি। কবে হবে তাও অনিশ্চিত। তার পরিবারে আছে ক্ষয়রোগের ইতিহাস; কীটসের নিজের স্বাস্থ্যও ভালো নয়, বলা যায় না কখন কি হয়। প্রেমের দেবতা নেহাৎ অন্ধ না হলে কোন মেয়ে এমন ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চাইবে?

ফ্যানিরা কখনো ব্রাউনের বাড়ি কখনো ডিলকের বাড়ি, কখনো বা পাশের অন্য কোনো বাড়িতে থাকে। কীটস্ আর ফ্যানি সর্বদা কাছাকাছি থাকে; ইচ্ছা হলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। দু'জনে বেড়াতে যায় মাঠে। সুন্দর কিছু চোখে পড়লে কীটস্ ফ্যানিকে দেখায়; আর মাঝে মাঝে শোনায় নিজের লেখা কবিতা থেকে কয়েকটা লাইন। প্রথম প্রথম এমন হল যে ফ্যানির চোখ, মুখ, ঠোঁটের ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর—তার সব কিছু কীটসের চেতনা আচ্ছন্ন করে দিল। কবিতা কোথায় হারিয়ে গেল; ফ্যানি ছাড়া আর কেউ নেই, আর কিছু নেই। দিন পার হয়ে যায়, হৃদয় পরিপূর্ণ, অথচ কলমের মুখে ছন্দোবদ্ধ একটা কথা আসে না। একবার ভয় হল কবিতার মূল্যে বুঝি ফ্যানিকে পেতে হবে। কিন্তু সে ভয় দূর হল কিছুদিন পরেই। কবিতার বান এল। কীটসের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অধিকাংশ এই সময় লেখা। ফ্যানি অদৃশ্য থেকে এদের প্রেরণা যুগিয়েছে, সহায়তা করেছে এদের রসঘন, আবেগ-মধুর করতে।

বাগ্‌দানের ছ'মাস পরে কীটস্ গলার অসুখে পড়ল এবং সেই সঙ্গে তীব্র হয়ে দেখা দিল আর্থিক অনটন। একবার মনে হল ওষুধের দোকানে চাকরির চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু ব্রাউন নিষেধ করল। বলল, আরো লিখতে থাকো,—এ পথেই তোমার উন্নতি। কীটস্ একবার ভাবে ফ্যানিকে মুক্তি দেব। আমার অন্ধকার ভবিষ্যতের সঙ্গে তার জীবনকে কেন জড়িয়ে রাখব? কিন্তু পরমুহূর্তেই খেয়াল হয় ফ্যানি তার সত্তার অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে, তাকে মুক্তি দেবার কথা তো আর ওঠে না! জুন মাসের শেষের দিকে সে যাত্রা করল আইল অব ওয়াইটের পথে। ফ্যানিকে বলে গেল, অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা না করে আর ফিরবে না।

পাশের ঘরে, পাশের বাড়িতে, অথবা দূরে,—যেখানেই থাক্, প্রত্যহ চিঠির বিনিময় চলত দু'জনের মধ্যে। মুখের কথায় সব প্রকাশ করা যায় না। কীটসের আবেগপূর্ণ চিঠিগুলি ইংরেজী সাহিত্যের সম্পদ। এর মধ্যে রূপ পেয়েছে তার বিচিত্র মনোভঙ্গী—প্রেম, সন্দেহ, ঈর্ষা, আশা ও নিরাশা।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে কীটসের চিঠি পেল ফ্যানি। লিখেছে: নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ, স্বাধীনতা হরণ করে এমনি ভাবে আমাকে বন্দী করে রাখা কি তোমার পক্ষে নিষ্ঠুর কাজ হয়নি? আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য যে চিঠি লিখবে তা যেন এক মাত্রা আফিঙের মতো মধুর হয়, যা পড়ে আমার মন নেশায় মশগুল হয়ে যাবে। তুমি মিষ্টি কথাগুলি লিখে তাদের উপর চুমু বুলিয়ে দিও। আমি তাদের স্পর্শ করে সান্ত্বনা পাবো…। আমার অনেক সময় মনে হয় তিনটি সূর্যকরোজ্জল দিনের পরমায়ু নিয়ে আমরা যদি প্রজাপতি হতাম তাহলে তিনটি দিনে আমরা পঞ্চাশটি সাধারণ বৎসরের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ সঞ্চয় করতে পারতাম।

পঁচিশে জুলাই রাত্রিতে কীটস্ আবার লিখেছে: আমার মনে শুধু দু'টি ভাবনা। তোমার লাবণ্যসিক্ত সৌন্দর্য এবং আমার মৃত্যুর মুহূর্ত। হায়, এই দু'টিকে যদি একই সঙ্গে পেতাম!

কিন্তু আরও অনেক ভাবনা ছিল কীটসের। ১৮১৯ সালটা তার পক্ষে দুর্বৎসর। টমের কথা সব সময় মনে পড়ে। আমেরিকায় জর্জ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। কবিতার কঠোর সমালোচনা ক্ষতবিক্ষত করেছে তার মন। কিন্তু সব চেয়ে বড় দুঃখ পেয়েছে ফ্যানিকে ভালোবেসে। ফ্যানি সাজ-পোশাক ভালোবাসে; একটু চটুল রসিকতা, নাচ, গান, হল্লার প্রতি প্রলোভন সে বয়সে স্বাভাবিক। কীটসের দেহ অপটু; ফ্যানিকে নাচের আসরে নিয়ে যেতে পারে না; বিকেলে প্রায় বিছানায় শুয়ে কাটায়, বেড়াতে নিয়ে যাবে কেমন করে? কীটসের প্রেম সর্বগ্রাসী; সে ফ্যানিকে সর্বক্ষণের জন্য চায়। তার প্রতিটি কথা, হাসির টুকরো, লাবণ্যের হিল্লোল একমাত্র সে উপভোগ করবে, —আর কেউ নয়। ফ্যানি এ যুক্তি বোঝে না। কীটস্‌কে ভালোবেসেছে বলে অন্য সকলের বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে কেন? কীটস্ নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ঈর্ষায় পুড়তে থাকে। তার চোখের সামনে দিয়ে সেজে-গুজে ফ্যানি বেড়াতে যায়, যায় নাচের আসরে। কীটস্ কল্পনা করে কার সঙ্গে ফ্যানি নাচছে, কার সঙ্গে হেসে কথা কইছে। অক্ষম ও দুর্বলের প্রেম বড় সাংঘাতিক। গ্লানিতে কীটসের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। ফ্যানির মধ্যে সে আদর্শ নারীর গুণ আরোপ করেছিল। ভেবেছিল, সে তার জুলিয়েট। কিন্তু হায়, দেখা গেল তার মানসী আর পাঁচ জন মেয়ের মতোই সাধারণ। সাধারণ বলে যদি উপেক্ষা করবার শক্তি পেত তাহলেও রক্ষা ছিল। কখনো সাধারণ কখনো অসাধারণ

মনে হয়; কিন্তু প্রবল আকর্ষণ বিন্দুমাত্র শিথিল হয় না। ফ্যানির উপরে যে ক'টি কবিতা আছে সেগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে কীটসের রক্তাক্ত আর্তনাদ। বলছে কীটস্: আজ আমি ডানাভাঙা পাখির মতো তোমার পায়ের কাছে পড়ে আছি। হয় দয়া করো, না হয় ফিরিয়ে দাও আমার ওড়বার স্বাধীনতা। তোমার প্রেমের এক কণাও আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখ না; তাহলে আমি মরে যাব।

কীটস্ আবার লণ্ডনে ফিরে এসেছে। আসবার আগে ফ্যানির সঙ্গে তার একটু কলহ হয়েছে, যার মূলে ছিল কীটসের ঈর্ষা। ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। তেসরা তারিখ লণ্ডনের বাইরে কীটস্ বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরল সন্ধ্যার পরে ডাক-গাড়ীর গাড়োয়ানের পাশে বসে। সঙ্গে উপযুক্ত গরম পোশাক ছিল না। খোলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। বাসায় যখন ফিরল তখন প্রবল জ্বর এসে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে গেল। হঠাৎ একটা কাশি এল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভরে গেল লবণাক্ত স্বাদে। ব্রাউনকে ডেকে বলল বাতি নিয়ে আসতে; শাদা বালিশ রক্তে লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থেকে কীটস্ ধীরে ধীরে বলল, এই রক্তের রঙ আমি চিনি। এ রক্ত এসেছে ধমনী থেকে—আমার মৃত্যুর শমন; মৃত্যু এসেছে আমার।

ব্রাউন ডাক্তার ডাকল। সে যুগে বিশ্বাস ছিল দেহে রক্তাধিক্য হলে এবং রক্ত দূষিত হলে রক্তবমি হয়। সুতরাং একমাত্র চিকিৎসা হল রক্তমোক্ষণ। ডাক্তার এসে কীটসের হাতের শিরা কেটে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করল। ছ'মাস ধরে একটি দিনও কীটসের শান্তিতে কাটেনি; ঠিক ছ'মাস আগেই সে অভিমান করে ফ্যানির কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে। কীটস্ ফ্যানিকে লিখল: বিশ্বাস করো, আমার এমন কোনো কাজ নেই, কথা নেই, চিন্তা নেই যার মূলে তুমি নেই। বিষামৃত তোমার ভালোবাসা। দুঃখ যত পাই তোমাকে নিয়ে, আনন্দও তার চেয়ে কম নয়। সেদিন রাত্রিতে যখন ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে আসছিল, যখন দম বন্ধ হয়ে ছটফট করছিলাম, মনে হয়েছিল মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে, সেই চরম মুহূর্তে আমার মনের চেতন আকাশে একমাত্র ছিলে তুমি।

এ রোগ ছোঁয়াচে তখন সে ধারণা ছিল না। ফ্যানি প্রায় প্রত্যেক দিন একবার করে দেখে যেত। কীটস্ দিন দিন যত অপটু হতে লাগল তার ঈর্ষার

জ্বালা ততই বাড়তে লাগল। কল্পনার চোখে দেখতে পায় ফ্যানি ব্রাউনের সঙ্গে ফ্লার্ট করছে, নাচছে, বেড়াচ্ছে। কঠোর কথা বলে ফ্যানিকে, অনেক সময় অপমানজনক ইঙ্গিত। আবার হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফ্যানি তার অবস্থা বুঝে সব সয়ে যায়। সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবার পরও বেঁচে থাকার মতো বিড়ম্বনা আর কি আছে? কীটস্ অনুভব করে ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ তার চোখের সামনেই ফ্যানি ঘুরে বেড়ায় জীবনের প্রতীক হয়ে। সেই জীবনকে তো সে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল, কিন্তু মারাত্মক ব্যাধি এসে বাদ সাধল। যেন ক্ষুধার্তের একটি মাত্র গ্রাস কেড়ে নিয়েছে কোনো দস্যু। শুয়ে শুয়ে অলস মনে আক্ষেপ করে, সুস্থ থাকতে যদি ফ্যানিকে বিয়ে করত তাহলে হয়ত সে বেঁচে যেত; ফ্যানির প্রাণ-প্রাচুর্যের সংস্পর্শ হয়ত সঞ্জীবনীর কাজ করত। আর একটা দুঃখ ছিল কীটসের: এমন কিছুই রেখে যেতে পারলাম না যার জন্য মৃত্যুর পর বন্ধুরা আমাকে মনে রাখবে।

একদিন কীটস্ বাগ্‌দানের আংটি খুলে দিয়ে ফ্যানিকে বলল, তোমাকে মুক্তি দিলাম। আর আমার ভালো হবার আশা নেই। কী হবে অপেক্ষা করে?

ফ্যানি বলল, ও, আমাকে ভুলতে চাও বুঝি? আমি অপেক্ষা করব তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

কীটস্ উত্তেজিত হয়ে উঠল, হাঁ, তুমি অপেক্ষা করতে পারো। নাচ, গান, হাসি তোমার জীবন পূর্ণ করে দেবে। কিন্তু আমার সামনে মৃত্যু, বর্তমানও শূন্য। আমি অপেক্ষা করব কি নিয়ে? তুমি আমার একান্ত কামনার বস্তু··· যে ঘরে তুমি নেই সেখানকার নিঃশ্বাস আমার কাছে অস্বাস্থ্যকর। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না; কিন্তু আমি চাই সাধ্বী তোমাকে, ধর্মভীরু তোমাকে।

জুন মাসে আবার শুরু হল রক্তবমন। ডাক্তার পূর্বের মতোই রক্ত বের করে দিতে লাগল। পথ্য একেবারে কমিয়ে দিল, প্রায় উপবাস। উপবাস দিলেই রক্তের পরিমাণ কমবে। ডাক্তার পরামর্শ দিল ইতালী যেতে। শীতের সময় ইংলণ্ডে থাকলে রক্ষা নেই।

কীটসের দেহ ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে মনও হয়েছে দুর্বল। শুয়ে শুয়ে কেবল রোমন্থন করে সেই কয়েকটি দিনের সুখ-স্মৃতি, যখন

ফ্যানির সঙ্গে মাঠের পথে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। এখন সে ফ্যানির সঙ্গে দেখা করতে ভয় পায়, কারণ বিচ্ছেদের বেদনা সইবার শক্তি আর নেই। এই সময় কীটস্ একটি চিঠিতে লিখল: ক্ষমতা থাকলে এখন একটি কবিতা লিখতাম; তার নায়ক আমার মতো রুগ্ন, আর নায়িকা তোমার মতো সুস্থ ও জীবন-বিলাসী। আমার মনের যে অবস্থা সে অবস্থায় হ্যামলেট ওফেলিয়াকে বলেছিল, Go to a nunnery, go, go! কী হয়েছে আমার, সবাইকে ঘৃণা করি। ভবিষ্যতের কাঁটা-পথ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ইতালী বা যেখানেই যাই না কেন কল্পনায় দেখব ব্রাউন তোমার সঙ্গী; আমার মনের শান্তিটুকু তোমরা কেড়ে নেবে। শান্তি পাবো শুধু কবরে গিয়ে।

মাস খানেকের মধ্যে কীটস্‌কে ইতালী রওনা হতে হবে। বন্ধুরা সব ব্যবস্থা করেছে। ফ্যানি বাগ্‌দানের পর থেকে দীর্ঘ সতের মাস সয়েছে অনেক অনিশ্চয়তা। কীটস্ চলে যাবার আগে তাদের বিয়েটা হয়ে যাক, এই সে চায়। তার মা-ও মত দিলেন; ভাবলেন, মেয়ে-জামাইর সঙ্গে তিনি যাবেন ইতালীতে। সেবা করে সুস্থ করে তুলবেন কীটস্‌কে। কিন্তু আবার কি মনে করে তিনি আপত্তি করলেন। কীটস্‌ও ফ্যানির প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারল না।

ইংলণ্ডে শেষ একটা মাস কীটসের বড় শান্তিতে কাটল। এই এক মাস সে ছিল ফ্যানিদের বাড়ি। ফ্যানি আর তার মা সেবায় যত্নে স্নেহে কীটসের বুভুক্ষু জীবন পূর্ণ করে দিয়েছিল। মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত এই ক'দিনের মধুর স্মৃতি ছিল তার একমাত্র সম্বল। ১৮২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কীটস্ ফ্যানির কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করল। হৃদয়ে প্রেম এবং ফুসফুসে মৃত্যু নিয়ে যাত্রা করল ইতালীর উদ্দেশ্যে। একটা ভীরু আশা ভরসা দিচ্ছিল গরম আবহাওয়ায় সুস্থ হয়ে আবার ফিরে আসবে ফ্যানির কাছে। যাবার আগে ফ্যানি কীটসের বাক্স গুছিয়ে দিল; কীটস্ তার প্রিয় বইগুলি ফ্যানির হাতে তুলে দিল, এবং স্মারক হিসাবে দিল সেভার্ণের আঁকা তার ছবি। ফ্যানি কীটসকে উপহার দিল পকেট-বই, ছুরি, তার মাথার এক গুচ্ছ চুল এবং মনের জোর অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য একটি কবচ। তা ছাড়া কীটসের টুপিতে ফ্যানি লাগিয়ে দিল সিল্কের লাইনিং। সেদিনকার দিনলিপিতে ফ্যানি শুধু লিখতে পেরেছে: আজ মিস্টার কীটস্ হ্যাম্পস্টেড থেকে চলে গেলেন।

যাত্রার আয়োজন সব সম্পূর্ণ; কিন্তু সঙ্গে যাবে কে? একা তো আর যেতে

পারে না! কীটসের নীরব ভক্ত মুখচোরা তরুণ শিল্পী সেভার্ণ রাজী হল। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে সেভার্ণ বাবাকে বলল ট্রাঙ্কটা একটু ধরে নামিয়ে দিতে। নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে একটা ক্ষয়রোগীর পরিচর্যার জন্য বিদেশে যাচ্ছে—এই নির্বুদ্ধিতায় ছেলের উপর বাবা আগুন হয়ে ছিলেন। ট্রাঙ্ক ধরবার অনুরোধে ক্রোধ ফেটে পড়ল। অতর্কিতে সেভার্ণকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে, কপাল কেটে গেল। সেভার্ণ যখন জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হল তখনও কপালের দাগ মিলায় নি, কিন্তু মুখ হাসিতে উৎফুল্ল। কীটসের কাজে লাগতে পারায় নিজেকে কৃতার্থ মনে করছে।

'মেরিয়া ক্রাউথার' মালটানা জাহাজ। তাতে একটিমাত্র কেবিন। সেই জাহাজে কীটস্ ইতালী যাত্রা করল। জাহাজের দিনগুলি তার পক্ষে একটুও স্বস্তিতে কাটেনি। তার কেবিনে সহযাত্রী ছিল একটি যক্ষ্মা রোগিনী। মেয়েটির খোলা হাওয়া না হলে চলে না, পোর্ট-হোল বন্ধ করলে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। আবার পোর্ট-হোল খুললে ঠাণ্ডা বাতাসে কীটস্ প্রবল কাশিতে পীড়িত হয়। কেবল খোলা আর বন্ধ করা চলত সারাদিন। এমনি করে ছ' সপ্তাহের পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

জাহাজে বসে কীটস্ ফ্যানিকে যে চিঠিগুলি লিখেছিল সেগুলি থাকলে কীটসের তখনকার মনোভাব বোঝা যেত। যত দুঃখই ফ্যানির কাছ থেকে পেয়ে থাক, সর্বদা তার কাছে কাছে ছিল এর আনন্দটা আজ বুঝতে পেরেছে। ফিরে আসবার আশাটা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে মৃত্যুর কালো গহ্বরে; সৈন্যরা শত্রুপক্ষের কামান অধিকার করবার জন্য যেভাবে আক্রমণ করে, ঠিক তেমনি। কীটসের মৃত্যুর পর ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবাগীশ এক ভদ্রলোকের হাতে ফ্যানিকে লেখা চিঠিগুলি পড়েছিল। সে চিঠির ভাষা এমন জীবন্ত, আকাঙ্ক্ষায় এমন জ্বলন্ত যে পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কানের কাছে কে কথা বলছে। চিঠি তো নয়, যেন সবাক গ্রামোফোন রেকর্ড। ভদ্রলোক বললেন, এ চিঠির কথাগুলি নিভৃত শয়নকক্ষে বসে স্বামী স্ত্রীর কানে বলতে পারে। এগুলো সকলের হাতে তুলে দিলে নীতি যাবে রসাতলে। তাই তিনি অমূল্য চিঠিগুলি চিমনির আগুনে আহুতি দিলেন।

ইংলণ্ড থেকে যাত্রার পূর্বে কীটস্ একটি চিঠিতে লিখেছিল: আজ যে দুঃখ পাচ্ছি মৃত্যুর সঙ্গে তাও শেষ হয়ে যাবে। শূন্যতার চেয়ে বেদনাও ভালো। তোমরা ভাবো ফ্যানির অনেক দোষ আছে; কিন্তু আমার কথা মনে করে

তা ভুলে যেও। আমি যেন স্বপ্নের মতো দেখতে পাই ফ্যানি ক্রমাগত আমার কাছ থেকে দূরে সরে সরে মিলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, পরলোক বলে কিছু আছে? মৃত্যুর পরে সেখানে গিয়ে কি দেখব যে আজকের বেদনা শুধুই স্বপ্ন? পরলোক নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে আমাদের কি সৃষ্টি হয়েছে শুধু দুঃখ ভোগের জন্য?

মৃত্যু যত নিকটে আসছে কীটস্ ততই মৃত্যুর অতীত কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। সে হোক পরলোক, হোক আকাশের ধ্রুবতারা। সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যেতে প্রত্যহ রাত্রিতে ধ্রুবতারা কীটসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিজের আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে ধ্রুবতারার চিরস্থায়িত্ব তুলনা করতে ভালো লাগে।

ধ্রুবতারার উপর একটা কবিতার খসড়া কীটসের আগেই ছিল। জাহাজে বসে সেই খসড়াটা পরিমার্জিত করল। এটাই কীটসের শেষ কবিতা।

ছয় সপ্তাহ পরে ২১শে অক্টোবর জাহাজ এসে নোঙর করল নেপলস্ বন্দরে। ভোরবেলা, সূর্য উঠছে সমুদ্রের উপর দিয়ে; সমুদ্রতীরের গাছপালা ও বাড়িঘরের উপরে সোনালি আবীর কে ছড়িয়ে দিয়েছে। গরম দেশের এমন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য সূর্যোদয় কীটস্‌কে মুগ্ধ করল। কিন্তু মনের অনুভূতি কবিতা হয়ে ফুটল না, ফোটাতে পারল না। রোগ শুধু তার দেহ জীর্ণ করেনি, কাব্য-প্রতিভাও হরণ করেছে।

নেপলস্ থেকে ব্রাউনকে কীটস্ লিখল: শরীর যখন সুস্থ ছিল তখন যদি ফ্যানিকে পেতাম তাহলে আজ হয়ত ভালো থাকতাম। মৃত্যু আমি সইতে পারি, কিন্তু সইতে পারি না ওর বিচ্ছেদ। হায় ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমার বাক্সে ফ্যানির স্মারক-জিনিসগুলি বল্লমের মতো হৃদয় বিদ্ধ করে। ফ্যানি যে টুপিতে সিল্কের লাইনিং পরিয়ে দিয়েছে তা আমার মাথা পুড়িয়ে দেয়। ওর সম্বন্ধে আমার কল্পনা কী ভয়ঙ্কর সজীব!— ফ্যানিকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট তার কণ্ঠস্বর কানে আসছে। পৃথিবীতে এমন কোনো আকর্ষণের বস্তু নেই যা মুহূর্তের জন্যও আমার মন ফ্যানির উপর থেকে সরাতে পারে। হায়, ও যেখানে থাকে তার কাছাকাছি কোথাও যদি আমাকে কবর দেওয়া হত! আমি ওকে চিঠি দিতে, ওর কাছ থেকে চিঠি পেতে ভয় পাই; ফ্যানির হাতের লেখা চোখে পড়লে আমার বুক ভেঙে যাবে; কেউ যদি ওর নাম উচ্চারণ করে, কোথাও যদি ওর নাম দেখতে পাই তাহলে আমি

সইতে পারব না। ব্রাউন, আমি কি করতে পারি? কোথায় সান্ত্বনা পাবো? স্বস্তি কোথায় আছে? আমার ভালো হবার আশা থাকলেও এই প্রেম আমাকে মারত।...তুমি আমাকে যে চিঠি লিখবে তাতে ওর সংবাদ দিও। যদি ও ভালো থাকে, সুখে থাকে, তাহলে শুধু + চিহ্ন দেবে; আর যদি—

ব্রাউন, আমার কথা মনে করে চিরদিন ওর পক্ষ সমর্থন কোরো। আমি ওকে চিঠি লিখতে পারি না, কিন্তু আমি চাই যে ও জানুক আমি ভুলিনি। হায় ব্রাউন, আমার বুকে আগুন জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে যাই যে মানুষের হৃদয় এত দুঃখ সইতে পারে! আমার জন্ম কি হয়েছিল এই দুঃখ সইবার জন্যই? ঈশ্বর তোমাদের সকলের মঙ্গল করুন!

কীটস্ নেপলসে পৌঁছবার পর ইংলণ্ডের ঠিকানায় আমেরিকা থেকে জর্জ চিঠি লিখল: শ্রীমতী ব্রন্ তোমাকে যেরূপ যত্ন করেছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার পরে পরামর্শ দিচ্ছে: বিয়ে করলে এ সব রোগে হয়ত উপকার হতে পারে।

কীটস্ আর শেলী—আপনা থেকেই দু'টো নাম একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। কীটস্ সৌন্দর্যের উপাসক, শেলী মুক্তির। অকালমৃত্যু দু'জনকেই করেছে চির-তরুণ। কীটস্‌কে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কাব্যের আসরে অভ্যর্থনা করেছিল শেলী। সমুদ্র থেকে শেলীর মৃতদেহ তোলবার পর তার এক পকেটে পাওয়া গেল শেক্সপীয়র, অন্য পকেটে কীটসের কবিতা। প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও উদার মনে শেলী কীটস্‌কে বরণ করে নিয়েছিল। কীটসের মৃত্যুর পরে শেলী যে শোকগীতি রচনা করেছে আজও তা ইংরেজী সাহিত্যে অনন্য হয়ে আছে।

শেলী তখন পিসায় থাকে। কীটস্‌কে আমন্ত্রণ করল। বলল, তুমি এস, পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলব তোমাকে। কিন্তু সে যুগের ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ক্লার্ক থাকেন রোমে। তাঁকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। সুতরাং শেলীর আমন্ত্রণ অন্তর স্পর্শ করলেও কীটস্‌কে যেতে হল রোম।

কীটস্ ও সেভার্ণ দু'খানা ঘর ভাড়া করল। ডাক্তার ক্লার্ক চিকিৎসা করেন। এটা যে ক্ষয়রোগ সে সম্বন্ধে এখনো তিনি নিঃসন্দেহ নন। তাঁর ধারণা আসল রোগটা পাকস্থলী কেন্দ্র করে। কিন্তু শীত আসতেই রক্ত পড়া শুরু হল। আবার সেই পুরনো ব্যবস্থা দেওয়া হল রক্তমোক্ষণের। যতবার রক্তবমি তত বার হাতের শিরা ফুঁড়ে রক্ত বের করা হয়। আর পথ্য যা দেওয়া হল তা উপবাসের নামান্তর। কীটস্ অভিযোগ করেছে যে, এই খাদ্য খেয়ে একটা

ইঁদুরও মরে যাবে। সেভার্ণ কখনো ডাক্তারকে লুকিয়ে অতিরিক্ত খাবার দিত। কিন্তু অধিকাংশ দিনই থাকতে হত আধপেটা খেয়ে। তার উপর ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া গেল এক নতুন ব্যবস্থা। রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে হবে কীটস্‌কে। সুস্থ হবার আশায় সেই দুর্বল শরীরেও কীটস্ কিছুদিন এই নির্দেশ পালন করেছে।

ক্রমে কীটস্ শয্যালগ্ন হয়ে পড়ল। ছোট এক ফালি ঘর; জেলখানার কুঠরির মতো। সেইটুকু তার জগৎ—বাইরের পৃথিবী হারিয়ে গেল। যে জগতকে সে চিনত সেই হারানো জগতে আলোক-স্তম্ভের মতো একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে ফ্যানি। প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে, কিন্তু মুখে নাম আনে না। অনিশ্চিত আশায় দূরে অনাত্মীয় জায়গায় মৃত্যুর চেয়ে হাম্পস্টেডে ফ্যানির দু'ফোঁটা চোখের জলের তিলক পরে কবরে যাওয়া কত ভালো ছিল! আসবার আগে কয়েক দিন ফ্যানির সেবা পেয়েছে; সে কী সুখ, কী তৃপ্তি! সারাক্ষণ তার রোগজর্জর দেহ সেই স্পর্শটুকুর জন্য লালায়িত হয়ে থাকে।

এখানে আছে সেভার্ণ। কে বললে আত্মীয় নেই? ছায়ার মতো আছে তার বিছানার পাশে। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, আত্মবিলোপ করে দিয়েছে বন্ধুর জন্য। রাতের পর রাত সে কীটসের মাথা কোলে করে রয়েছে; দিনে ঘর ঝাঁট দিয়েছে, পথ্য তৈরী করেছে, বুকে ব্যথা উঠলে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে। হয়ত উনুনে আঁচ দিতে গেছে, আগুন ধরে না, যত ফুঁ দেয় কেবল ধোঁয়া বাড়ে; ওদিকে কীটস্ ডাকছে—হয়ত খিদে পেয়েছে, কিংবা রক্ত উঠেছে—পিকদানিটা এগিয়ে দিতে হবে। হাতে যখন একটি পয়সা থাকে না তখন টাকার যোগাড় সেভার্ণকেই করতে হয় যে করে হোক। না হলে এই বিদেশে কীটস্‌কে উপোস করে থাকতে হবে।

মাঝে মাঝে প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় কীটসের শীর্ণ দেহ আকুঞ্চিত হয়ে যায়। ভগবান শেষ করে দাও, শেষ করে দাও, আর কত কাল! আত্মহত্যা করা যেতে পারে সেভার্ণ এমন জিনিসগুলি কীটসের নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখে। ইংলণ্ড থেকে কীটসের নির্দেশে এক বোতল আফিঙের আরক এনেছিল সঙ্গে করে। অসহ্য যন্ত্রণা উঠলে কীটস্ চীৎকার করে ওঠে: দাও, সেই বোতলটা আমাকে দাও।

তারপর সেভার্ণের নিশ্চল মূর্তির দিকে চেয়ে আবার বলে, শুধু আমার

জন্য নয়, তোমার জীবনের কি মূল্য নেই? আমি যত দিন বাঁচব তত দিন তোমার তো মুক্তি নেই!

অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিতে যখন জীবনের টানাপোড়েন চলে তখন ফ্যানির শেষ উপহার কবচটিকে কীটস্ দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে—যেন এটাই তার একমাত্র আশ্রয়। একদিন ফ্যানির চিঠি এল। খামের উপর হাতের লেখা দেখে কীটস্ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে উত্তেজনার জের সাত দিনেও মিটল না। সেভার্ণকে বলল, এ চিঠি আমি পড়তে পারব না; আমার মৃত্যুর পর কবরে দিয়ে দিও।

ওদিকে হ্যাম্পস্টেডে কীটসের কাছ থেকে তার চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করে ফ্যানি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সেভার্ণ ব্রাউনকে নিয়মিত চিঠি দেয়। সেই চিঠি থেকে যা একটু সংবাদ জানতে পারে।

যেদিন যন্ত্রণা থাকে না, শরীর একটু ভালো বোধ করে, সেদিন কীটস্ বই পড়ে; সেভার্ণ জানালার কাছে বসে ছবি আঁকে। পরলোক সম্বন্ধে আগ্রহ হয়েছে কীটসের। সেই সম্বন্ধে বই পড়তে চায়। এ জীবনে যাকে পেল না, পরজন্মে তাকে পাওয়া যাবে কিনা—এই কথাটা হয়ত জেনে যেতে চায়। নিজের চেষ্টায় কীটস্ একটু ইতালিয়ান শিখেছে। একদিন ফিলিপ্পোর কয়েক লাইন পড়বার পরই পেল:

> Wretched me! there is no solace
> left for me
> Except weeping, and weeping
> is a crime.

হায়, কী নিষ্ঠুর সত্য! তার জীবনে কান্না ছাড়া সত্যি আর কিছু নেই। কীটস্ বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

৩০শে নভেম্বর কীটস্ শেষ চিঠি লিখল ব্রাউনকে: সব সময় মনে হয় আমার আসল জীবনের মৃত্যু হয়েছে; এখন যেন মৃত্যুপরবর্তী জীবন যাপন করছি।

এরপরে দশ সপ্তাহ যাবৎ কীটসের শীর্ণ দেহে জীবন-মৃত্যুর নিরন্তর সংগ্রাম চলল। মৃত্যু যতই এগিয়ে এল কীটস্ ততই শান্ত হল। সেভার্ণকে একদিন জিজ্ঞাসা করল, কখনো কাউকে মরতে দেখেছ? না? তাহলে তোমার জন্য দুঃখ বোধ করছি। আমার জন্য কত ঝঞ্ঝাট আর বিপদেই না পড়েছ। কিন্তু এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে। শেষ হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, বিকেল বেলা। মৃত্যু ঘনিয়ে এল। রাত প্রায়

এগারোটা। কীটসের শেষ কথা: সেভার্ণ—আমি—তুলে ধরো, আমার মৃত্যু এসেছে। আমি শান্তিতে মরব। ভয় পেয়ো না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে মৃত্যু এল।

সেভার্ণের কোলে কীটসের প্রাণ বেরিয়ে গেল। যেন ঘুমিয়ে পড়ল। মৃত্যু অক্ষয় করে রাখল ছাব্বিশ বছরের তারুণ্যকে।

রোম শহরের এক প্রান্তে অবহেলিত একটি সমাধিস্থান। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। খোলা জায়গা; গাছপালা বড় নেই; আছে বুনো ফুলের বন। আর দাঁড়িয়ে আছে কত মৃত্যুর নীরব সাক্ষী হয়ে সেষ্টিয়াসের পিরামিড।

কিছুদিন আগে শেলীর ছেলেকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে। দু'বছর পর শেলীকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। কীটসের জন্যও নির্বাচন করা হল এই সমাধিক্ষেত্র। স্বদেশ থেকে বহু দূরে পিরামিডের ছায়ায় কীটসের শেষ শয্যা রচনা করল কয়েকজন বন্ধু। মাটি দেবার আগে তার বুকের উপর রেখে দেওয়া হল ফ্যানির সেই না-খোলা চিঠি।

কত মৃত্যুর সঙ্গী ডাক্তার ক্লার্ক, তাঁর দু'চোখ সহসা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তিনি কবরের আলগা মাটির উপর কয়েকটি বুনো ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলেন। শেষের দিকে কীটসের প্রায়ই মনে হত, তার দেহ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে, আর সেখানে ফুটে উঠছে অজস্র ফুল।

সেভার্ণ বড় ক্লান্ত; নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত নেই। এক জনের ওপর ভর দিয়ে সে বন্ধুর শেষ যাত্রার আয়োজন দেখছে। তখন কে জানত সেভার্ণ নিজের সমাধিক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে আছে! একষট্টি বৎসর পরে ইতালীতে সেভার্ণের মৃত্যু হয়। বন্ধুরা কীটসের পাশে তাকে কবর দিয়েছিল।

মৃত্যুর নয় দিন পুর্বে কীটস্ সেভার্ণকে ডেকে বলল, আমার কবরের উপরে এই কথা কয়টা লিখে দিও: **Here lies one whose name was writ in water.**

তার জীবনটা জলের দাগ ছাড়া আর কি? যাকে ভালোবেসেছিল তার হৃদয়ে প্রেমের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারল না; যে কাব্য-সাধনা ছিল তার প্রাণ, জীবিত থাকতে কেউ তার স্বীকৃতি দিল না। জলের আলপনা যত সুন্দর হোক, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তে।

সেই জলের আলপনা আজ সোনার আলপনা হয়েছে। ভবিষ্যতের এই ইঙ্গিতটুকু সেদিন পেলে কত শান্তি বুকে নিয়ে মরতে পারত কীটস্!

জলের নয়, সোনার আলপনা! বিশ্ব-সাহিত্যের বুকে ঝকঝক করছে।

পাঠপঞ্জী

এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় যে-সব বই বাজারে পাওয়া যায় সাধারণতঃ তাদেরই নাম দেওয়া হয়েছে। পুরনো বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণের বিবরণ পাওয়া যাবে। লাগেরকভিস্ট ও ল্যাক্সনেস সম্বন্ধে পৃথক বই নেই; সুতরাং সাময়িক-পত্রের প্রবন্ধ উল্লেখ করা হয়েছে।

Guy de Maupassant

1. Steegmuller, Francis : Maupassant. London, Collins. 1953. 6/-
2. Sullivan, E.D. : Maupassant the Novelist. Princeton, Princeton University Press. 1954. Dollar. 4.00

Honore de Balzac

1. Hunt, H.J. : Balzac's Comédie Humaine. London, University of London Press. 1959. 50/-
2. Hunt, H.J. : Honoré de Balzac. London, Constable. 1957. 21/-
3. Rogers, S. : Balzac and the Novel. Madison, University of Wisconsin Press. 1953. Dollar. 3.50
4. Zweig, S. : Balzac. N.Y., Viking Press. 1946. Dollar. 3.75

Francois Mauriac

1. Jarrett-kerr, M. : Mauriac. London, Bowes & Bowes. 1954. 6/-

Jean-Paul Sartre

1. Champigny, R. : Stages on Sartre's way, 1938-1952. Bloomington, Indiana University Press. 1959. Dollar. 3.75
2. Murdoch, I. : Sartre. London, Bowes & Bowes. 1953. 6/-

Albert Camus

1. Cruickshank, J. : Albert Camus and the Literature of Revolt. London, Oxford University Press. 1959. 25/-
2. Maquet, A. : Albert Camus : an invincible summer. N.Y., Braziller. 1958. Dollar. 3.75
3. Thody, P. : Albert Camus : a study of his work. London, H. Hamilton. 1957. 18/-

Gabriela Mistral

1. Selected Poems tr. by Langston Hughes. Bloomington, Indiana University Press. 1958. Dollar. 3.00

অনুবাদকের ভূমিকায় মিস্ত্রালের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

Federico Garcia Lorca

1. Barea, A. : Lorca : the Poet and his people. N.Y., Grove Press. 1958. Dollar. 1.45
2. Campbell, Roy : Lorca : an appreciation of his poetry. New Haven, Yale University Press. 1952. Dollar. 2.50

Gabriele D'Annunzio

1. Antongini, T. : D'Annunzio. London, Heinemann. 1938. 15/-
2. Rhodes, A. : The Poet as Superman : Gabriele d'Annunzio. London, Weidenfeld. 1959. 25/-

Ignazio Silone : Alberto Moravia

1. Lewis, R.W.B. : The Picaresque Saint. N.Y., Lippincott. 1959. Dollar. 6.00

সিলোনে, মোরাভিয়া, কামু, ফকনার ও গ্রীণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

Henrik Ibsen

1. Bradbrook, M.C. : Ibsen the Norwegian. London, Chatto 1946. 10/6.

2. Tennant, Peter F.D.: Ibsen's dramatic technique. London, Bowes & Bowes. 1948. 12/6.
3. Shaw, G.B.: The Quintessence of Ibsenism. N.Y., Hill & Wang. 1957. Dollar. 0.95

August Strindberg

1. Mortensen, Brita M.E. & Downs, B.W.: Strindberg: an introduction to his life and work. London, Cambridge University Press. 1949. 15/-
2. Sprigge, Elizabeth: The Strange life of August Strindberg. N.Y., Macmillan. 1949. Dollar. 3.75

Par Fabian Lagerkvist

1. Current Biography, 1952.
2. Books Abroad Winter, 1952.

Halldor Kiljan Laxness

1. Current Biography, 1946.
2. Books Abroad Summer, 1954.

Ivan Turgenev

1. Magarshack, D.: Turgenev: a life. London, Faber. 1954. 25/-

Fyodor Dostoevsky

1. Fueloep-Miller, R.: Fyodor Dostoevsky: insight, faith, and prophecy. N.Y., Scribner. 1950. Dollar. 2.50
2. Simmons, E.J.: Dostoevsky: the making of a novelist. London, John Lehmann. 1950. 18/-
3. Yarmolinsky, A.: Dostoevsky, his life and his art. London, Arco. 1956. 25/-

Stefan Zweig

1. Arens, H. *ed*: Stefan Zweig, a tribute to his life and work. London, Allen. n.d. 6/-